গন্ধর্বকন্যা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ
কলিকাতা-৭০০০৭৩

GANDHARBAKANYA

A Bengali Novel

by

NIHARRANJAN GUPTA

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
গৌতম রায়

দেওয়ালী, ১৩৭১

বাব্‌লু, দীপু, সীপু, টুকুন
আমার সৃষ্ট দুই কন্যাকে
আমারই মেয়েদের হাতে তুলে দিলাম।

বাবা

পুস্তকের সর্বস্বত্ব : শ্রীমান্ অর্ণব মজুমদার
নিউইয়র্ক, ইউ. এস. এ.

আমাদের প্রকাশিত লেখকের
আর একখানি বই—

নক্ষত্রের রাত্রি

আর্জেণ্ট কল বুক পেয়ে ইমারজেন্সী রুমে প্রবেশ করে উজ্জ্বল আলোর নীচে টেবিলের 'পর শায়িতা দেহটার দিকে নজর পড়তেই ডাঃ নীলাদ্রি চৌধুরী যেন থমকে দাঁড়ায় নিজের অজ্ঞাতেই।

কঙ্কনা না—

কয়েকটা মুহূর্ত এলায়িত বিশৃঙ্খল দেহটার দিকে তাকিয়ে থেকে আরও কয়েক পা এগিয়ে নীলাদ্রি একেবারে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে—হ্যাঁ। ভুল নয়। উজ্জ্বল আলোর নীচে টেবিলের উপর এলিয়ে আছে কঙ্কণার দেহটাই শিথিল-বিবশা। পরনের শাড়ি বিশৃঙ্খল। চিনতে তার ভুল হয় নি। কঙ্কণাই।

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে হলেও নীলাদ্রির কঙ্কণাকে চিনতে কষ্ট হয় না। কষ্ট হবার কথাও নয়। পরিধেয় রঙিন তাঁতের শাড়িটা কিছুটা অগোছালো। বুকের উপর থেকে আঁচলটা খসে পড়েছে এক পাশে—ব্লাউজের গোটা দুই বোতাম খোলা—হয়ত আর্টিফিসিয়াল রেসপিরেশান দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

দুটো হাত ছড়ানো—চক্ষু দুটি মুদ্রিত। মাথাটা একপাশে কাত হয়ে আছে। বিস্রস্ত দীর্ঘ কুন্তলরাশি টেবিলের 'পর ছড়ানো।

হাতের মণিবন্ধে দু'গাছি করে চুড়ি।

পাশে একটা কিডনী ট্রের ওপরে স্টমাক টিউবটা দেখা যাচ্ছে।

ডিউটিরত এম. ও. ডাঃ সুশীল চক্রবর্তী পাশের আর একটা টেবিলে একটি জখমী কেসকে অ্যাটেণ্ড করছিল। আর. এস. নীলাদ্রিকে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো, এই যে স্যার, আপনি এসে গেছেন মনে হচ্ছে কেসটা ওপিয়াম পয়েজনিং।

ওপিয়াম পয়েজনিং! কথাটা মৃদুকণ্ঠে বলে তাকাল নীলাদ্রি সুশীল চক্রবর্তীর দিকে।

হ্যাঁ স্যার—পিউপিল পিন পয়েন্ট হয়েছিল—পালস ফিবল।

লাভাজ দিয়েছো ?

হ্যাঁ—কিন্তু কোন রেসপনস্ নেই—

নীলাদ্রিই তখন চিকিৎসা শুরু করে—নতুন উদ্যমে আবার।

ভোর রাতের দিকে ধীরে ধীরে রোগিণীর অবস্থা সামান্য আশা আনে মনে।

দুটো দিন তার পর যুদ্ধ করেছে নীলাদ্রি। তৃতীয় দিন সকালে কঙ্কণা অনেকটা স্বাভাবিক ভাবে চোখ মেলে তাকাল।

অবস্থা একটু ভালর দিকে যেতেই নীলাদ্রি কঙ্কণাকে একটা কেবিনে রিমুভ করেছিল—ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার খবর নিয়েছে—স্পেশাল নার্স নিযুক্ত করেছে নিজেই।

তৃতীয় দিন সকাল বেলা নার্স সুলতা যখন পেসেণ্টকে ব্ল্যাক কফি পান করাচ্ছে নীলাদ্রি কেবিনের পর্দা তুলে ভিতরে এসে প্রবেশ করল।

কঙ্কণা পদশব্দে নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকায়।

বালিশে হেলান দিয়ে বেডের উপর বসে কফি পান করছিল কঙ্কণা। মাথার চুল রুক্ষ— মনটা যেন একেবারে ভেঙে গিয়েছে, ক্লান্ত— বিষণ্ণ।

গুড মর্নিং স্যার—সুলতা বললে।

পেসেণ্ট কেমন ?

ভাল স্যার—পালস স্টেডি দেখুন না।

কঙ্কণা নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিল নীলাদ্রির মুখের দিকেই।

মৃদুকণ্ঠে বললে কঙ্কণা, নীলাদ্রিদা—

হ্যাঁ—

তুমি কি করে খবর পেলে ?

আমাদের এম-ও অন ডিউটির ফোন পেয়ে ইমারজেন্সিতে গিয়ে দেখি তুমি।

তোমার হাসপাতালে ?

হ্যাঁ।

সেখানে কে নিয়ে এলো আমায় ?

তোমার পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক, আর তাঁর স্ত্রী।

কে সবিতা ?

তা জানি না—ভদ্রলোকের নাম শুনলাম দীননাথ সেন।

ঐ ত, সবিতার স্বামী। কিন্তু আমি ত ঘরের দরজায় খিল তুলে দিয়েছিলাম।

ঐ দীননাথবাবুই থানায় ফোন করেন—দুপুর থেকে সন্ধ্যা রাত পর্যন্ত তোমার ঘরের দরজা না খুলতে দেখে এবং দরজায় ধাক্কা দিয়ে ও তোমাকে ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে—

তারপর ?

তারপর আর কি পুলিস এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে তুমি বিছানার উপর অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছো—তোমার শিয়রের ধারে একটা চিঠি—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। —কঙ্কণা সোম।

ইতিমধ্যে নীলাদ্রির ইঙ্গিত পেয়ে নার্স ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কঙ্কণা চুপচাপ বসেছিল।

নীলাদ্রি মৃদুকণ্ঠে বললে কি ভাবছো ?

কিছু না। আচ্ছা নীলাদ্রিদা—

কি ?

ভাবছো বোধ হয় আমি বিষ খেয়েছিলাম কেন ?

তা নয়।

তবে ?

ভাবছি—তুমি বিষ খেয়েছিলে—সত্যি কঙ্কণা, কখনো ভাবতে পারি নি তোমার মত মেয়ে বিষ খেতে পারে।

কেন। ভাবতে পার নি কেন ? তুমি কি ভেবেছিলে নীলাদ্রিদা, সংসারে আর দশটি মেয়ে থেকে আমি পৃথক ?

তাই তো জানতাম। তবে এও মনে হয়েছে তোমার মত মেয়ে যখন বিষ খায়—

কি বল, থামলে কেন ?

সত্যি বল ত কঙ্কণা—বিষ খেয়েছিলে কেন ?

জীবনের সব চাইতে বড় বিশ্বাসের জায়গাটা যখন অতর্কিতে গুঁড়িয়ে যায়, আফিম খাওয়া ত দূরের কথা, মানুষ আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারে।

অথচ—

কি ?

ইন্দ্রজিতকে ত তুমিই জীবনে বেছে নিয়েছিলে ?

তা নিয়েছিলাম হয়ত—

তবে ?

বুঝতে পারি নি সেদিন কত বড় ভুল করেছিলাম।

তিন বছরেও ভুলটা তোমার চোখে পড়লো না ?

যাকগে ওসব কথা—আজ আর ও সব কথা ভেবে লাভ কি বল ? এখন বল কখন আমাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়বে ?

ইন্দ্রজিৎ না আসা পর্যন্ত তোমাকে ত ছাড়তে পারি না।

তুমি কি মনে কর নীলাদ্রিদা আবার আমি ইন্দ্রজিতের ফ্ল্যাটে ফিরে যাবো ? না, তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে দেবো বলেই ত বিষ খেয়েছিলাম।

কিন্তু সেই ত তোমার ঘর। সে তোমার স্বামী—তুমি তার বিবাহিতা স্ত্রী। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এক পবিত্র সম্পর্ক।

পবিত্র সম্পর্কও একদিন ছিন্ন হয়ে যায় নীলাদ্রিদা—না ? আজ সে আর আমার কেউ নয়—আমিও আর তার কেউ নই।

তোমাদের বিবাহ—মাঝখানে এই তিনটে বছর।

বুঝলাম, কিন্তু তার জোরে কি তোমরা আমাকে আটকে রাখতে পার ? তোমাদের আইন কি তাই বলে ?

আইন কি বলে জানি না—তবে—

তবে—থাক। এখন বল তো এভাবে আমাকে আটকে রেখেছো কেন ?

বুঝতে পারছো না কেন ? তুমি আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিলে—আইনের চোখে সেটা দণ্ডনীয়—পুলিস তোমাকে ছাড়বে না।

তারা অ্যারেস্ট করবে ?

তা জানি না।

আমার নিজের প্রাণটা নেওয়ারও কি আমার কোন অধিকার নেই—আশ্চর্য তোমাদের আইন ত, নীলাদ্রিদা—

নীলাদ্রি মৃদু হেসে শান্ত গলায় বললে, প্রাণ নেবার অধিকার কারোই নেই—তা সে পরের হোক বা নিজেরই হোক।

সত্যি হাসালে তুমি নীলাদ্রিদা।

থানার ও-সি রমণী চাটুজ্যের সঙ্গে ঘটনাচক্রে নীলাদ্রি ডাক্তারের বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু কঙ্কণাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়লো না।

কিন্তু দিন চারেক পরে কঙ্কণাই আবার তাগিদ দিল, আমাকে কবে ছাড়বে বল না।

কেন এখানে তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে ?

হাসপাতালে থাকলে নিজেকে অসুস্থ মনে হয়। আমি অসুস্থ নই।

ইন্দ্রজিৎ এলেই—

আবার ইন্দ্রজিৎ। বলেছি ত তোমাকে, তার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে।

তবু—তার সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া প্রয়োজন।

সে যদি আর ঐ ফ্ল্যাটে ফিরে না আসে। তার দেখা আর না পাও—

সত্যিই সে আসবে না নাকি ?

ইচ্ছা তেমন থাকলে সে ইতিমধ্যে ঐ ফ্ল্যাটে নিশ্চয়ই ফিরে আসত। মালদায় যাবার দিন সে বলে গিয়েছিল একদিনের জন্য সে মালদায় যাচ্ছে। কিন্তু আমি জানতাম, একদিনের জন্য নয়, সে চিরদিনের জন্যই চলে যাচ্ছে—আর সে ঐ ফ্ল্যাটে ফিরে আসবে না।

কি করে বুঝলে ?

বললাম ত জানি।

ঐ ফ্ল্যাট বাড়ির উপর পুলিস নজর রেখেছে। একদিন তাকে ফিরে আসতেই হবে—

তাকে তাহলে ধরবেই বলে ঠিক করেছ তোমরা ?

আমার তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।

কঙ্কণা হাসলো।

হাসছো যে ?

বড্ড দেরি করে ফেলেছো নীলাদ্রিদা।

দেরি করে ফেলেছি—

নয় ? গত তিন বৎসরে এই কলকাতা শহরে থেকেও তুমি কি একদিন সময় করে ইন্দ্রজিতের সি-আই-টি রোডের ফ্ল্যাটে যেতে পারতে না ?

পারলে কি যেতাম না।

যাবে না বলেই যেতে না। আর তাই যাও-ও নি। কিন্তু যাক, কি হলে কি হতো আর কি না হলে কি হতো না সে তর্ক থাক। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।

কোথায় যাবে, তোমার মা বাবার কাছে কি ?

সে ঘরের দরজা তো অনেক দিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে আমার কাছে।

তবে কোথায় যাবে ?

যাবার জায়গার কি অভাব ? এত বড় পৃথিবী !

একটা কথা বলবো কঙ্কণা।

বল।

একটা গোলমাল বা ভুল বোঝাবুঝি যদি হয়েই থাকে সেটার কি একটা নিষ্পত্তি করা যায় না ?

মানে বলতে চাও একটা জোড়াতালি দেওয়া যায় কি না—তাই না ? না, জোড়াতালি দিয়ে অনেক কিছুই হয়ত চলতে পারে, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে সেটা বোধ হয় সম্ভব নয়।

তোমার মত মেয়ের মুখে ঐ কথাটা শুনবো আমি আশা করি নি।

এমনও তো হতে পারে আমি বলেই এতদিন টেনে এসেছি সম্পর্কটা।

আচ্ছা আমি কি কিছু সাহায্য করতে পারি না ?

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এমন একটা সম্পর্ক যেখানে বাইরের কারো হাত পৌঁছায় না।

নীলাদ্রি বুঝতে পারে, কঙ্কণা আর ইন্দ্রজিতের মধ্যে তাদের পুরাতন এতদিনের সম্পর্কটা আর গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তবু সে হাল ছাড়ে না।

বললে, তবু একটিবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি ?

না।

কেন ?

কারণ আমি সেটা চাই না। কেন তুমি বুঝতে চাইছো না, সে রকম সম্ভাবনা থাকলে আমি এ ভাবে আত্মঘাতী হতে চাইতাম না। প্লিজ, আমাকে তুমি যেতে দাও।

কঙ্কণা, আমার একটা কথা শুনবে।

কি ?

ডাক্তারী পড়তে পড়তে হঠাৎ ফাইন্যাল ইয়ারে সব তুমি ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্রজিতকে বিয়ে করে সংসার পাতলে—আবার তুমি ডাক্তারী পড়—পড়াটা শেষ করো।

না, যে পথ একবার ছেড়ে এসেছি, আর সে পথে পা দেবো না।

তাতে কি, শেষ পরীক্ষাটা তুমি দাও আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

না।

ইন্দ্রজিতের কাছে যদি তুমি ফিরে নাই যাও, কি করবে ?

তুমিই বল না।

আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, কি করতে পার তুমি।

একটা না একটা কিছু করবই। আর করতে যখন হবেই।

ঐ সময় একজন সিস্টার এসে সংবাদ দিল—উনিশ নম্বর বেডের পেসেন্টের অবস্থা খারাপ, একবার সেখানে যেতে হবে।

চলুন সিস্টার।

নীলাদ্রি উঠে দাঁড়ালো এবং কেবিন থেকে বের হয়ে গেল।

কঙ্কণা চুপচাপ বসে থাকে। বাইরে অন্ধকার রাত্রি।

অন্ধকার হাসপাতালের সামনে ফুলের বাগানটা ঝাপসা দেখাচ্ছে।

॥ ২ ॥

উনিশ নম্বর বেডের পেসেণ্টটাকে বাঁচানো গেল না। বেশ ভালর দিকেই যাচ্ছিল। হঠাৎ ইণ্টারন্যাল হিমারেজে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল।

বয়স এমন বেশী নয়। ২৮/২৯য়ের মধ্যেই হবে। গ্যাসট্রিক আলসার পারফোরেশন অপারেশনও সাকসেস্‌ফুল হয়েছিল। কি হলো চার দিনের দিন আবার হিমারেজ হলো। সব শেষ হয়ে গেল।

ভদ্রমহিলার স্বামীর মুখের দিকে যেন আর তাকাতে পারছিল না নীলাদ্রি। সংবাদটা পেতে ভদ্রলোকের দেরি হয় নি। ওয়ার্ডের বাইরেই বেঞ্চের উপর বসেছিলেন ভদ্রলোক। নীলাদ্রি বের হয়ে আসতেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াল।

ডাক্তারবাবু, নেই তাই না?

কি জবাব দেবে নীলাদ্রি, চেয়ে থাকে কেবল ভদ্রলোকের মুখের দিকে।

আপনারা তো বলেছিলেন অপারেশন সাকসেস্‌ফুল হয়েছে।

নীলাদ্রি কি আর বলবে। ধীরে ধীরে ভদ্রলোকের সামনে থেকে চলে এলো। করিডোরটা অতিক্রম করে দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এগুতে লাগল।

বড় ক্লান্ত লাগছিল নিজেকে।

একতলার বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে নজরে পড়লো বাঁদিকে কঙ্কণার কেবিনটা—ভিতরে আলো জ্বলছে।

পথে এসে নামল।

একটু এগিয়েই মেইন গেটের কাছে ইমারজেন্সীর দোতলায় তার কোয়ার্টার। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দরজার গায়ে বেলটা টিপল।

সুরেন এসে দরজা খুলে দিল।

বাইরে বেশ কনকনে ঠাণ্ডা—জানুয়ারীর প্রথম দিক।

সুরেন—

আজ্ঞে ?

গরম জল আছে ?

আছে।

বাথরুমে দে। স্নান করবো।

সুরেন কিচেনের দিকে গেল, নীলাদ্রি তার শোবার ঘরে ঢুকলো।

কোয়ার্টারটা ছোট্ট—বড় নয়। একটা মাঝারী সাইজের হলঘর। তার পাশে লাগোয়া শোবার ঘর। ছোট একটা কিচেন আর স্টোররুম।

একা ব্যাচিলার মানুষ। বেশ আরামেই ছিল নীলাদ্রি। নিজের মনের মত করেই কোয়ার্টারটা সে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছিল।

নীলাদ্রি ইজিচেয়ারটার উপর গা ঢেলে দেয়। সুরেন এসে ঘরে ঢুকল, চা খাবেন তো।

হ্যাঁ, চায়ের জল দিয়েছিস। কি রান্না করেছিস ?

হ্যাঁ, দিয়েছি। বাজার থেকে মাটন এনেছিলাম, স্টু করে রেখেছি। ভাতটা চাপিয়ে দিচ্ছি।

ভাতের দরকার নেই, নীলাদ্রি বললে, পাউরুটি দিয়ে স্টু খাবো, পাউরুটি আছে ?

আছে।

সুরেন চলে গেল রান্নাঘরে।

সুরেন লোকটা অনেক দিনের। প্রায় ওদের বাড়িতে সাত বছর আছে। আর. এস. হবার পর কোয়ার্টার পেয়ে হাসপাতালে বাড়ি থেকে সুরেনকে বাবা জ্ঞানশংকরবাবু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও জানতেন সুরেন চলে গেলে তাঁর কষ্ট হবে।

ছেলেকে আগে জানালে সে সম্মত হবে না। জানতেন, তাই ছেলেকে না জানিয়েই সুরেনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতায় নীলাদ্রির কাছে।

একদিন সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ফিরে সুরেনকে দেখে তো অবাক।

সুরেন তুই—

আজ্ঞে, চলে এলাম।

চলে এলি মানে। বাবা সেখানে একা? বাবাকে কে দেখাশুনা করবে?

এক রকম করে চলে যাবে বললেন তিনি।

চলে যাবে মানে কি?

আজ্ঞে বললেন চলে আসতে।

গর্দভ, তাই তুমি চলে এলে।

বললেন আপনার কষ্ট হচ্ছে।

আর বাবার বুঝি কষ্ট হবে না। তুই কালই সকালে ফিরে যাবি।

কিন্তু সুরেন আর ফিরে যায় নি। বাবাকে একটা চিঠি লিখেছিল নীলাদ্রি। সুরেনকে পাঠিয়ে দিলেন কেন? আমার তো কষ্ট হচ্ছিল না।

বাবা চিঠির জবাব দিয়েছিলেন কয়েক দিন পরে। চিঠিতে অন্য কথা ছিল।

জ্ঞানশংকর লিখেছিলেন, আর কবে তুমি বিবাহ করিবে? এবারে একটি তোমার পছন্দমত মেয়ে দেখিয়া বিবাহ কর।

আজ কয়দিন থেকে নীলাদ্রির সেই কথাটাই যেন ঘুরেফিরে মনে পড়ছে।

ইন্দ্রজিৎ যেদিন হঠাৎ তার কোয়ার্টারে এসে বললে, একটা কথা বলতে এলাম নীলু।

কি কথা?

নীলাদ্রি তখন পাশ করে হাসপাতাল হাউস-স্টাফ হয়েছে, সিনীয়ার হাউস-স্টাফ। হাউস সার্জেনদের কোয়ার্টারে থাকে।

দুপুর থেকে ডিউটি করে সবে ফিরেই কোয়ার্টারে খাটের উপর গা ঢেলে দিয়ে বিশ্রাম করছে। ইন্দ্রজিৎকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে বসে।

ইন্দ্র কি খবর ? এ সময় ।

একটা কথা তোকে বলতে এলাম নীলু ।

কি কথা ? চা খাবি তো ?

হবে'খন, শোন—তোর সাহায্য আমি চাই ।

কিসের সাহায্য ?

বিয়ে করবো । সেই বিয়ের ব্যাপারে তোর সাহায্য চাই ।

কি করতে হবে ?

একটা কথা তোকে বলতে এলাম নীলু ।

মেয়ে দেখেছিস ।

মেয়ে আমার দেখা আছে ।

তবে আর কি—করে ফেল বিয়ে ।

ব্যাপারটা অত সহজ নয় ।

কেন, সহজ নয় কেন ?

সে এখন পড়াশুনা করছে ।

তা বেশ ত, বিয়ের পরও ত পড়াশুনা চলতে পারে ।

ইন্দ্রজিৎ বললে, সেটাই সে বুঝছে না । তোকে বোঝাতে হবে ।

আমাকে ।

হ্যাঁ, তোকে ।

কিন্তু সে আমার কথা শুনবে কেন ?

কারো কথা যদি সে শোনে তো একমাত্র তোর কথাই শুনবে ।

আমার কথা শুনবে, মানে—

তুই বল কঙ্কণাকে, কারণ আমি জানি কঙ্কণা তোকে অসম্ভব রিগার্ড করে ।

একটা বোমার মতই যেন শব্দটা নীলাদ্রির কানের পর্দার উপড়ে আছড়ে পড়েছিল সেদিন । কয়েকটা মুহূর্ত একেবারে যেন বোবা হয়ে ছিল নীলাদ্রি ।

কঙ্কণার সঙ্গে নীলাদ্রিই একদিন ইন্দ্রজিতের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল । কঙ্কণার তখন ফোর্থ ইয়ার—আর নীলাদ্রি পাশ করে বেরিয়েছে ।

নীলাদ্রির কলেজের বন্ধু সতীনাথের বোন কঙ্কণা। সেই সূত্রেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল একদিন সতীনাথ কঙ্কণার সঙ্গে নীলাদ্রির।

নীলাদ্রি ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র তখন—আর কঙ্কণা সবে তখন মেডিকেল কলেজে ঢুকেছে।

নীলু—এই আমার বোন কঙ্কা—তোদের কলেজে ঢুকেছে, ডাক্তারী পড়ছে—ফার্স্ট ইয়ার—

তাই নাকি। বাঃ—

কঙ্কা—এ আমার বন্ধু—নীলাদ্রি—

কঙ্কণা বলেছিল, আমি চিনি ওকে—

তাই নাকি রে—

উনি আমাদের কলেজের একজন নামকরা ছাত্র—ব্রিলিয়াণ্ট ক্যারিয়ার—

সতীনাথ তারপর বলেছিল—জানিস, ও অ্যানাটমির ক্লাস এসিসটেণ্ট ছিল—তুই ত ইচ্ছা করলেই ওর কাছে অ্যানাটমিটা বুঝে নিতে পারিস—

ওর কি সময় হবে—কঙ্কণা বলেছিল।

নীলাদ্রি তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, হবে—সন্ধ্যার পর যেদিন খুশি আসবেন—

ওকে আবার আপনি কেন নীলু। সতীনাথ বলেছিল, বয়সে তোর চেয়ে অনেক ছোট—তুমি বলবি।

নীলাদ্রির কাছে ঐ আসা শুরু কঙ্কণার—তার মেসে, সে তখন মেসে থেকে পড়াশুনা করে।

সমস্ত মন ঢেলে দিয়ে সেদিন নীলাদ্রি কঙ্কণাকে সাহায্য করেছিল। আর তারই ফাঁকে কখন যেন একটু একটু করে কঙ্কণাকে ঘিরে একটা মধুর স্বপ্ন মনের মধ্যে গড়ে তুলেছিল নীলাদ্রি।

শুধু অপেক্ষা করেছিল—কঙ্কণা পাশ করে বের হলে সে তার মনের কথাটা কঙ্কনাকে জানাবে।

কন্তু ইতিমধ্যে যে অন্যদিক থেকে আর একটা স্রোত এসেছে বা আসতে পারে—সে যেন কল্পনাও করতে পারে নি।

ইতিমধ্যে তা'হলে ইন্দ্রজিৎ আর কঙ্কণার মধ্যে মন নেওয়া-দেওয়ার পালা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছে। কখন হলো—আশ্চর্য!

ইন্দ্র—

কি?

কঙ্কণার কি ঐ একটি মাত্রই আপত্তি—যে পড়া শেষ না করে সে বিয়ে করবে না।

হ্যাঁ—স্পষ্টই বলেছে, বিয়ে হবে—তার পাস করে ডাক্তার হয়ে বেরুবার পর—কিন্তু আমার একদিনও আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

কেন—সম্ভব নয় কেন?

সম্ভব নয় কারণ ওকে ছাড়া আর একটা দিনও আমার চলছে না। তুই একটু, ওকে বুঝিয়ে বল নীলু—তুই বললে নিশ্চয়ই শুনবে ও—তোর কথা ও ফেলবে না।

বেশ বলবো—

বলবি ত।

বলবো।

নীলাদ্রিই সেদিন কঙ্কণাকে কথাটা বলেছিল দিন দুই পরে। কঙ্কণা যখন ইন্দ্রজিৎকেই জীবনসাথী করবে বলে স্থির করেছে—তখন ঐ সামান্য কথাটা বলতে কঙ্কণাকে তার দিক থেকে আর কি আপত্তি থাকতে পারে।

আরও ভেবেছিল সে সেদিন।

ইন্দ্রজিৎকে জীবনে বরণ করে নেওয়ার মধ্যে কোন অযৌক্তিকতা ত ছিল না। ডাক্তার নয় সে বটে—কিন্তু রীতিমত ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র। বরাবর বৃত্তি পেয়েছে শেষটায় কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে ভাল চাকরিও একটা জুটিয়েছে। তাছাড়াও ইন্দ্রজিতের একটা আকর্ষণ ছিল যে কোন মেয়ের কাছেই।

লম্বাচওড়া চেহারা—ভাল স্পোর্টসম্যান—ইউনিভারসিটি ব্লুর অধিকারী। বাপও ধনী ব্যবসায়ী একজন।

কঙ্কণা কিন্তু আপত্তি তুলেছিল।

বলেছিল, তুমি ঐ কথা বলছো নীলাদ্রিদা।

পড়াশুনা তো তোমার বন্ধ হচ্ছে না—তবে আপত্তিটা কোথায়। তাছাড়া এ বিবাহে তোমার মত আছে—কি নেই—

আছে—

তবে!

একটা বছর অপেক্ষা করলে ক্ষতি কি?

ও যখন অপেক্ষা করতে চাইছে না, কি বল—আমি তাহলে বলি ওকে তুমি রাজী আছো।

বেশ—আপনি যখন বলছেন।

ইন্দ্রজিৎ আমার অনেক দিনের বন্ধু বলে নয়—আমি সত্যিই বলছি তুমি সুখীই হবে—

তার এক মাস পরেই বিয়ে হয়ে গেল।

নীলাদ্রিও গিয়েছিল সেই বিয়েতে। হেসেছিল। গান গেয়েছিল।

দু'দিন পরে ওরা চলে গেল শিলং হনিমুন করতে।

বিয়ের রাত্রে সেই যে চলে এসেছিল নীলাদ্রি ওদের সি আই টি-র ফ্ল্যাট থেকে আর ঐ তিন বছর ঐ মুখে সে যায়নি।

ঐ রাস্তা দিয়েই নীলাদ্রি হাঁটে নি।

ওদের কোন খবরও ত জানত না। জানবার কোন চেষ্টাও করে নি।

সুরেন এসে তাগিদ দিল,—স্নানের জল কখন দিয়ে রেখেছি ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে—

জল দিয়েছিস। চমকে ওঠে নীলাদ্রি।

সে ত কখন—

নীলাদ্রি উঠে পড়ল।

পরের দিন নানা কাজে নীলাদ্রি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল, কঙ্কণার কেবিনে একটিবারও যেতে পারে নি। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরেছিল কোয়ার্টারে—স্নান করে সামান্য কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ভাল করে তখনও ভোর হয় নি। হাসপাতালের একজন সুইপারের ডাকে ঘুম ভাঙ্গল নীলাদ্রির। কোন মতে স্লিপিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে বের হয়ে এলো দরজা খুলে।

কি হয়েছে—

সার—এক নম্বর কেবিনের দিদিমণি—

কি—কি হয়েছে দিদিমণির, নীলাদ্রির কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে।

দিদিমণি নেই।

নেই কি রে—

সকাল বেলা সিস্টার দিদিমণি কেবিনে গিয়ে দেখেন দিদিমণি নেই—সারা হাসপাতাল খোঁজা হয়েছে নেই—তাই সিস্টার দিদিমণি পাঠিয়ে দিলেন কথাটা আপনাকে বলতে।

নীলাদ্রি বলিল, ঠিক আছে তুই যা—আমি আসছি—

হাসপাতালের সুইপার তখন চলে গেল।

নীলাদ্রি বাথরুমে ঢুকে হাত মুখ ধুয়ে প্যান্টের ওপর শার্টটা পরে নিল। সুরেন ইতিমধ্যে চা করে নিয়ে আসে।

নীলাদ্রি জুতো পায়ে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

চা এনেছি। সুরেন বললে।

নীলাদ্রি কোন জবাব দিল না, চা না পান করেই বের হয়ে গেল সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে।

হাসপাতালের তখনও ঘুম ভাঙ্গে নি—ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে।

সোজা গিয়ে নীলাদ্রি একতলার এক নম্বর কেবিনটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল—ভিতরে তখনও আলো জ্বলছে। সিস্টার নিয়তি দাশ কেবিন থেকে বের হয়ে আসছিল—মুখোমুখি হয়ে গেল নীলাদ্রির সঙ্গে।

কি ব্যাপার সিস্টার—

আপনার পেসেণ্ট চলে গেছেন। ঘণ্টাখানেক আগে রাউণ্ড দিতে এসে দেখি কেবিনের দরজা ভেজান—দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখি—কেবিন খালি—পেসেণ্ট নেই। প্রথমে ভাবছিলুম হয়ত বাথরুমে

গেছেন—কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেও যখন ফিরলেন না—কেমন সন্দেহ হলো। সঙ্গে সঙ্গে উপরের দোতলার—তিনতলার সব ওয়ার্ডগুলো ঘুরে না পেয়ে তাকে, আপনাকে খবর পাঠাই সুইপার দুখনকে দিয়ে।

কিন্তু চলে গেছেন বলছেন—কি করে বুঝলেন।

একটা চিঠি বালিশের তলায় পেয়েছি।

চিঠি—

হ্যাঁ।—এই যে—হাতের মধ্যে ধরা খামে মুখ আঁটা বেশ মোটা চিঠি নিয়তি দাশ এগিয়ে দিল।

হাত বাড়িয়ে নীলাদ্রি চিঠিটা নিল।

আমার মনে হয় চলেই গেছেন—দেখুন না চিঠিটা পড়ে।

নীলাদ্রি খামটা ছিঁড়ে ফেলল—প্রথম লাইনটা চিঠির পড়েই নীলাদ্রি বুঝতে পারে নিয়তি দাশের অনুমান মিথ্যে নয়। কঙ্কণা চলেই গিয়েছে।

॥ ৩ ॥

শ্রীচরণেষু,

আমি চলে যাচ্ছি। ক্ষমা করতে পারবে কিনা জানি না—এই চিঠির মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনা রেখে গেলাম। হয়ত ভাবছো, মেয়েটা কি অকৃতজ্ঞ? না—আমি কিন্তু সত্যিই অকৃতজ্ঞ নই। যত দূরেই যাই না—যত দূরেই থাকি না কেন—তুমি যে আমার নতুন করে প্রাণ দিয়েছিলে, জেনো কোন দিনই তা ভুলবে না কঙ্কণা। মরবো বলেই আফিম কিনে খেয়েছিলাম—কিন্তু তুমি মরতে দিলে না।

কেন দিলে না, যে পথ বেছে নিয়েছিলাম সেই পথে যেতে দিলেই ত পারতে। প্রাণ ফিরে পেয়ে ঐ কথাটাই কেবল কটা দিন ভেবেছি, আর তোমাকে দাঁড় করিয়ে ঐ প্রশ্নটাই কেবল করেছি।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছো, কেন মরতে গিয়েছিলাম—কিন্তু তোমার প্রশ্নের জবাব দিই নি। বিশ্বাস করো—আমি যে হেরে গিয়েছি কথাটা কিছুতেই তোমাকে যেন বলতে পারি নি। যাই হোক আজ সব কথাই খোলাখুলি লিখে যাবো বলেই সিস্টারের কাছ থেকে কাগজ কলম চেয়ে নিয়েছি।

কথাটা আমার আজ বিশ্বাস করবে কিনা জানি না—তবু বলে যাবো—হয়ত সেদিনের কথা তোমার মনে নেই—আর মনে না থাকাই সম্ভব—স্বাভাবিক। দাদা যেদিন তোমার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল তার আগে তোমার নাম শুনেছি কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে কতবার। আর শুনে শুনেই তোমাকে আমার মনের আসনে বসিয়ে ছিলাম। দূর থেকে তোমায় দেখেছি হাসপাতালে কতবার। আমার সমস্ত মন তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়তে চেয়েছে—কিন্তু সে কথা জানাবার আর অবকাশ হলো না।

দাদা তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল—যেতাম তারপর

তোমার কাছে অ্যানাটমি পড়তে। তুমি পড়াতে আর তোমার কণ্ঠস্বর দু'কান ভরে আমার সেতারের সুর ঝংকার তুলতো।

জান—সমস্ত মন তোমার পায়ের তলায় আমার বারবার লুটিয়ে পড়তে চাইত। তুমি মধ্যে মধ্যে তাকাতে আমার দিকে আর আমি যেন তোমার দুটি চক্ষুর দর্পণে আমারই প্রতিবিম্ব দেখতাম।

আশ্চর্য—তুমি তার কিছুই সন্ধান পেলে না। আমার মনের কোন সংবাদই তোমার মনে পৌঁছাল না।

তবু ভেবেছি—একদিন তুমি আমার মনের সন্ধান পাবে। একদিন আমার হাত দুটি তোমার দু'হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে ডাকবে, কঙ্কা—

কিন্তু তা হলো না।

তাতেও আমার দুঃখ ছিল না। ভেবেছিলাম—নাই বা পেলাম তোমাকে—ডাক্তারী পাস করে তোমার এসিসটেন্ট হয়ে তোমার পাশে পাশে ছায়ার মতো থাকবো। বড় বড় অপারেশনের সময় তোমার পাশে দাঁড়িয়ে তোমার অস্ত্রগুলো একটার পর একটা এগিয়ে দেবো। অপারেশনের পর যখন তুমি ক্লান্ত, এক কাপ কফি করে এনে দেবো তোমায়।

কিন্তু সব স্বপ্ন তুমি আমার ভেঙ্গে দিলে। যেদিন এসে আমাকে বললে ইন্দ্রজিৎকে বিয়ে করার জন্য।

প্রথমটায় বিস্ময় বেদনায় আমি মূক হয়ে গিয়েছিলাম—পরে বুঝেছিলাম তোমার মনের মধ্যে আমার কোন দাগ নেই।

আমার চোখের দিকে তাকিয়েও কি তুমি কোনদিন আমার মনের সন্ধান পাও নি। তোমার মুখে তোমার বন্ধু ইন্দ্রজিৎকে বিবাহ করবার অনুরোধ শুনে সেই কথাটাই আমার মনে হয়েছিল।

তুমি সেদিন জানতেও পারো নি—যে আঘাত আমার কাছে ছিল স্বপ্নেরও অতীত তুমি আমায় সেই আঘাতই দিয়েছিলে।

আমি সেদিন কি জবাব দিয়েছিলাম তোমাকে নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। বলেছিলাম মনে পড়ে, বেশ—তাই যদি তোমার ইচ্ছা ত জেনো তাই আমি মেনে নেবো।

১৮, ৩৪৫

তবু তুমি বুঝতে পারলে না।

বুঝবে কি করে—ভালবাসার অমৃত স্বাদ ত তুমি পাও নি।

আমি তোমার নির্দেশ মাথা পেতে নিয়ে তোমার সামনে থেকে সরে গেলাম। তাই হোক, তাই হোক। তুমি যদি তাই চাও, তাই হবে।

চমকে উঠলো নীলাদ্রি নিয়তি দাশের কণ্ঠস্বরে, চলে গেছেন তাই না স্যার।

হ্যাঁ।

আপনার আত্মীয়া ছিলেন ত উনি।

য়্যাঁ। হ্যাঁ—নীলাদ্রি তাড়াতাড়ি চিঠিটা ভাঁজ করে খামের মধ্যে ভরে কেবিন থেকে বের হয়ে এলো।

নীলাদ্রি লক্ষ্য করলো না, নিয়তি দাশ তারই দিকে তখনও তাকিয়ে। মেয়ে হয়ে সে কি কিছু বুঝতে পেরেছিল, না পারে নি?

সোজা নীলাদ্রি চলে এলো তার কোয়ার্টারে। বেল টিপতেই সুরেন দরজা খুলে দিয়ে বললে, এখুনি ফিরে এলে যে দাদাবাবু—

সুরেনের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না নীলাদ্রি। সোজা এসে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে শয্যার উপরে বসে পড়ল।

কঙ্কণা তাহলে তাকে ভালবাসত। কেন সে সেদিন কথাটা বুঝতে পারে নি, ইন্দ্রজিতের মুখে কঙ্কণা তাকে বিবাহ করতে অরাজী নয় শুনেই—কথাটা সে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধরে নিল কেন, কেন একটিবার সে কঙ্কণাকে শুধালো না, একি সত্যি কঙ্কণা—ইন্দ্রজিৎকে তুমি বিয়ে করবে বলেছো।

সুরেন এসে ঘরে ঢুকলো, এক কাপ চা নিয়ে হাতে।

—চা

রেখে যা।

সুরেন চায়ের কাপটা পাশের টেবিলে নামিয়ে রেখে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

কঙ্কণা কেন তোমার সেদিন মনে হয়েছিল, ভালবাসার অমৃত স্বাদ

আমি পাই নি। চার বছর ধরে আমার সঙ্গে মিশেও কি তুমি আমার মনের সন্ধান পাও নি।

নীলাদ্রি আবার খাম থেকে চিঠিটা বের করলো।

নিদারুণ একটা অভিমানে সেদিন আমার দু'চোখ ভরে জল উপছে পড়েছিল। আমার এতবড় ভালবাসার সন্ধান তুমি পেলে না।

আজ একটা প্রশ্ন করি—আমি কি তোমার এতই অযোগ্যা ছিলাম, তোমার পাশে দাঁড়াবার কি কোন যোগ্যতাই আমার ছিল না।

আমি কালো—আমি সুন্দর নই—কিন্তু কালো মেয়ে কি ভালবাসতে পারে না।

তোমার বড় অহংকার।

হ্যাঁ, দাম্ভিক তুমি! তাই সেদিন অনায়াসেই আর একজনের হাতে আমাকে তুলে দিতে তোমার বাধে নি।

আজ বলতে দ্বিধা নেই—তোমার নিষ্ঠুর নির্দেশ মাথায় তুলে নিলেও তোমার বন্ধু ইন্দ্রজিতের 'পরে কর্তব্য আমি করতে পারি নি। হ্যাঁ—অস্বীকার করবো না—ইন্দ্রজিৎকে আমি কোন দিনই ভালবাসতে পারি নি।

কিন্তু স্ত্রীর কর্তব্যে আমি অবহেলা করিনি।

মন না দিতে পারলেও দেহটা ত আমার সে পেয়েছিল। তার কোন ইচ্ছায় আমি বাধা দিই নি।

বিয়ের দু'দিন পরে যখন হাসপাতালে যাবো বলে প্রস্তুত হয়েছি—ইন্দ্রজিৎ প্রশ্ন করলো, এত সকালেই কোথায় যাচ্ছো।

বাঃ হাসপাতাল যেতে হবে না, আউটডোর আছে—না।

কি না।

হাসপাতালে আর তুমি যাবে না।

কি বলছো তুমি।

হ্যাঁ—আমার ইচ্ছা নয়—তুমি আর ডাক্তারী পড়—

কিন্তু তুমিই ত বলেছিলে পড়াশুনায় বাধা দেবে না তুমি।

বলেছিলাম।

তবে—

সে সময় ঐ কথা না বললে তুমি বিবাহে মত দিতে না।

এতদূর পর্যন্ত পড়ে শেষে ডাক্তারী পরীক্ষাটা দিয়ে আমি পাস করে ডাক্তার হবো না ?

কি হবে ডাক্তার হয়ে।

এত বছর পড়লাম—আজ—

সে পড়েছো যখন পড়েছো—তখন ত আর আমাদের বিয়ে হয় নি—ডাক্তারী আর সংসার করা এক সঙ্গে দুটো হয় না কঙ্কণা।

যে মেয়েরা ডাক্তারী পাস করে বিয়ে করে তারা কি সংসার করে না।

করবে না কেন।

তবে।

সেটা আমার মতে স্রেফ একটা জোড়াতালি দেওয়া—

তাই বুঝি।

হ্যাঁ ওটা এমনই একটা প্রফেশন যার সঙ্গে কোন কমপ্রোমাইজই চলে না। মনের সবটাই জুড়ে বসে থাকে ব্যাপারটা। নাই বা পড়লে আর—আমি তোমার রোজগারের প্রত্যাশিত নই—

রোজগারের জন্যই কি সকলে ডাক্তারী পড়ে।

তা ছাড়া কি ?

না। ওটা একটা বিদ্যা—এমন বিদ্যা যা মানুষের সেবায় লাগে—

রাখ ত ঐ সব গালভরা বড় বড় কথা।

তাহলে তুমি সত্যিই আর আমাকে ডাক্তারী পড়তে দেবে না।

না।

অথচ তুমি কথা দিয়েছিলে বিয়ের আগে আমাদের—

বলেছি ত—যাকগে ঐ নিয়ে আর তর্ক করতে ইচ্ছা নেই আমার। বলে ইন্দ্রজিৎ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

জান—আমি হয়ত জোর করে পড়তে পারতাম। কিন্তু করি নি তা। কারণ প্রথমতঃ এমন একটা ঘৃণা আমার মনে জমে উঠেছিল যে,

আমার আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে প্রবৃত্তি হয় নি যেমন তেমনি দ্বিতীয়তঃ বুঝতে পেরেছিলাম পাস করলেও তোমার বন্ধু আমাকে ডাক্তারী করতে দেবে না—তাই শেষ পর্যন্ত আর কলেজে না যাওয়াই স্থির করলাম। সেই সঙ্গে তোমার উপরেও আমার অভিমান হয়েছিল—তোমার জন্যই ত সব ঘটলো। তুমি যদি সেদিন ইন্দ্রজিৎকে বিয়ে করার জন্য আমায় না অনুরোধ জানাতে আমার জীবনের এতদিনকার বাসনাটার হয়ত এমনি করে আমাকে গলা টিপে সেদিন মারতে হতো না। তারপর এও মনে ভেবেছি—কি হবে আর ডাক্তার হয়ে। তুমিই যখন আমার প্রসারিত হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলে না তখন আর আমার ডাক্তার হওয়ার মূল্যই বা কি? আমি ত স্বাধীন ভাবে ডাক্তারী করতে চাই নি—চেয়েছিলাম তোমার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ডাক্তারী করতে।

বিবাহিত জীবনের তৃতীয় দিনেই এলো আমার 'পরে ঐ আঘাত। মনে মনে ভেবেছিলাম সেদিন, ঠিক আছে সংসারই করবো—আদর্শ গৃহিণীই হবো। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। কিন্তু সে প্রত্যাশায় ও সংকল্পেও আমার আঘাত হানলো ইন্দ্রজিৎ।

আচ্ছা তোমার ঐ বন্ধুটিকে কি তুমি চিনতে না? মানুষটা যে কত বড় স্বার্থপর, কত নীচ তা কি তুমি জানতে না?

জান—তিলে তিলে আমায় সে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে। তিন তিনটে বছর ধরে আমি সহ্য করে করে অবশেষে আমি ঐ পথ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম।

যাক, সে কথা। আমার বেদনার, আমার লজ্জার ইতিহাস আর তোমাকে শুনিয়ে কি হবে আর লাভই বা কি।

হঠাৎ মনে হলো তোমার চেষ্টায় নতুন জীবন পেয়ে—নতুন করে আবার বাঁচবো সি আই টি রোডের ঐ ফ্ল্যাটে নয় অন্য কোথাও গিয়ে। অথচ ভেবে পাচ্ছিলাম না—কোথায় যাবো—কি করবো। কিভাবে আবার জীবনটাকে শুরু করবো।

তোমাকে বললে হয়ত সাহায্য পেতাম কিন্তু কেন তোমাকে বলবো?

তুমি আমার কে ? তুমি ত আমায় ত্যাগ করেছো তিন বছর আগে তবে আজ আবার সামনে গিয়ে কেন কাঙ্গালের মত দাঁড়াবো।

কিন্তু যেতে হলেও তো হাতে কিছু অর্থের প্রয়োজন—এক কাপড়ে চলে যেতে পারি কিন্তু তারপর।

সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হলো শূন্য হাতেই বের হয়ে পড়বো। দেখি সেই নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতা যিনি আমার জীবনটা নিয়ে এমনিভাবে খেলা শুরু করলেন তার মনে আরো কি আছে। আরো কি ভাগ্য আমার ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রেখেছে। হ্যাঁ, তাই চলে যাচ্ছি। কাল সকালে এসে তুমি আমার এই চিঠি যখন পাবে—আমি তখন পথে। দূর থেকেই তোমাকে প্রণাম জানাচ্ছি।

তোমার কঙ্কণা—

চিঠিটা অনেকক্ষণ পড়া হয়ে গিয়েছে।

চিঠিটা হাতের মধ্যে ধরে শয্যার উপর বসে ছিল নীলাদ্রি।

আজ কিন্তু নীলাদ্রির শূন্য মনের মধ্যে একটা কথাই হাহাকার করে ফিরছে—কেন—কেন সেদিন আমি বুঝতে পারলাম না।

ইন্দ্রজিতের কথাটা শুনেই কেন শেষ মীমাংসা করে ফেললাম।

কিন্তু আর ভেবে কি হবে ?

তিন তিনটি বৎসর অল্প সময় নয়।

॥ ৪ ॥

গায়ের কাপড়টা ভাল করে টেনে মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে কেবিন থেকে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বের হয়ে এলো কঙ্কণা।

অত বড় হাসপাতালটা একেবারে নিঝুম হয়ে গিয়েছে।

অন্ধকার শীতের রাত।

হাসপাতাল থেকে বের হয়ে রাস্তায় পড়ে—একবার উপরের দিকে তাকাল কঙ্কণা। মাথার উপর আকাশটা আবছা—আবছা মধ্যরাত্রির বোধহয় কুয়াশা জমছে। একটি নক্ষত্রও চোখে পড়ে না।

গেট পার হয়ে এসে ট্রাম লাইনের উপর দাঁড়াল কঙ্কণা, পশ্চাতে হাসপাতালটার দিকে একবার তাকাল—বাড়িগুলো আবছা আবছা—তারই মধ্যে ওয়ার্ডের আলোগুলো ক্ষীণ একটা ইশারা দিচ্ছে যেন।

সব দোকানপাট বন্ধ।

ইস্পাতের জোড়া ট্রাম লাইন যেন চকচকে রূপালী চওড়া ফিতের মত পাশাপাশি চলে গিয়েছে—খালের উপরে পুলটা—পুল পার হলো কঙ্কণা। জনমানবহীন রাস্তা একেবারে যেন খা-খা করছে।

রাস্তার দু'ধারে ইলেকট্রিক আলোগুলো শুধু নিদ্রাহীন এক চক্ষু মেলে যেন রাত প্রহরীর কাজ করছে।

কঙ্কণা হাঁটতে লাগল।

মার কাছে ফিরে যেতে পারত কিন্তু মনের মধ্যে কোথায়ও সেরকম তাগিদ যেন অনুভব করল না। মা হয়ত এ যাত্রা তার আত্মহত্যা করার চেষ্টার সংবাদটা পায় নি। তাছাড়া দাদা সতীনাথ—এ যুগে জন্মালেও তার মনটা অনেক আগের যুগের—স্বামীর ঘর ত্যাগ করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কোন মতেই সে কঙ্কণাকে ক্ষমা করতে পারবে না। হয়ত সঙ্গে সঙ্গে সে ইন্দ্রজিৎকে সংবাদ দেবে।

তার অর্থ আবার সেই নাগপাশ। যে নাগপাশকে সে ছিন্ন করবার

জন্যই মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছিল—আবার সেই নাগপাশ সে গলায় তুলে নেবে।

না। না—সমস্ত মনটা যেন কঙ্কণার বিদ্রোহ করে ওঠে।

সেখানে ত নয়ই আর—এই কলকাতা শহরেও আর নয়। কঙ্কণা সোজা হাওড়া স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল ফুটপাথ ধরে।

মধ্যে মধ্যে দু-একটা প্রাইভেট ও ট্যাক্সী গাড়ি এদিক থেকে ওদিকে ছুটে চলে যায় শব্দের ঝড় তুলে রাত্রির স্তব্ধতায়।

একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে।

শেষ রাতের দিকে কঙ্কণা হাওড়া ব্রীজের উপর এসে পড়লো। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা চোখে মুখে শির শির করে লাগে।

হঠাৎ ঐ সময় মনে পড়লো বড়মামা পিনাকীভূষণ দত্তর কথা। বিচিত্র ঐ মানুষটি ওর বড়মামা পিনাকী ভূষণ।

লেঃ কর্নেল পিনাকীভূষণ দত্ত—আই-এম-এস (রিঃ)।

ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা—পেটানো লোহার মত শক্ত শরীর। পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে কি করে যেন টাকার যোগাড় করে বিলেত চলে যান জাহাজে চেপে। বিলেত থেকেই এফ-আর-সি-এস হয়ে ও আই-এম-এসের চাকরি নিয়ে ইণ্ডিয়াতে ফিরে এসেছিলেন।

প্রথম পোস্টিং আলমোড়া ক্যাণ্টনমেণ্ট হাসপাতাল। প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক বছর চারেক পরের ঘটনা।

হটাৎ চাকরি ছেড়ে দিলেন বছর দশেক চাকরি করার পর—বিয়ে থা জীবনে করেন নি। ব্যাচিলার মানুষ।

বর্তমানে নৈনিতালের কাছাকাছি যেন কোথায় একটা মিশনারী হাসপাতালে আছেন। বছর পাঁচেক আগে বহুকাল পরে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। সেই সময় কঙ্কণা তাকে দেখেছিল।

হাসিখুশি দিলখোলা মানুষটি।

যখন শুনলেন কঙ্কণা ডাক্তারী পড়ে—তার পিঠে একটা মৃদু চড় বসিয়ে বলেছিলেন, তা হ্যাঁরে—হঠাৎ তোর ডাক্তারী পড়ার সাধ হলো কেন রে, টুম্পা—

টুম্পা কঙ্কণার ডাকনাম।

কেন—ডাক্তার হবো—ডাক্তারী করবো তাই—

কিন্তু মা—তুই যে এদেশে মেয়ে হয়ে জন্মেছিস—

তাতে কি হলো ?

বিয়ে ত একদিন করতেই হবে—

মনের মধ্যে তখন নীলাদ্রি তার সবটাই জুড়ে আছে।

কঙ্কণা মৃদু হেসে বলে, তাতে কি ?

স্বামী যদি ডাক্তার না হয়—আর ডাক্তার হলেও—

কি মামা ?

ক্ল্যাশ বাধান।

না না—তা হবে না।

I wish যেন না হয়—তবে হলে কি করবি মা ?

তুমি দেখে নিও মামা—কিছুই সেরকম হবে না।

হঠাৎ আজ হাওড়া ব্রীজের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই মামার কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের সেই কথাটাই মনে পড়ে গেল কঙ্কণার।

আশ্চর্য !

মামা কি অন্তর্যামী ছিলেন।

মামা আরও বলেছিলেন, না হলেই ভাল টুম্পা—তবে ডাক্তার হয়ে যেন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকিস না—actual field-এ যখন নামবি তখন দেখবি—একজন ডাক্তারের জীবন কি। ডাক্তারীর সঙ্গে কোন প্রফেশানেরই তুলনা হয় না।

মামার কথা মনে হতেই মনে হয় কঙ্কণার সোজা মামার কাছে গেলে কেমন হয়—নৈনিতাল গিয়ে কি আর সে মামাকে খুঁজে বের করতে পারবে না।

নিশ্চয়ই পারবে।

কিন্তু সেখানে যাবার টিকিটের দাম যে অনেক—অত টাকা ত দূরের কথা হাত যে তার একেবারে শূন্য।

হাওড়া স্টেশনে মানুষের ভিড়ের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে মাথায় ঘোমটা টেনে নিজেকে আড়াল করে করে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল কঙ্কণা।

কিছু টাকার দরকার।

হঠাৎ হাতের সোনার চুড়ি দু'গাছির দিকে নজর পড়লো।

মায়ের দেওয়া চুড়ি—স্বামী ইন্দ্রজিতের দেওয়া নয়। তার দেওয়া কোন অলঙ্কারই সে স্পর্শ করে নি একদিনের জন্যও।

তার দেওয়া সব কিছু—তার স্বামীর আলমারির মধ্যেই ভরে রেখে দিয়েছে—চাবিটা ইন্দ্রজিতের টেবিলের ড্রয়ারে রাখা আছে।

হ্যাঁ, ঐ চুড়ির একটা চুড়ি বিক্রি করেই ত সে কিছু টাকা পেতে পারে—কথাটা মনে হতেই কঙ্কনা স্টেশন থেকে বের হয়ে পড়ল।

কঙ্কণা বুঝতে পেরেছিল যে অলঙ্কারের দোকানে সে হাওড়ায় চুড়িটা বিক্রি করেছে তারা ঠকিয়েছে, কিন্তু অতশত ভাবতে গেলে তখন তো চলে না। শ'চারেক টাকা ত সে পেয়েছে—তাতেই তার চলে যাবে।

রাত্রে টেনে উঠে বসে কঙ্কণা যেন নিশ্চিন্ত হয়। সঙ্গে জামাকাপড় ছিল না। টুকিটাকি জিনিসেরও প্রয়োজন ছিল। ট্রেনে ওঠার আগেই কঙ্কণা সব কিনেকেটে নিয়েছে—ছোট একটা সুটকেশ কিনে তার মধ্যে সব ভরে নিয়েছে।

যাচ্ছে ত সে নৈনিতাল—চলন্ত ট্রেনের কামরায় খোলা জানালাটার সামনে বসে ভাবছিল কঙ্কণা সঙ্গে তার কোন গরম জামাকাপড় নেই—ঠাণ্ডার জায়গা, হয়ত গিয়ে কষ্ট হবে—ইচ্ছা ছিল একটা গরম র‍্যাপার কিনবার কিন্তু টাকায় কুলাতে পারে নি।

টিকিট ও কিছু জামাকাপড় কিনেই প্রায় সব ফুরিয়ে গিয়েছে হাতে মাত্র পঞ্চাশটি টাকা আছে। বছর চারেক আগে যেবার সে ফাইন্যাল ইয়ারে পড়ে শেষ দেখা হয়েছিল মামা পিনাকীভূষণের সঙ্গে। তখুনি শুনেছিল কঙ্কণা পিনাকীভূষণ নৈনিতালে থাকেন।

গরমে নাকি ভারি কষ্ট হয় পিনাকীভূষণের—তাই পাহাড়ী ঠাণ্ডার জায়গা নৈনিতালে গিয়ে সেটেলড্ হয়েছেন।

কঙ্কণাকে বলেছিলেন পিনাকীভূষণ, এবার এসে ঘুরে যাস না নৈনিতালে—you will enjoy this place.

গত চার বছর মামার কোন সংবাদ জানে না কঙ্কণা—নৈনিতালে এখনও আছেন কিনা—মানুষটা বেঁচে আছেন কি না কে জানে? নৈনিতালের উদ্দেশে সে ত ট্রেনে চেপে বসেছে। কাল বিকেলের দিকে ট্রেন লক্ষ্মৌ পৌঁছাবে। সেখান থেকে রাত্রে কাঠগুদামের ট্রেন ধরতে হবে—অবিশ্যি সে কাঠগুদাম পর্যন্ত টিকিট কেটে নিয়েছে।

সারা দিনের ঘোরাঘুরিতে বেশ ক্লান্ত লাগছিল নিজেকে কঙ্কণার—দুপুরের দিকে একটা রেস্টুরেণ্টে ঢুকে দু'পিস মাখন রুটি ও এক কাপ চা খেয়েছিল শুধু। বেশ ক্ষিধেও পেয়েছে—গাড়ি থামবে সেই বর্ধমানে। তার আগে বোধহয় কোন স্টপেজ নেই এই ডাকগাড়ির। ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে।

নীলাদ্রির কথা আবার মনে হয় কঙ্কণার। চিঠিটাও নিশ্চয়ই পেয়ে গিয়েছে সে—নীলাদ্রি যদি তার জীবনটা ইন্দ্রজিতের হাতে সেদিন না তুলে দিত—আজ হয়ত তাকে এমনি করে স্রোতের শ্যাওলার মত ভেসে চলতে হতো না।

আশ্চর্য নীলাদ্রি বুঝতে পারল না—তার সমস্ত বুকটা জুড়ে যে সেদিন সেই ছিল সেটা সে বুঝতে পারল না।

বুঝতে পারল না, না কঙ্কণাকে ইচ্ছা করেই সেদিন সে ইন্দ্রজিতের হাতে তুলে দিয়েছিল।

না। আর না—আর পিছন পানে ফিরে তাকাবে না সে।

জীবনের যে অধ্যায়টা সে শেষ করে দিয়ে এলো, সে অধ্যায়টা তার মন থেকে একেবারে মুছেই ফেলবে সে।

ইন্দ্রজিৎও নয়, নীলাদ্রিও নয়।

অনেক দয়া তোমার নীলাদ্রি।

আমাকে তুমি জীবনদান করেছো—নতুন করে আবার পড়া শুরু করে ডাক্তারীটা পাস করতেও বলেছিলে।

কিন্তু না! কঙ্কণার জন্য আর তোমার না ভাবলেও চলবে।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ট্রেনটা ছুটে চলেছে। কলকাতা শহর থেকে সে দূরে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।

ইন্দ্রজিৎ কি সত্যিই আর ফেরে নি।

ফেরার ত তার আর প্রয়োজন নেই—সে ত স্পষ্ট করেই সেদিন তার মনের কথাটা বলে দিয়েছিল। খবরটা—শ্যামলীর খবরটা কঙ্কণার কাছে চাপা ছিল না। বিবাহের সাত মাস পর থেকেই—এবং যে সংবাদটা কঙ্কণার কাছে নিদারুণ এক লজ্জা ও দুর্বিষহ এক অপমান বহন করে এনেছিল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড একটা বিতৃষ্ণা।

একই সঙ্গে—একই বছরে পাস করেছিল কমপিটিটিভ পরীক্ষায় ইন্দ্রজিৎ আর শ্যামলী। কিন্তু চাকরিতে পোস্টিং হলো দু'জনার দুই জায়গায়

ইন্দ্রজিৎ বিয়ে করে যখন কঙ্কণাকে নিয়ে সংসার পেতেছে—সাত মাস হয়েছে মাত্র—শ্যামলীও কলকাতায় বদলী হয়ে এলো।

দু'জনার দেখা সাক্ষাৎ হলো। আর সেই শুরু হলো ইন্দ্রজিতের মধ্যে পরিবর্তন।

পরিবর্তনটা প্রথম প্রথম টের পায়নি কঙ্কণা। ইন্দ্রজিৎ তাকে বুঝতে দেয় নি। কিন্তু ব্যাপারটা তার কাছে গোপন থাকল না।

কানাঘুষায় প্রথমে এ-ওর কাছে শুনেছে কথাটা কঙ্কণা—কিন্তু বিশ্বাস করতে চায় নি—

শ্যামলী হঠাৎ মালদায় বদলী হবার পর ইন্দ্রজিৎ প্রায়ই যেতে লাগল মালদায়।

দু'সপ্তাহ তিন সপ্তাহ পর পরই দু-তিন দিনের জন্য ইন্দ্রজিৎ মালদায় যায়।

কঙ্কণা তখন একদিন শুধালো, এত ঘন ঘন তুমি মালদায় যাও কেন?

কাজ থাকে তাই যাই—ইন্দ্রজিৎ জবাবে বলে।

সরকারী কাজ?

তাছাড়া আর কি।

কেবলই মালদাতেই তোমার সরকারী কাজ পড়ে বুঝি?

কি বলতে চাও তুমি ? রুক্ষভাবে পালটা প্রশ্ন করে ইন্দ্রজিৎ।

মালদা থেকে তাই বুঝি তোমার প্রায়ই ট্রাঙ্কল আসে ?

হ্যাঁ।

সেদিন আর বেশী কিছু বলে নি কঙ্কণা। চুপ করেই গিয়েছিল। ঐ ঘটনারই মাস দুই পরে জানতে পারল ইন্দ্রজিতের অনুপস্থিতিতে এক রাত্রে শ্যামলীর মালদা থেকে ট্রাঙ্ককল আসায় ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে।

কঙ্কণা ফোন ধরে বলেছিল, কে কথা বলছেন।

আপনি কে ? প্রশ্ন এসেছিল।

শ্যামলী বসু নামটা কঙ্কণার অপরিচিত ছিল না—অনেকবার স্বামীর মুখে শুনেছে। মালদা থেকে ফোনকল অনুমানেই কে ফোন করছে বুঝতে পেরে কঙ্কণা জবাব দেয়, আপনি বোধহয় শ্যামলী বসু ?

হ্যাঁ। আপনি ইন্দ্রজিৎকে একটিবার ডেকে দিন।

সে ত বাড়িতে নেই—

কে কথা বলছেন আপনি ?

ইন্দ্রজিতের স্ত্রী—

সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রান্তে শ্যামলী ফোনটা ছেড়ে দিয়েছিল।

সেই দিনই অনেক রাত্রে ইন্দ্রজিৎ ফিরে এলে বলেছিল তাকে, শ্যামলী বসু ফোন করেছিল।

কখন।

রাত তখন পৌনে ন'টা হবে—

ইন্দ্রজিৎ বললে, তুমি কি বলেছো।

তুমি বাড়িতে নেই—তাই বলেছি।

কথাটার ঐখানেই সমাপ্তি ঘটবে ভেবেছিল কঙ্কণা তাই সে ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু ইন্দ্রজিতের কথায় সে বিস্ময়ে ফিরে দাঁড়াল।

কেন আমার অফিসে লাইনটা দিতে বললে না কেন।

তুমি যে অফিসে ঐ সময় থাকবে তা ত বলে যাও নি।

বলার কি আছে—এ তো কমনসেন্স।

কঙ্কণা আর স্বামীর কথায় জবাব দেবে না বলেই দ্বিতীয়বার ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

দাঁড়াও—শোন—

কি বলছো। ঘুরে দাঁড়াল কঙ্কণা।

আমি বেরুচ্ছি—

এত রাত্রে কোথায় যাবে?

কোথায় যাবো, না যাবো সে জবাব আমি তোমায় দেবো?

মালদায় বোধহয়—

কঙ্কণা। তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর ইন্দ্রজিতের।

কিন্তু এর কি প্রয়োজন ছিল বলতে পার? ঐ শ্যামলীকেই যদি তোমার প্রয়োজন ছিল ত আমাকে বিয়ে করার জন্য নীলাদ্রিবাবুর কাছে ছুটে গিয়েছিলে কেন, তাঁকে দিয়ে আমাকে অনুরোধ করাতে।

দুঃখ হচ্ছে বুঝি সে জন্য—

কি বললে?

জানি—জানি—আমি পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

কি বুঝতে পেরেছিলে?

তা নীলাদ্রির প্রতিই যদি তোমার মন এতটা আকৃষ্ট হয়েছিল সে কথাটা ত আমায় স্পটাস্পষ্টি বলে দিলেই পারতে।

হ্যাঁ—ছিল—কিন্তু নিজের কথাটা পরিষ্কার করবার জন্য ঐ ছুতোটার তোমার প্রয়োজন নেই—

কি বললে?

ঠিকই বলেছি অনায়াসেই তুমি শ্যামলীর কাছে চলে যেতে পারো।

হ্যাঁ—হ্যাঁ তাই যাবো—

যাবে কেন—এখুনি যাও। কথাটা বলে কঙ্কণা আর দাঁড়ায় নি ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

বস্তুতঃ কঙ্কণা কোন দিনই মন থেকে ইন্দ্রজিৎকে গ্রহণ করতে পারে নি, ইন্দ্রজিৎ অকস্মাৎ একদিন এসে যখন বিবাহের প্রস্তাব জানালো

তার কাছে—তার দাদা সতীনাথের পরামর্শ মত কঙ্কণা ব্যাপারটায় অগ্রসর হবার মত কোন প্রশ্রয় দেয় নি। অথচ সে শুনেছিল তার মার কাছেই কয়েকদিন আগে তার মা ও তার দাদার একান্ত ইচ্ছা ঐ ইন্দ্রজিৎকেই সে বিবাহ করে।

কিন্তু ইন্দ্রজিৎ নিরস্ত হলো না—বার বার এসে বিবাহের প্রস্তাব দিতে লাগল।

অথচ কঙ্কণা কোন মতেই দাদাকে জানাতে পারল না নীলাদ্রিই তার সমস্ত মনটা অধিকার করে আছে।

নীলাদ্রির কাছ থেকে ত সামান্যতম ইঙ্গিতও কোন দিন সে পায় নি—তবে কেমন করে কোন লজ্জায় সে দাদাকে কথাটা বলবে। আর দাদা যদি সে কথাটা নীলাদ্রিকে জানায় সে লজ্জাই বা সে রাখবে কোথায়?

অনন্যোপায় হয়ে তখন কঙ্কণা পড়াশুনার কথাটা তুললো এবং ব্যাপারটা ঐ মুহূর্তে এড়াবার জন্য ফাইনাল পরীক্ষাটা পাস করার কথাটা বললে।

সতীনাথ আর তার মা কিন্তু দেরি করতে রাজী নয়।

ডাক্তারী পাস করবার পরও ত বিয়ের প্রশ্নটা আসবে তখন ইন্দ্রজিতের মত পাত্র পাবে কোথায়?

সতীনাথ বললে, ও তো বলছেই তোর পড়াশুনায় ইন্দ্রজিৎ বাধা দেবে না।

না দাদা, আগে পাস করি তারপর বিয়ে।

মা ছেলেকে বললেন, তুই বরং এক কাজ কর সতু।

কি মা?

নীলুর কথা ও খুব শোনে, নীলুকে মান্যও করে—ইন্দ্রকে বল নীলুকে গিয়ে বলতে সে যদি বলে হয় ত আর আপত্তি করবে না।

ঠিক বলেছো মা—আমি আজই ইন্দ্রকে জানাবো কথাটা।

ইন্দ্রজিৎকে পছন্দ করবার অনেক কারণ ছিল সতীনাথের। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। দেখতে শুনতে যেমন লেখাপড়ায়ও তেমনি চৌকস, তা ছাড়া ভাল চাকরি করছে।

এবং নীলাদ্রির কথাটা কখনো তার মনেও হয় নি।

ইন্দ্রজিৎকে কথাটা বলতে সঙ্গে সঙ্গে সে রাজী হয়ে গেল। পরের দিনই সে সন্ধ্যার পর নীলাদ্রির মেসে গিয়ে তাকে কথাটা বললে।

সবকিছুই কঙ্কণা জানতে পেরেছিল কথায় কথায় মার কাছ থেকেই। কিন্তু তখন কঙ্কণার মনটা অভিমানে ভরে আছে।

প্রচণ্ড একটা অভিমান নিয়ে কঙ্কণা বিবাহে সম্মতি দিয়েছিল এবং বিবাহের পর সে নিজেকে বুঝিয়ে ছিল, ইন্দ্রজিৎকে নিয়েই সে সুখী হবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু পারেনি সে। কারণ ইন্দ্রজিৎই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিবাহের পর প্রবল আঘাত এলো ইন্দ্রজিৎ যখন তার পূর্ব চুক্তি ভঙ্গ করে জানাল যে সে চায় না কঙ্কণা আর পড়াশুনা করুক।

তর্কাতর্কি হলো কিছুটা কিন্তু ইন্দ্রজিৎ তার সিদ্ধান্তে অটল।

তারপর দ্বিতীয় আঘাত এলো শ্যামলীর ব্যাপারে, কঙ্কণার মনটা ইন্দ্রজিতের প্রতি বিতৃষ্ণায় যেন জমাট বেঁধে গেল।

কিন্তু তথাপি কঙ্কণা আর দশটি মেয়ের মতই সংসার করে গেছে। একটা মৃতদেহ যেন বহন করে গেছে। এবং নিজেকে একেবারে ইন্দ্রজিতের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

কঙ্কণা প্রতিজ্ঞাই করেছিল ইন্দ্রজিতের কোন ব্যাপার নিয়ে আর সে মাথা ঘামাবে না। ক্রমশঃই দু'জনা দু'জনার কাছ থেকে সরে যাচ্ছিল।

ইন্দ্রজিৎ হঠাৎ হঠাৎ চলে যেতো মালদায়। দু'তিন দিন পরে আসতো।

কঙ্কণা একান্ত নিস্পৃহ।

ঐভাবে আরো দু'টো বছর চলে গেল এবং ঐ সময়ের মধ্যে কঙ্কণা একটি দিনের জন্যও মা বা দাদার কাছে যায় নি।

দাদা সতীনাথ যাবার কথা বললে, কঙ্কণা বলেছে, সংসার দেখবে কে?

সতীনাথ বলেছে, কী এমন তোর সংসার রে টুম্পা, দু'জনের মাত্র সংসার—এক বেলার জন্যও আমাদের ওখানে যেতে পারিস না।

পারলে কি আর যেতাম না দাদা?

তা নয় বল—ইন্দ্র বোধহয় তোর যাওয়াটা পছন্দ করে না তাই না ?

কঙ্কণা প্রত্যুত্তরে মৃদু মৃদু হেসেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কঙ্কণার সেই কঠিন ধৈর্যের সমাপ্তি ঘটলো। ইন্দ্রজিৎ যেদিন বললে, এক মাসের ছুটি নিয়েছে সে—শিলং বেড়াতে যাচ্ছে।

কঙ্কণা কথাটা শুনলো—শুনেও চুপ করে থাকল।

ইচ্ছা করলে এই এক মাস তুমি তোমার দাদার কাছে গিয়ে থাকতে পারো—ইন্দ্রজিৎ বললে।

একা একা থাকতে যদি অসুবিধা হয় তাই বলছিলাম।

না, কোন অসুবিধা হবে না।

ঠিক ঐ সময় দরজার কলিং বেলটা বেজে উঠলো।

ইন্দ্রজিৎ কলিং বেল শুনে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই শ্যামলী এসে ঘরে ঢুকল। এর আগে কখনো শ্যামলী ঐ ফ্ল্যাটে আসে নি—ঐ প্রথম।

শ্যামলী, তুমি ?

আমার শিলং যাওয়া হবে না বোধহয়।

সে কি ? কেন ?

ছুটি স্যাংসন হয় নি।

ননসেন্স—আমি ডেপুটি সেক্রেটারীকে বলবো।

কঙ্কণা ঐসময় ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সন্দেহ আগেই হয়েছিল কঙ্কণার—সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল অতঃপর।

কঙ্কণার পাশের ঘর থেকে শ্যামলীর কণ্ঠস্বরটা কানে এলো। শ্যামলী বলছে, তোমার স্ত্রী ?

হ্যাঁ।

চলে গেলেন।

যাক গে—তুমি কোথায় উঠেছো ?

হোটেলে।

ঠিক আছে, তুমি হোটেলে ফিরে যাও। আমি অফিসে যাচ্ছি

সেক্রেটারী মিঃ মল্লিককে বলে ছুটি স্যাংসন করিয়ে নেবো। কাল সকালের প্লেনেই আমরা যাচ্ছি।

তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে না।

না, ও আলাপ করার মত মানুষই নয়।

কিন্তু তুমি যে বলেছিলে তোমার স্ত্রী এখানে থাকেন না।

থাকেই তো না—কাল হঠাৎ এসেছে।

আচ্ছা আমি তাহলে চলি।

এসো।

সেই রাত্রেই—

ইন্দ্রজিৎ অফিস থেকে ফিরে আসতেই কঙ্কণা সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে—

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল কঙ্কণার দিকে ইন্দ্রজিৎ, কি কথা—

এভাবে চলতে তো পারে না।

হুঁ! তা বল কি বলতে চাও, স্পষ্ট করে যা বলবার তোমার বল।

আমাদের দুজনার জীবনের মধ্যে আর একজন মধ্যবর্তিনী সর্বদা তার—

মধ্যবর্তিনী।

হ্যাঁ—তোমার শ্যামলীর কথা বলছি।

তাহলে তুমিও শুনে রাখ—শ্যামলী আছে এবং থাকবে—

এটাই তাহলে তোমার স্থির প্রতিজ্ঞা।

হ্যাঁ, আর কিছু বলবার আছে।

না—একটা কথার কেবল জবাব দাও, শ্যামলীকে তুমি কি বিয়ে করতে চাও!

অবান্তর প্রশ্ন। আমি এখন হোটেলে চললাম—কাল মালদা যাবো—সেখান থেকে শিলং যাবো—

পাথরের মতই দাঁড়িয়ে রইলো কঙ্কণা—স্বামীর কথার একটি জবাবও দিল না। মানুষটার নির্লজ্জতা যে এমনভাবে সব কিছুকে ছাড়িয়ে যেতে পারে তা যেন কঙ্কণার চিন্তারও অতীত ছিল।

একটা সুটকেশে জামাকাপড় ও টুকিটাকি জিনিস গুছিয়ে নিয়ে ইন্দ্রজিৎ যাবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই কঙ্কণা বললে, শুনে যাও—আমি চাই না যে তুমি আর এখানে ফিরে আসো—

এটা আমার ফ্ল্যাট—আমিই মাসে মাসে এটার ভাড়া দিই। কাজেই আমার যখন খুশী আমি আসবো। তোমার ইচ্ছা হলে তুমিই এখান থেকে চলে যেতে পারো।

কথাগুলো বলে ইন্দ্রজিৎ আর দাঁড়াল না। সুটকেশটা হাতে ঝুলিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তারপরও অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে পাথরের মতই দাঁড়িয়ে ছিল কঙ্কণা। যে দ্বন্দ্বটা মনের মধ্যে তার এতদিন ধরে চলছিল—সেটারই যেন শেষ মীমাংসা জানিয়ে দিয়েই ইন্দ্রজিৎ চলে গেল।

এরপর কি?

এই লজ্জা আর অপমানের বোঝা মাথায় নিয়েই কি কঙ্কণা ইন্দ্রজিতের এই ঘরে পড়ে থাকবে? কিন্তু যাবেই বা কোথায়? এক মা ও দাদার কাছে ফিরে যেতে পারে—কিন্তু এই লজ্জা আর অপমান—এ তো সে মুছে ফেলতে পারবে না।

তাছাড়া কি বলবে সেখানে গিয়ে?

স্ত্রীলোকের এত বড় লজ্জার কথা কেমন করে মা ও দাদার কাছে গিয়ে উচ্চারণ করবে? এ থেকে নিষ্কৃতি পাবার আর কি পথ আছে?

তারপর একটা রাত ও একটা দিন ধরে কঙ্কণা কেবল ভেবেছেই। কিন্তু কোন পথই সামনে দেখতে পায় নি।

নিরবচ্ছিন্ন একটা লজ্জা আর শুধু লজ্জা।

তারপরই মুক্তির পথটা খুঁজে পেয়েছিল বুঝি কঙ্কণা।

হ্যাঁ, মুক্তি!

বেলা দেড়টা নাগাদ নৈনিতালে পৌঁছে বেশ কিছুক্ষণ খুঁজতে হয়েছে কঙ্কণাকে কর্নেল পিনাকীভূষণের ডেরাটা।

অবশেষে বাজারে একটা স্টেশনারী দোকানের সিন্ধি মালিক বললে, আপ কর্নেল দত্ত ডাকটার সাবকো কোঠি ঢুরতে হে ?

জী, আপ জানতে হে—

কিউ নেহি—

বলেই সিন্ধি ভদ্রলোক তার দোকানের এক ছোকরাকে ডেকে বললে, কিষণ—মাইজীকো কর্নেল সাবকো কোঠি দেখা দো—

কিষণ বললে, চলিয়ে মাইজী।

পাহাড়ের উপরে বাংলো মত একটা ছবির মত বাড়ি। চারিপাশে ঘন গাছপালা, তারই ফাঁক দিয়ে নীচের লেকের অনেকটা চোখে পড়ে।

আশে পাশে আরো কয়েকটি ঐ ধরনের বাংলো বাড়ি আছে।

পিনাকীভূষণ বাড়িতে ছিলেন না। দ্বিপ্রহরে আহারের পর প্রত্যহ তিনি শহরে টহল দিতে বের হন। সেদিনও বের হয়ে গিয়েছেন।

মধ্যবয়সী একটি পাহাড়ী ভৃত্য প্রতাপ সিং। সে বাড়িতে ছিল। কিষণের ডাকে দরজা খুলে সে বের হয়ে এলো।

কর্নেল সাব তো নেহি হ্যায়—প্রতাপ বললে।

নেহি হ্যায়—বাহার গিয়া ? কঙ্কণা শুধালো।

জী, ঘুমনে গিয়া—

ঠিক আছে আমি বসছি।

কঙ্কণা কিষণকে বিদায় দিয়ে ঘরের সামনে বারান্দায় একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

নিজেকে বড্ড পরিশ্রান্ত লাগছিল, বেশ ঠাণ্ডা হলেও অনেকটা পথ চড়াই উঠে এসে বেশ গরমই লাগছিল।

প্রতাপ শুধায়, আপনি কে ? কোথা থেকে আসছেন ? আপনি কি কর্নেল সাহেবকে দেখাতে এসেছেন ?

কঙ্কণা মৃদু হেসে বললে, না—

কর্নেল সাহেবের কোন আত্মীয় আপনি ?

হ্যাঁ—

তাহলে ভিতরে গিয়ে বসুন না।

না, না—এখানেই বেশ আছি। কি নাম তোমার ?

জী প্রতাপ। আপ চলিয়ে না মাঈজী—অন্দর মে যাকে বৈঠিয়ে।

তুমি ব্যস্ত হয়ো না প্রতাপ—

কর্নেল সাব চার সাড়ে চার বাজে লোটেগেঁ।

পিনাকীভূষণ এলেন প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে। প্রতাপ জানত না—সেদিন পিনাকীভূষণ এক পরিচিত বন্ধু ওখানে এক হোটেলে এসে উঠেছেন সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

বারান্দায় চেয়ারের উপরে তখনো কঙ্কণা বসেছিল। আবছা আবছা অন্ধকার। পিনাকীভূষণের ঐ দিকে নজর পড়তেই বললেন, কে —কে ওখানে বসে ?

পিনাকীভূষণের গলার সাড়া পেয়ে কঙ্কণা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কে ?

মামা আমি—আমি টুম্পা।

What ? আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন পিনাকীভূষণ—

What a surprise—টুম্পা—really—টুম্পা ?

বলতে বলতে এগিয়ে এলেন পিনাকীভূষণ—কখন এলিরে ?

দুপুরে—

তা এখানে এই ঠাণ্ডায় বাইরে বসে আছিস কেন ! চল চল ঘরে চল— প্রতাপ, এই প্রতাপ।

প্রতাপ ছুটে আসে মনিবের গলার সাড়া পেয়ে।

এই হতভাগা—দিদিমণিকে তুই বাইরে বসিয়ে রেখেছিস ?

না, না মামা, কঙ্কণা বলে ওঠে, ওর কোন দোষ নেই। ও অনেকবার বলেছে ভিতরে গিয়ে আমায় বসতে, আমিই যাই নি।

কঙ্কণাকে নিয়ে পিনাকীভূষণ ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। এক কোণে ফায়ার প্লেসে গনগনে আগুন—ঘরের মধ্যে ঢুকে কঙ্কণা যেন একট আরামের নিঃশ্বাস নেয়। বাইরে শীতে এতক্ষণ সামান্য কাপড়ে তার প্রায় কাঁপুনি ধরবার যোগাড় হয়েছিল।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই কঙ্কণার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, পিনাকীভূষণ, এ কি রে এই ঠাণ্ডায় এই পাহাড়ী জায়গায় কোন গরম জামাকাপড় না নিয়েই চলে এসেছিস। পাগল নাকি রে—

তাড়াহুড়ায় মামা চলে এসেছি।

পিনাকীভূষণ কেমন যেন প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কঙ্কণার দিকে কিছুক্ষণ।

তারপর নিজের গরম ওভারকোটটা খুলে কঙ্কণার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, put on।

না, না—

put on। নে এটা গায়ে দিয়ে নে।

কঙ্কণা আর দ্বিরুক্তি করলো না। পিনাকীভূষণের হাত থেকে কোটটা নিয়ে কোন মতে গায়ে চাপিয়ে নিল।

হাত মুখ বোধহয় ধুস নি।

না—মানে।

যা বাথরুমে গিয়ে আগে ফ্রেস হয়ে নে। প্রতাপ—

জী সাব—

গোসলখানামে গরম পানী হ্যায়—

হ্যাঁ—

যা টুম্পা—

আরো আধ ঘণ্টা পরে বাথরুম থেকে গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে জামাকাপড় বদলে কঙ্কণা এসে পিনাকীভূষণের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল।

গায়ে একটা গরম সার্জের ড্রেসিং গাউন, পরনে পায়জামা। পিনাকীভূষণ ফায়ার প্লেসের সামনে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে পাইপ টানছিলেন। ওর মুখের দিকে তাকালেন।

প্রতাপ—

সাব—

চা রেডি—

আভি লাতা হু সাব—কিচেন থেকে সাড়া দিল।

সদ্য সদ্য স্নান করে এসে ফায়ার প্লেসের গন্‌গনে আগুনের তাপে বেশ আরামই বোধ করে কঙ্কণা।

গত দুটো দিন দুটো রাত তার সমস্ত শরীরের ও মনের উপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। একটা অনিশ্চিত নিরালম্বতা যেন তাকে ঘিরে ধরেছিল। নীলাদ্রি তাকে বাঁচিয়ে তুলবার পর থেকে যে প্রশ্নটা অহরহ তাকে অস্থির করে তুলেছে এবং যে প্রশ্নটা তার সামনে এসে বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত তার মনের কালো পর্দাটার উপর ভেসে উঠেছে—অথচ কোন জবাব খুঁজে পায় নি—এই মুহূর্তে যেন নৈনীতালের এই বাংলো বাড়ির ঘরটার মধ্যে বসে তার মনে হয় এবার হয়ত একটা পথ সে খুঁজে পেলেও পেতে পারে।

প্রতাপ ট্রেতে করে একটা প্লেটে কিছু স্যাণ্ডউইচ ও চায়ের পট, পেয়ালা, চিনি, দুধ নামিয়ে রেখে গেল।

টুম্পা—

মামা—

নে, আগে কিছু খেয়ে নে।

আমি শুধু চা খাবো মামা।

না—You look not only tired but hungry too—নে—শুরু কর।

মুখে যাই বলুক কঙ্কণা, সত্যি সত্যিই তার ক্ষিধে পেয়েছিল—আর দ্বিরুক্তি করল না—স্যাণ্ডউইচের প্লেট ঢেলে গোটা দুই স্যাণ্ডউইচ তুলে নিল।

আরো আধঘণ্টা পরে প্রতাপ এসে ট্রেটা তুলে নিয়ে যাবার পর পিনাকীভূষণ পাইপটায় অগ্নি সংযোগ করে বললেন, এবারে বল—

কি বলবো—

হঠাৎ এইভাবে নৈনিতালে এসে হাজির হলি কেন?

এমনি, তোমাকে দেখতে।

কথা দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করিস না। বল কি হয়েছে?

মামা—

বল। একটা যে কিছু হয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি তোর ঝড়ো কাকের মত চেহারাটা দেখেই। হ্যাঁরে তা তুই একা এলি, ইন্দ্রজিৎ এলো না কেন?

জানি না।

জানিস না মানে?

কঙ্কণা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো তারপর মাথাটা নীচু করে মৃদু স্বরে বললে, ইন্দ্রজিতের ঘর ছেড়ে আমি চলে এসেছি।

What do you mean!

হ্যাঁ মামা—চলে আসা ছাড়া আমার সামনে আর দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না।

পিনাকীভূষণ অতঃপর যেন কয়েকটা মুহূর্ত বোবা হয়ে বসে রইলেন কঙ্কণার মুখের দিকে তাকিয়ে—তারপর একসময় ধীরে ধীরে তাকালেন ঝিমিয়ে পড়া ফায়ার প্লেসটার দিকে।

একটা রক্তাভা যেন দেওয়ালটার গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা।

ঘরের একটা খোলা জানালা পথে মধ্যে মধ্যে ঠাণ্ডা হিমশীতল নৈশ বায়ু এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে।

টুম্পা—

পিনাকীভূষণের ডাকে কঙ্কণা ওর মুখের দিকে তাকাল।

পিনাকীভূষণ বললেন, তুই না বললেও এখন আমি বুঝতে পারছি, বিশেষ কিছু একটা ঘটেছে—নচেৎ তোর মত মেয়ে এভাবে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসতিস না। তোর যদি আপত্তি থাকে তো বলতে হবে না তোকে—আমিও তোকে বলবার জন্য 'প্রেস' করবো না, কিন্তু—

ঘর আমার বিয়ের সাত মাস পরেই ভেঙে গিয়েছিল মামা, তবু

বিশ্বাস করো, আমি চেষ্টার কসুর করি নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলাম না—চমকে উঠবে হয়ত শুনে I attempted suicide!

Good God! কি বলছিস—

হ্যাঁ মামা—কিন্তু নীলাদ্রির হাতে গিয়ে পড়লাম—সেই ত আমাকে বাঁচিয়ে তুলল।

নীলাদ্রি কে?

দাদার আর এক বন্ধু—ডাক্তার—মামা একটা প্রশ্নের জবাব আমি গত আড়াই বছরেও খুঁজে পাই নি—

কিন্তু যতদূর শুনেছি ইন্দ্রজিত-ই তো তোকে পছন্দ করে বিয়ে করতে এগিয়ে এসেছিল—

সেটাই ত সবচাইতে দুর্বোধ্য মনে হয়েছে—তবে কেন সে আর একটি মেয়ের—

সত্যি বলছিস।

হ্যাঁ মামা। শ্যামলীর উপর আমার এতটুকু রাগ বা ক্ষোভ নেই—শ্যামলীকেই যদি সে মনে মনে চেয়েছিল তো আমাকে বিয়ে করতে গেল কেন?

তা শ্যামলী কে?

ইন্দ্রজিতের সঙ্গেই এক সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে চাকরী করছিল।

পিনাকীভূষণ আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। কঙ্কণা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ফায়ার প্লেসের আগুনটার দিকে।

কঙ্কণা আবার এক সময় পিনাকীভূষণের দিকে তাকিয়ে বলল, হাসপাতাল থেকে বের হয়ে, হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে অনির্দিষ্টভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মনে পড়লো তোমার কথা—শেষে হাতের একটা চুড়ি বিক্রি করে ট্রেনে চেপে বসলাম—চলে এলাম এখানে।

বেশ করেছিস।

তুমি আমার 'পরে খুব অসন্তুষ্ট হচ্ছো মামা তাই না?

না।

হচ্ছো না?

নারে, কিন্তু আমি ভাবছি—

কি ?

দিদিকে—সতীকে একটা খবর দেওয়া তো দরকার—

না-না—

খবর দিবি না ?

না। তারা জানুক আমি মরে গেছি—

সেটা কি ভাল হবে রে।

কেন হবে না। হবে—

ঠিক আছে। তবে তাই হবে। কথাটা বলে পিনাকীভূষণ আবার চুপ করে গেলেন।

কঙ্কণাও চুপ করে বসে থাকে।

॥ ৬ ॥

দিন সাতেক পরে পিনাকীভূষণ এক সন্ধ্যায় ভাগ্নীর সঙ্গে মুখোমুখি বসে প্রশ্নটা তুললেন,

কিছু ভাবছিস টুম্পা ?

কিসের কি ভাববো ?

এখন কি করবি—

বুঝতে পারছি না মামা—ভাবছি একটা চাকরি-বাকরি খুঁজে নেবো।

চাকরি-বাকরি !

হ্যাঁ—

না।

তবে !

তুই ত ফাইন্যাল ইয়ারে উঠেই কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলি।

হ্যাঁ।

ডাক্তারীটাই পাস করে ফেল—

না মামা—ও পথে আর পা দেবো না।

জানিস যেদিন সতীর চিঠিতে জানলাম তুই বিয়ের পর মেডিকেল কলেজ ছেড়ে দিয়েছিস, আমার এমন রাগ হয়েছিল না তোর 'পরে—

কঙ্কণা মৃদু মৃদু হাসছে।

হাসছিস তুই—দীর্ঘ চার বৎসরের শ্রম, প্রচেষ্টা, জ্ঞানার্জন সব মিথ্যে করে দিলি। কেন দিয়েছিলি ?

ইন্দ্রজিৎ চায় নি বলে।

বলিস কি।

হ্যাঁ মামা—যদিও সে প্রমিস করেছিল বিয়ের পর পড়াশুনায় আমায় সে কোন রকম বাধা দেবে না—কিন্তু ঠিক বিয়ের পরদিন তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আমায় জানিয়ে দিল—

কি ?

সে চায় না আমি আর পড়ি—আমারও হঠাৎ প্রচণ্ড অভিমান হলো—

আর তুইও কলেজ ছেড়ে দিলি।

হ্যাঁ—

একবারও তারপর তোর ঐ চার বছরের কথা মনে পড়ে নি ?

পড়েছে—

তবে ! না—তুই আবার পড়—

কেমন করে আর তা সম্ভব।

আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজের প্রিনসিপ্যাল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু—তাকে ধরলে সে নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

পরের দিনই বিকালে চলে গেলেন পিনাকীভূষণ রাত্রির ট্রেনটা ধরবার জন্য।

ডক্টর মিশ্র—সব শুনে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কথা দিতে পারলেন না—তবে বললেন, আমি চেষ্টা করবো দত্ত, দেখি কি করতে পারি। চিফ-মিনিস্টার আমার বিশেষ পরিচিত—তাকে বলে দেখি। আমি তোমাকে সংবাদ পাঠাবো।

ফিরে এলেন পিনাকীভূষণ দিন দুই পরে।

অনেক মেডিকেল বই ছিল পিনাকীভূষণের সংগ্রহে—কঙ্কণা আবার নতুন উদ্যমে সেই সব বইগুলোর পাতা উল্টাতে শুরু করল।

মাসখানেক বাদে ডাক্তার মিশ্রের চিঠি এলো—কঙ্কণাকে নিয়ে তিনি অবিলম্বে তাকে লক্ষ্ণৌ যেতে লিখেছেন।

এক বৎসর বাদে কঙ্কণা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাস করে বেরুল। পাশের খবর বেরুতেই কঙ্কণা ছুটে এলো নৈনিতাল—পিনাকীভূষণের কাছে।

সংবাদটা শুনে পিনাকীভূষণ কঙ্কণাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

কঙ্কণা বললে, এখানেই আমি প্র্যাকটিস করবো মামা ভাবছি।

না—

তবে।

তুই বিলেত যা আমি সব ব্যবস্থা করছি—

কিন্তু মামা সে যে অনেক টাকার ব্যাপার—

তোর মামার ব্যাঙ্কে এখনো কিছু আছে রে—

না মামা—

কিন্তু পিনাকীভূষণ কঙ্কণার কোন কথাই শুনলেন না—তাকে বিলেত পাঠাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন।

মাস তিনেক বাদে এক সন্ধ্যায় বোম্বাইতে গিয়ে কঙ্কণাকে এয়ার ইণ্ডিয়ার জেট প্লেনে তুলে দিলেন।

কাষ্টমস কাউণ্টারে ঢোকার আগে কঙ্কণা পিনাকীভূষণের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই তার মাথাটা নিজের বিশাল বুকের উপরে টেনে নিলেন।

I shall wait for you my child—ধরা গলায় বললেন পিনাকীভূষণ।

মামা—

কি-রে—

তুমি বড্ড অনিয়ম কর—তোমার নিজের উপরে একটু যত্ন করো।

হ্যাঁরে—হ্যাঁ—পাকা বুড়ী—প্রতি মাসে একটা করে চিঠি লিখবি কিন্তু।

লিখবো।

কঙ্কণাকে ইউরোপগামী প্লেনে তুলে দিয়ে সাণ্টাক্রুজ এয়ার পোর্ট থেকে হোটেলে ফিরে এলেন পিনাকীভূষণ।

ব্যাচিলার মানুষ—চিরটা কাল একক জীবন-যাপন করে গেছেন, কোন মায়া মমতা বা বন্ধনের ধার ধারেন নি কখনো—হঠাৎ যেন অতর্কিতে এক সন্ধ্যায় কঙ্কণা তার জীবনে এসে সব কিছু ওলোট-পালোট করে দিয়ে গেল। স্নেহের স্বাদ দিয়ে গেল।

এক অনাস্বাদিত স্বাদ যা জীবনে কখনো আগে পিনাকীভূষণ পান নি। হোটেলে ফিরে সারাটা রাত তিনি ঘুমাতে পারলেন না। কেবল মনে হতে লাগল—হাজার হাজার ফুট উঁচু দিয়ে শূন্য আকাশ পথে প্লেনে উড়ে চলেছে মেয়েটা।

ফিরে এলেন নৈনিতাল—বাংলোটা যেন একেবারে খালি হয়ে গিয়েছে। কথা হাসি আর গান দিয়ে মেয়েটা যেন এই তিন মাস তার বাংলোটাকে একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল।

পিনাকীভূষণ খুশী হয়েছিলেন মেয়েটা তার জীবনে চলার পথটা খুঁজে পেয়েছে বলে।

প্রতাপেরও যেন বাড়িটা শূন্য শূন্য মনে হয়।

সে একদিন জিজ্ঞাসা করে, দিদিমণি ফির কব আয়েগী সাব—

কেন রে ?

এ মোকান একদম খালি হো গিয়া—

বিলেতে গেছে—পাস করবে তবে তো আসবে—

বিলায়েত বহুত দূর হ্যায় সাব—না।

তা দূরই তো—

দিদিমণি এবারে ফিরে এলে তার একটা সাদী দিয়ে দাও সাব।

সাদী—

হ্যাঁ—মেয়েছেলে সাদী না হলে কি চলে।

কথাটা বলে প্রতাপ আর দাঁড়াল না—কিচেনের দিকে চলে গেল।

প্রতাপের কথাটা কিন্তু ভুলতে পারলেন না পিনাকীভূষণ। কথাটা তার কানের পর্দায় যেন ঝংকার দিয়ে ফিরতে লাগল। ঐ অপমানের পর কঙ্কণা আর কখনো ফিরে যায় ইন্দ্রজিতের কাছে আদৌ পিনাকী-ভূষণের ইচ্ছা ছিল না।

বস্তুতঃ মনে মনে তিনি খুশীই হয়েছিলেন যেন।

ঠিকই করেছে কঙ্কণা—স্বামীর সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে দিয়ে এসে। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে কি সে একটা মাটির পুতুল।

একজন পুরুষ ঐ পুতুল নিয়ে যা খুশী তাই করবে। কঙ্কণার কি

নিজস্ব সত্তা বলে কিছু নেই। তাই তিনি কঙ্কণাকে আবার পড়তে উৎসাহ দিয়েছিলেন—কঙ্কণা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াক এই তিনি চেয়েছিলেন সর্বান্তঃকরণে।

কিন্তু প্রতাপ ঐ মুহূর্তে ঐ কথাগুলো বলে যাবার পর পিনাকীভূষণের মনটা যেন কেমন একটা দোটানায় পড়ে। নতুন করে যেন একটা ভাবনা তার মনের মধ্যে এসে তাকে অন্যমনস্ক করে তোলে। প্রতাপ এইমাত্র যা বলে গেল কোন একটা মেয়ের জীবনে সেটাই কি একমাত্র সত্য।

ঘরে এসে ঢুকলেন পিনাকীভূষণ—বেরুবেন বলে জামা চড়িয়েছেন গায়ে—বাইরে যেন কার গলা শোনা গেল।

এটাই কি কর্ণেল দত্তর বাংলো—পুরুষের কণ্ঠস্বর।

প্রতাপ দেখ তো কে?

কর্ণেল দত্ত আছেন?

কে? পিনাকীভূষণ বের হয়ে এলেন ঘর থেকে বারান্দায়। তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছরের এক যুবক—পরিধানে দামী স্যুট। চোখে চশমা—

কে আপনি? কর্ণেল দত্ত?

হ্যাঁ।

আপনি আমাকে চিনবেন না—আপনি আমাকে তো কখনো আগে দেখেন নি। আমি কলকাতা থেকে আসছি—

কি দরকার?

আমার নাম ইন্দ্রজিৎ সোম। আপনিই তো কঙ্কণার মামা?

নামটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পিনাকীভূষণ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রজিতের আপাদমস্তক দেখে নিলেন। একটা বিতৃষ্ণায় মনটা যেন তার ভরে গিয়েছে।

কঙ্কণার স্বামী ইন্দ্রজিৎ।

কি চাই—

কঙ্কণার কোন সংবাদ আপনি জানেন?

না—

জানেন না।

না—

ভেবেছিলাম যদি এখানে সে এসে থাকে।

এখানে আসবে কেন সে, তা কি হয়েছে কঙ্কণার ?

কিছু না—আচ্ছা আমি চলি—

দাঁড়াও—কঙ্কণার খবর কতদিন তুমি পাও না ?

তা প্রায়—মানে অনেক দিন হবে। সে হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। থেমে থেমে কথাগুলো বললে ইন্দ্রজিৎ।

সে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে কত দিন ? পুনরায় প্রশ্ন করেন পিনাকীভূষণ।

বললাম তো অনেকদিন।

তা হঠাৎ সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল কেন ?

সে যখন এখানে আসেনি তখন আর সে কথা শুনে কি হবে আপনার—

শোনা আমার প্রয়োজন—কারণ সে আমার ভাগ্নী।

ইন্দ্রজিৎ পিনাকীভূষণের মুখের দিকে তাকাল।

দেখুন ব্যাপারটা লজ্জার এবং দুঃখের—

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ—তাই আপনাকে তা বলে আর আঘাত দিতে চাই না।

কিন্তু তুমি সে কথাটা না বললেও তুমি বোধহয় জাননা—সবই আমি জানি।

কি—কি জানেন ?

সে কথা আর নাই বা শুনলে।

এমনও তো হতে পারে আপনি যা জেনেছেন তা ভুল।

ভুল।

হ্যাঁ—ভুল।

আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি ইন্দ্রজিৎ—

কি বলছেন আপনি।

হ্যাঁ—তোমার নির্লজ্জতা দেখে সত্যিই আমি অবাক হয়ে গিয়েছি—তুমি কি মনে করো যা ঘটে গিয়েছে তারপরও টুম্পা আর জীবনে কোনদিন তোমার ঘরে গিয়ে পা ফেলতে পারে ?

আমি তার স্বামী—সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

সেই মর্যাদাই তুমি তাকে দিয়েছো বটে। তুমি যেতে পারো, তোমার সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। কথাগুলো বলে পিনাকীভূষণ ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

ইন্দ্রজিৎ সঙ্গে সঙ্গে বললে, শুনছেন—শুনুন—

চলে যাও এখান থেকে—

বুঝতে পেরেছি সে এখানেই আছে—তার সঙ্গে না দেখা করে তো আমি যেতে পারি না।

স্পর্ধা তো তোমার কম নয়—

তাকে ডেকে দিন—

সে এখানে নেই—আর থাকলেও সে জেনো তোমার মত একটা স্কাউণ্ড্রেলের সঙ্গে দেখা করতো না। I say you get out !

বেশ—আমি চলে যাচ্ছি—তবে আবার আমি আসবো। আমার স্ত্রীকে আটকে রাখবার জানবেন আপনার কোন অধিকার নেই।

চিৎকার করে উঠলেন সহসা পিনাকীভূষণ, যাও। বের হয়ে যাও।

যাচ্ছি—তবে আসবো—আবার আসবো।

ইন্দ্রজিৎ কথাগুলো বলে বারান্দা থেকে নেমে হনহন করে ঢালু পথ বেয়ে নীচে নেমে গেল।

পিনাকীভূষণ এসে তার ঘরে ঢুকলেন—একটা কথাই তার মনে হচ্ছিল তখন কেবল। টুম্পা ঐ মানুষটার কাছ থেকে চলে এসেছে, ভালই করেছে।

কিন্তু এটা বুঝতে পারলেন না পিনাকীভূষণ—যা ঘটে গিয়েছে তার পরও ইন্দ্রজিৎ কঙ্কণার সন্ধানে এত দূর পর্যন্ত ধাওয়া করে এলো কেন, আর কার কাছ থেকেই বা সংবাদটা পেল। কেউ তো জানে না। আর জানবার কথাও না।

প্রথমতঃ কোন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেই বলতে গেলে তার কোন সম্পর্ক নেই—এবং বহুদিন থেকেই কারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক তিনি রাখেন নি এবং দ্বিতীয়তঃ টুম্পা যে তার এখানে এসে উঠেছিল কাউকে সে কথা তিনি বলেনও নি।

তবে। তবে ইন্দ্রজিৎ এখানে এসেছিল কেন?

॥ ৭ ॥

কঙ্কণা যে ঐভাবে হঠাৎ কেবিন থেকে চলে যাবে—কাউকে কিছু না জানিয়ে কথাটা নীলাদ্রির চিন্তারও বুঝি অতীত ছিল।

আকস্মিক ভাবে ঐ চিঠিটা পেয়ে প্রথম যেন নীলাদ্রি সত্যিই বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। কোথায় গেল কঙ্কণা—কোথায় যেতে পারে হঠাৎ সে।

যতদূর জানে নীলাদ্রি—কঙ্কণার কাছে তো একটি কপর্দকও ছিল না। পরিহিত শাড়িটা ছাড়া আর খান দুই শাড়ি অবিশ্যি সেই কিনে দিয়েছিল—তাও তো সে সঙ্গে নেয় নি—কেবিনের জাবার্ডের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে।

তার অর্থ এই একবস্ত্রে সে কপর্দকহীন ভাবে হাসপাতালের কেবিন থেকে চলে গিয়েছে—রাত্রে কোন এক সময়। একবার মনে হয়েছিল নীলাদ্রির—কঙ্কণা আবার আত্মহত্যা করেনি তো—গঙ্গায় ডুবে বা চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলাদ্রির চিন্তাটা যেন ঐ পথেই ঘুরপাক খেয়ে ফিরতে থাকে। কঙ্কণার মত মেয়ে হয়ত শেষ পর্যন্ত ঐ পথটাই বেছে নিয়েছে। তাছাড়া একবার যারা আত্মহত্যা করতে গিয়ে বিফলকাম হয় তারা আবারও ঐ আত্মহত্যার প্রলোভনটা যেন কিছুতেই এড়াতে পারে না। আত্মহত্যার একঠা ভূত যেন কাঁধের উপর চেপে বসে। মনের মধ্যে কেবলই মৃত্যুর হাতছানি শুনতে পায়—শুনতে পায় মৃত্যুর কথা।

নীলাদ্রির কাজকর্ম—হাসপাতাল রোগী—ডিউটি সব কিছু যেন ঐ একটি মাত্র চিন্তার আবর্তে পড়ে মাথায় উঠে যায়।

প্রথম প্রথম ক'টা দিন হাসপাতালে থানায় থানায় ঘুরে বেড়াতে লাগল—কাগজে কাগজে দুর্ঘটনার সংবাদগুলো যা প্রকাশিত হতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল—দু'চারজন কঙ্কণার বয়েসী তরুণীর

দুর্ঘটনার মৃত্যুর সংবাদ পড়ে ছুটে গিয়ে অকুস্থানে খোঁজ-খবরও নিতে লাগল ।

কিন্তু না—কেউ তারা কঙ্কণা নয় ।

এবং ঐভাবে দশ পনেরটা দিন যখন কেটে গেল তখন আবার কঙ্কণার কথা নতুন ভাবে চিন্তা করতে শুরু করল ।

হয়ত কঙ্কণা যা চিঠিতে লিখেছে—তাই সত্যি—সে কোথাও চলেই গিয়েছে—আত্মহত্যা করে নি । সঙ্গে সঙ্গে নতুন চিন্তা আসে মনে, কোথায় যেতে পারে কঙ্কণা—মা ও দাদার কাছে ফিরে যায় নি যে কঙ্কণা সে সম্পর্কে কেন না জানি একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হয়ে গিয়েছিল নীলাদ্রির ।

একথাও তার মনে হয়েছিল সতীনাথের কাছে সংবাদ নেবে—কঙ্কণার কোন সংবাদ তারা জানে কিনা । কিন্তু আবার কি ভেবে—সে চেষ্টা আর করে নি ।

কঙ্কণা যেন হারিয়ে গেল ।

কিন্তু নীলাদ্রি কঙ্কণাকে কিছুতেই যেন ভুলতে পারে না ।

কঙ্কণার প্রতি ভালবাসার উপরে তিন বৎসর আগে অকস্মাৎ যে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছিল—জীবনের যে পাতাটির উপরে একটা মোটা দাগের দাঁড়ি পড়ে গিয়েছিল এবং যেটা নীলাদ্রি ভেবেছিল—ঐখানেই সমাপ্তি—এবং মনকেও বুঝিয়ে ছিল তাই—আজ আগের তিন বৎসর পরে ঘটনাচক্রে সেটাই যেন নতুন করে আবার তাকে অস্থির অশান্ত করে তোলে ।

নীলাদ্রি বুঝতে পারে—যতই সে মনকে বোঝাবার চেষ্টা করুক না কেন কঙ্কণা যেমন তার মনের পাতা থেকে মুছে যায় নি, তেমনি কঙ্কণাকে সে ভুলতে পারে নি । আজো তার মনের সবটাতে জুড়ে রয়েছে কঙ্কণা ।

॥ ৮ ॥

এবং কঙ্কণা ঐ রাত্রে আকস্মিক ভাবে তার জীবনে পুনরায় আসার কিছু আগে থাকতেই ইউরোপে পাড়ি জমানোর জন্য চেষ্টা করছিল নীলাদ্রি। কিন্তু সুবিধা করতে পারছিল না।

প্রথম কথা টাকা।

কয়েক বছরের জন্য বিদেশে গিয়ে পড়াশুনা করবার মত টাকা তার ছিল না। প্রথমটায় ইচ্ছা ছিল কোন মতে সামান্য কিছু সঙ্গতির ও প্যাসেজ মানিটার ব্যবস্থা করে যদি সে ইউরোপে চলে যেতে পারে—তারপর একটা ব্যবস্থা সে করে নিতে পারবে—কিন্তু খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছিল—আজকাল বিলেতে চাকরি পাওয়াটা বেশ কষ্টসাধ্য।

অতএব মতলবটা ছেড়ে দিয়েছিল নীলাদ্রি।

অথচ আর কোন পথও খুঁজে পাচ্ছিল না।

নীলাদ্রি আবার কাজের মধ্যে ডুবে যায়—যাওয়াই যখন হচ্ছে না—নীলাদ্রি এম. এস্‌টা করবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। কিন্তু ইউরোপ যাবার কথাটা মন থেকে মুছে ফেলে না।

দেড়টা বছর কেমন করে যে অতিবাহিত হয়ে যায়—নীলাদ্রি যেন বুঝতে পারে না। ঘরের দরজায় এম. এস পরীক্ষা এসে গেছে—হাসপাতালের কাজের ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সময় পায় নীলাদ্রি তার পড়াশুনা করেই কাটায়।

ইতিমধ্যে নীলাদ্রি হাসপাতালের কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়েছিল—তার আর. এস-এর চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার মাস ছয়েক আগেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে, মীর্জাপুর স্ট্রীটের একটা মেসে উঠে এসেছিল পড়াশুনার সুবিধার জন্য।

তাহলেও তাকে একবার করে হাসপাতালে যেতে তো হতোই—

সেদিনও সকালে হাসপাতাল যাবে বলে প্রস্তুত হয়েছে—ঐ সময় ইন্দ্রজিৎ এসে ঘরে ঢুকল।

ইন্দ্রজিৎ যে—কি খবর? নীলাদ্রিই শুধায়।

একটা খবরের জন্য এলাম। ইন্দ্রজিৎ বললে।

খবর! কিসের খবর?

কঙ্কণা কোথায়?

কঙ্কণা—

হ্যাঁ—সে কোথায় তুমি বোধহয় জান তাই না।

একটা অবিমিশ্র ঘৃণায় যেন নীলাদ্রির মনটা হঠাৎ বিষিয়ে ওঠে। কিন্তু সেটা সে প্রকাশ করে না।

শান্ত গলায় বললে নীলাদ্রি, তোমার স্ত্রী কঙ্কণা কোথায় তা আমি কি করে জানব। তোমার স্ত্রীর কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো—

She attempted suicide-তাকে সি আই টি ফ্ল্যাট থেকে আন-কনসাস অবস্থায় তোমাদের হাসপাতালেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—তুমিই তার চিকিৎসা করেছিলে তাও জানি আমি।

করেছিলাম—তা সে ত বছর দেড়েক আগের ব্যাপার।

জানি।

হঠাৎ এক রাত্রে সুস্থ হবার পর সে যে কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে তা ত আমি জানি না, ইন্দ্র।

তুমি জান না।

না।

সত্যিই জান না।

না—তাছাড়া আমার জানবারও তো কথা নয় ইন্দ্রজিৎ।

আমি ভেবেছিলাম—

কি ভেবেছিলে।

তুমি—তুমি হয়ত জান।

হঠাৎ অমন একটা অসম্ভব কথা তোমার মনেই বা হলো কেন।

না—এমনিই মনে হয়েছিল। ইন্দ্রজিৎ বললে।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ইন্দ্র—

কি ?

দেড় বছর বাদে হঠাৎ তোমার তার সংবাদের প্রয়োজন হলো কেন।

অনেক জায়গায় তার আমি সন্ধান করেছি—কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছি—

তাই নাকি। তা তুমি বুঝি আশা করেছিলে যে ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল সে রাত্রে তারপরও আবার সে তোমার ওখানেই ফিরে যাবে।

তুমি এক তরফা শুনে ব্যাপারটা বিচার করছো নীলু—তুমি জান না—সবটুকু—

দেখ ইন্দ্র—কি হয়েছে না হয়েছে সে তোমাদের ব্যাপার—আমার জানবার কোন ইচ্ছা নেই—

জানা আমার মনে হয় তোমার দরকার।

না—কোন দরকার মনে করি না আমি—তবে একটা কথা তোমাকে বলবো—কঙ্কণাকে ভাল করে চেনবার আমার যথেষ্টই এক সময় অবকাশ হয়েছিল—কাজেই আজ তোমার কাছ থেকে তার সম্পর্কে নতুন করে জানবার আমার কিছু নেইও বটে—জানবার এতটুকু স্পৃহাও নেই—

ইন্দ্রজিৎ স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল নীলাদ্রির মুখের দিকে—এবং নীলাদ্রির কথাগুলো থেকে যে ব্যাপারটা এতকাল তার মনের মধ্যে অস্পষ্ট একটা ধোঁয়ার মত ছিল—সেটা যেন অকস্মাৎ অপসারিত হয়ে যায়। সমস্ত ব্যাপারটা সূর্যের আলোর মতই তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবু সে প্রশ্ন করে, কঙ্কণাকে তাহলে খুব ভাল করেই চিনবার অবকাশ তোমার হয়েছিল নীলাদ্রি

তোমার কথাগুলোর মধ্যে যেন একটা ইঙ্গিত আছে কিছুর।

ইঙ্গিত না নীলাদ্রি—I was a big fool আমি একটি গর্দভ, নচেৎ আমার বোঝা উচিত ছিল—কঙ্কণার মনটা কোথায় বাঁধা পড়েছিল।

ইন্দ্রজিৎ—

গলা উঁচিয়ে সত্যকে অস্বীকার করা যায় না নীলাদ্রি—তবে কেন তুমি সেদিন আমাকে সে কথা জানাও নি—জানতে দাও নি। আমি তোমার পথ থেকে সরে যেতাম।

তাই বুঝি।

হ্যাঁ—

দেখ ইন্দ্রজিৎ—তোমার মনটা শুধু নোংরাই নয়, ছোট—আমি আশ্চর্য হচ্ছি তিন-তিনটে বছরও যাকে নিয়ে তুমি ঘর করে তার সুন্দর মনটার সন্ধান তুমি পাও নি।

পেতাম। যদি তুমি তার সমস্ত মনটাকে না আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকতে—যাক, তাকে তুমি জানিয়ে দিও—সমস্ত বন্ধন থেকে তাকে মুক্তি দিচ্ছি।

প্রয়োজনটা যখন তোমারই তখন সেটা তুমিই তাকে জানিয়ে দিও ইন্দ্রজিৎ। শান্ত গলায় বলল নীলাদ্রি।

তার ঠিকানাটা বললে নিশ্চয়ই তা আমি জানিয়ে দেবো তাকে।

নীলাদ্রির আর ইন্দ্রজিতের একটি কথারও জবাব দেবার মত স্পৃহা ছিল না—কিন্তু সেও আর চুপ করে থাকতে পারল না। অতঃপর বললে, তোমার কথা যদি শেষ হয়ে থাকে ইন্দ্রজিৎ তো তুমি এবার যেতে পারো।

যাবো বৈকি—কিন্তু কথাটা আমি তোমারই সুবিধার জন্য বলেছিলাম—

ইন্দ্রজিৎ, তুমি যাও।

যাচ্ছি। তবে আবারও বলে যাচ্ছি—এর কোন প্রয়োজনই ছিল না—না তার—না তোমার—

ইন্দ্রজিৎ, I say you out of my room ! এতক্ষণের চেষ্টার বাঁধটা যেন ভেঙ্গে গেল নীলাদ্রির। কথাগুলো বলে সে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

ইন্দ্রজিৎ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নীলাদ্রির আর বেরুন হলো না। নীলাদ্রি চৌকিটার উপরে বসে পড়ল।

তারপর কটা দিন নীলাদ্রি ঘর থেকেই বেরুল না। কঙ্কণার কথাটাই কেবল তার মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আনাগোনা করতে থাকে, কঙ্কণার সমস্ত দুঃখের মূলে কি তবে সেই।

অজ্ঞাতে সেই ইন্দ্রজিতের মনের মধ্যে সন্দেহের বিষ ঢেলে দিয়েছে! কিন্তু সত্যিই তা ত সে চায় নি।

কঙ্কণাকে ইন্দ্রজিতের হাতে তুলে দিতে গিয়ে বুকটা তার শূন্য হয়ে গিয়েছিল সেদিন সত্যিই, কিন্তু সে কথাও কোনদিন কাউকে সে জানতে দেয় নি। তার সকল দুঃখের ভার তো সে একাই বহন করে এসেছে—এবং পাছে কখনো কোন কারণে ইন্দ্রজিতের মনের মধ্যে সন্দেহ জাগে বলে সে কখনো ভুলেও ওদের ফ্ল্যাটে যায় নি।

দেখা করবার চেষ্টা পর্যন্ত করে নি কঙ্কণার সঙ্গে।

কঙ্কণাকে সে ভুলতে পারে নি ঠিকই, কিন্তু এতকাল সে কথা তো কাউকেই সে জানতে দেয় নি।

তবে—তবে এমনটা হলো কেন?

নীলাদ্রির পড়াশুনা—আসন্ন এম. এস পরীক্ষা সব যেন কোথায় ভেসে গেল—একটা দুর্বিষহ অপরাধবোধ যেন সর্বক্ষণ কুরে কুরে খেতে লাগল তাকে।

কলকাতা নীলাদ্রির কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো।

ঠিক ঐ সময় এলো তার এক সহপাঠী পলাশের কাছ থেকে একটা চিঠি। পলাশ গরিব ঘরের ছেলে—এম-বি-বি-এস পাস করার পর কোচিনে চলে গিয়ে একটা বিদেশী জাহাজে ডাক্তারের চাকরি নেয়। বছর দুই জাহাজে চাকরি করে—একসময় তাদের জাহাজ টিলবারী পোর্টে নোঙর ফেলতে সে জাহাজ থেকে নেমে যায়—বেশ কিছু পাউণ্ড তার সংগ্রহ হয়েছিল।

লণ্ডনে নেমে সে ধীরে ধীরে ব্যবস্থা করে নেয়—কয়েক মাস পূর্বে সে এম-আর-সি-পি পাস করেছে। বর্তমানে সে এডেনে কলোনিয়াল

সার্ভিসে আছে। এক ইউরোপীয় মহিলাকে পলাশ লণ্ডনে থাকার সময়ই বিবাহ করেছে। পলাশ লিখেছে এমিলি সত্যিই ভাল রে—ও যে এক অন্য দেশ, অন্য সমাজ ও অন্য সংস্কৃতির মেয়ে তা যেন মনেই হয় না। ওর স্বভাবে ও চরিত্রে একটা ভারতীয় ভাবধারা আছে—সেটা হয়ত সম্ভবপর হয়েছে ওর বাপ বাঙালী ছিলেন ও মা ইংরাজ মহিলা—সেই কারণেই। এমিলির বাপ পড়াশুনা করতে বিলেত গিয়েছিলেন আর ফেরেন নি ভারতে—এমিলির মাকে বিবাহ করে সংসার পাতেন। আরো অনেক কথা লিখেছে পলাশ। তারপর তার নীলাদ্রির খবর জানতে চেয়েছে। কি করছে সে—ভবিষ্যতে প্ল্যান কি। ইত্যাদি।

পলাশের দীর্ঘ চিঠিটা নীলাদ্রিকে যেন পথের নিশানা দেয়। সেও ত ইচ্ছা করলে ঐ পলাশের মতই যেভাবেই হোক ইউরোপ চলে যেতে পারে। ক'টা দিন ভাবল নীলাদ্রি—তারপর একদিন গোছগাছ করে কলকাতা ছাড়ল।

বন্ধন বলতে তো তার সংসারে তেমন কিছুই আর ছিল না। মার সেই কিশোর বয়সেই মৃত্যু হয়েছিল—বাবাও দুই বছর আগে চলে গেছেন।

দুই বোন তাদের আগেই বিবাহ হয়ে গিয়েছিল—তারা স্বামীর সংসার করছে—একজন থাকে ডিব্রুগড় আসাম, অন্যজন মজঃফরপুরে। দুজনেরই স্বামী কৃতী রোজগারে।

নীলাদ্রি কোচিনেই গিয়ে উপস্থিত হলো। সুবিধাও হয়েছিল কিছুটা—দক্ষিণদেশীয় এক পরিচিত বন্ধু কৃষ্ণস্বামীর বাবা—ঐখানেই থাকতেন—বড় চাকুরে। ইতিপূর্বে আর একবার কয়েক বৎসর আগে বন্ধুটির সঙ্গে কোচিনে বেড়াতে গিয়ে ওদের বাড়িতেই উঠেছিল। সেখানেই এবারও উঠলো। বেশী চেষ্টা করতে হয়নি—মাসখানেকের মধ্যেই কৃষ্ণস্বামীর বাবার চেষ্টাতেই এক বেলজিয়াম জাহাজে চাকরি পেয়ে গেল নীলাদ্রি।

একদিন ঐ জাহাজ কোচিন বন্দর ত্যাগ করলো। তার পর বছর দুই ঐ জাহাজেই চাকরি করবার পর কিছু পাউণ্ড সঞ্চয় করে

অক্টোবরের শেষে এক ধোঁয়াটে বিষণ্ণ অপরাহ্নে টিলবারী পোর্টে জাহাজ পৌঁছাল। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ইউরোপের মাটিতে পা রাখল নীলাদ্রি।

থমথমে মেঘলা মেঘলা আকাশ—চারিদিকে যেন কেমন ভিজে স্যাঁতসেঁতে।

৯ ॥

পাঁচ বছর বাদে একদিন সকালে কঙ্কণা B. O. A. C. জাম্বো জেট থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সান্তাক্রুজ এয়ার পোর্টের টারমাকে পা রাখল।

পাঁচ বছর বাদে ভারতবর্ষের মাটির স্পর্শ পেল যেন। রওনা হবার দিন পনের আগেই কঙ্কণা জানিয়ে দিয়েছিল পিনাকীভূষণকে কবে সে ইণ্ডিয়াতে ফিরে আসছে—সে চিঠির জবাব সে অবিশ্যি পায়নি—পাবার কথাও নয়। তবে সে ধরেই নিয়েছিল পিনাকীভূষণ তার ইণ্ডিয়াতে ফিরবার দিনটি জানতে পেরেছেন।

পিনাকীভূষণকে অবিশ্যি সে বোম্বাইতে আসতে তাকে রিসিভ করবার জন্য নিষেধ করেছিল—লিখেছিল মামা তুমি এসো না—আমি সোজা তোমার ওখানে চলে যাবো। কিন্তু ঐ কথাটা লিখলেও মনে মনে কঙ্কণা জানত—মামা পিনাকীভূষণ আসবেনই তাকে বোম্বাই হাওয়াই বন্দরে রিসিভ করতে—আর সেই আশাতেই কাস্টমস এনকাউন্টারের ঝামেলা মিটিয়ে লাউঞ্জে এসে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল তৃষিত দৃষ্টিতে। অনেক যাত্রীরই আত্মীয়-স্বজনরা এসেছে তাদের আপনার জনকে রিসিভ করতে এয়ার পোর্টে—কিন্তু পিনাকী-ভূষণকে কঙ্কণা কোথাও দেখতে পেল না।

একটু যেন আশাহত হলো—একটু বিষণ্ণতাও বোধ করে বুঝি কঙ্কণা।

কিন্তু তখনো কি সে জানতে পেরেছিল মামা পিনাকীভূষণ আর ইহজগতে নেই।

মাত্র দিন পনের আগে অকস্মাত সেরিব্রাল হিমারেজ হয়ে পরলোক-গমন করেছেন।

হতাশ আর বিষণ্ণ হলেও কঙ্কণা বেশ কিছুটা সময় এয়ার পোর্টের সর্বত্র মামা পিনাকীভূষণের অনুসন্ধান করে অবশেষে নিবৃত্ত হলো।

কারণ সে ত জানতই মামাকে সে না আসার জন্য লিখলেও পিনাকীভূষণ আসবেনই। আগে অনেকবার সেকথা তিনি তার চিঠিতে কঙ্কণাকে লিখেছিলেনও।

কতবার লিখেছেন পিনাকীভূষণ, আগে থাকতেই আমাকে জানাবি কিন্তু টুম্পা—আমি তোকে রিসিভ করতে যাবো এয়ার পোর্টে—তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কত কল্পনা করেছেন—প্রত্যেকটি চিঠিতে সে সব কথা লিখেছেন।

একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, টুম্পা তুই কোথায় প্র্যাকটিস করবি জানি না—তবে এখানে কয়েক মাইল দূরে ভাওয়ালিতে যে স্যানাটোরিয়ামটা আছে সেখানে যদি ঢুকতে চাস তো আমি ব্যবস্থা করতে পারি।

ওখানকার ডিরেক্টার ইনচার্জ ডাঃ রণধীর কাটজু আমার বিশেষ পরিচিত ও বন্ধু মানুষ। এ নাইস পারসন—আর স্যানাটোরিয়ামটাও চমৎকার পরিবেশে—ল্যাবোরেটারীটা ও অপারেশন থিয়েটার চমৎকার। দেখেছি আমি অনেকবার—am sure you would like it টুম্পা। অবিশ্যি এর মধ্যে আমারও একটু স্বার্থপরতা আছে—তুই ওখানে কাজ নিলে আমার কাছে কাছেই থাকতে পারবি। আসলে কি জানিস, এতকাল একা একাই কাটালাম কখনো নিঃসঙ্গ বা একা মনে হয় নি নিজেকে। কিন্তু তুই আমার কাছে কিছুদিন থেকে চলে যাবার পর এই একাকীত্ব যেন কেমন দুঃসহ মনে হয়। I feel myself so lonely!

মনে হয় নির্বান্ধব একা আমি যেন কোন এক মরু প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি কতকাল ও কত বর্ষ ধরে। হয়ত তোর মনে অন্য কোন আশা এতদিনে দানা বেঁধেছে—অবশ্যই তোর কোন প্ল্যানই আমি ভেস্তে দিতে চাই না—আর এও আমি চাই না—আমার জন্য তোর ভবিষ্যতে কোন প্ল্যান তুই নষ্ট করিস। তুই তোর মনের মধ্যে কোন দ্বিধা বা সংকোচ রাখবি না কিন্তু?

মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানিস, শেষ জীবনে তোকে পাবো বলেই হয়ত এতকাল প্রতীক্ষা করেছিলাম।

চলন্ত ট্রেনের কামরায় বসে বসে মামার চিঠিগুলোর কথাই যেন বার বার মনে পড়ে কঙ্কণার। নোঙর ছেঁড়া নৌকোর মত স্রোতের মুখে সে ত নিজেকে ভাসিয়েই দিয়েছিল—নীলাদ্রি যেদিন তার পেট থেকে বিষ মন্থন করে আবার বাঁচিয়ে তুলেছিল—তীব্র একটা হতাশা আর লজ্জা যেন তাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছিল।

মরতে গিয়েও সে মরতে পারল না। মরা হলো না তার। এবং সেই মুহূর্তে যে প্রশ্নটা তার সামনে প্রকাণ্ড একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত দেখা দিয়েছিল সেটা হচ্ছে—অতঃকিম।

এটা ঠিকই—পুরাতন পরিবেশে আর সে ইহজীবনে ফিরে যেতে পারবে না—পশ্চাতের জীবনের সকল দরজা তার সামনে বন্ধ হয়ে গিয়েছে—কতকটা সে অর্গল তুলে নিজেই বন্ধ করে দিয়েছিল। কাজেই আবার তাকে বাঁচতে হলে নতুন এক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। যেখানে তাকে হয়ত নতুন করে বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সেটা কি সেটাই সে যেন বুঝে উঠতে পারছিল না। একটা শূন্য নিঃসঙ্গ মনে ক'টা দিন কেবল সে হাসপাতালের কেবিনের মধ্যে বসে বসে ভেবেছে। হাসপাতালের কেবিন থেকে মধ্যরাত্রে নিঃশব্দে যেদিন সে বের হয়ে এসেছিল—সেদিনও সামনে তার কোন নির্দিষ্ট পথ ছিল না। নিঃসঙ্গ—একাকী সে।

হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফরমের মধ্যে অন্যমনস্ক উদ্দেশ্যহীন ভাবে সেদিন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই মামা কর্ণেল পিনাকীভূষণের কথাটা মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল তার। এবং আশ্চর্য ঐ নামটাই বা ঐ ব্যক্তিটিকেই মনে হয়েছিল তার যখন মনের মধ্যে হাতড়ে হাতড়েও সে কোন কিছুকেই অবলম্বন করবার মত পাচ্ছিল না।

ভাবছিল কোথায় সে যেতে পারে—এখন সে কোথায় যাবে। পথে পথেই তো কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারবে না।

মানুষটির কথা মনে হতেই সে যেন অকস্মাৎ সজাগ হয়ে উঠেছিল। একটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পেরেছিল নিজের অজ্ঞাতেই।

মানুষটার সঙ্গে সামান্য দু'একবার তাদের বাড়িতে আসায় মানুষটির যেটুকু পরিচয় সে পেয়েছিল—কেমন যেন আশ্চর্যরকম ভাল লেগেছিল কঙ্কণার তাকে।

দিলখোলা—আপনভোলা মানুষটা।

সংসারের প্রতি এতটুকু আকর্ষণ নেই। নিজেকে নিয়েই যেন সর্বক্ষণ আত্মমগ্ন হয়ে আছেন। সেই মানুষটির কথা মনে হতেই তার স্বতঃসিদ্ধ ধারণা হয়েছিল আর কিছু না হোক তার ওখানে গেলে একটু আশ্রয়ের যেমন অভাব হবে না তেমনি সে দুটো দিন ভাববারও হয়ত সময় পাবে।

নিজেকে বিশ্লেষণ করবার সুযোগ পাবে। এবং কথাটা মনে হতেই আর সে বিলম্ব করেনি, হাতের চুড়ি বিক্রী করে টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসেছিল। এবং তার মন যে মিথ্যা বলে নি পিনাকীভূষণের ওখানে গিয়েই সেটা বুঝতে পেরেছিল।

পিনাকীভূষণ তার মনের এমন একটা নিঃসঙ্গতার মধ্যে তাকে আপন করে বুকে টেনে নিয়েছিলেন যে কঙ্কণা একেবারে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে গেল।

পিনাকীভূষণ শুধু যে তাকে সাদরে পরম স্নেহে বুকেই টেনে নিলেন তাই নয়—কঙ্কণার ভবিষ্যতের একটা নির্দেশও দিয়ে দিলেন। যে ডাক্তারী পড়বার তার আর এতটুকুও ইচ্ছা ছিল না, শেষ পর্যন্ত সেই ডাক্তারিই আবার সে পড়তে শুরু করল। নতুন করে বাঁচবার যেন একটা পথ খুঁজে পেল।

কয়েক বছর আগে জীবনে যেটা ঘটে গিয়েছিল একটু একটু করে সেই অতীতকে ভুলে গেল কঙ্কণা।

ট্রেনটা এসে যখন কাঠগুদামে দাঁড়াল সকালে—চারিদিকে ঝলমল করছে রৌদ্র। অক্টোবরের শেষে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে, ট্রেন থেকে নেমে প্রথমেই কঙ্কণা প্ল্যাটফরমটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত একবার তার অনুসন্ধানী দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিল। কিন্তু প্ল্যাটফরমের কোথাও সে পিনাকীভূষণকে—সেই পরিচিত মানুষটিকে দেখতে পেল না।

এবার কিন্তু কঙ্কণার সত্যিই একটা চিন্তা এসে মনকে আচ্ছন্ন করে—পিনাকীভূষণ এলেন না কেন, তবে কি তিনি তার শেষ চিঠিটা পান নি।

চিঠি পেলে তিনি আসবেন না—তা ত হতে পারে না।

তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একসময় একটা ট্যাক্সী নিয়ে কঙ্কণা রওনা হলো নৈনিতালের পথে।

এবং ঘণ্টা দুই বাদে ট্যাক্সীটা এসে পরিচিত বাংলো বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। উঁচু টিলার পথ বেয়ে উঠতে উঠতে উপরের দিকে তাকাল কঙ্কণা।

বারান্দাটা খালি।

তরতর করে উঠে গেল কঙ্কণা—বারান্দায় গিয়ে যেমন সে দাঁড়িয়েছে দরজা খুলে প্রতাপ সিংকে বের হয়ে আসতে দেখলো।

প্রতাপ—

দিদিমণি—

মামাবাবু—ঐ একটি মাত্র কথা ছাড়া আর কিছুই যেন কঙ্কণার মুখ দিয়ে বের হলো না।

প্রতাপ সিং তখন চেয়েছিল কঙ্কণার মুখের দিকে—ধীরে ধীরে এক সময় দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

মামাবাবু কোথায় প্রতাপ ?

প্রতাপ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে।

প্রতাপ। মামাবাবু—তোমারা সাব্।

নেহি হ্যায় দিদিমণি—যেন প্রায় বোজা গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করল প্রতাপ।

নেই—মামাবাবু—

পনের দিন আগে রাত্রে—

কি হয়েছে ?

মারা গেছেন সাহেব।

কঙ্কণা কয়েকটা মুহূর্ত নিস্পন্দ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর থপ্ করে বারান্দায় রাখা বেতের চেয়ারটার উপরে বসে পড়ল।

কি হয়েছিল?

আমি কিছুই জানতে পারি নি দিদিমণি—রাত্রে বলেছিলেন তবিয়ৎ ভাল না—কেবল এক কাপ দুধ খেয়েছিলেন,—আর কিছু খান নি। পরের দিন সকালে গিয়ে সাহেবের ঘরে ঢুকে তাঁকে ডেকে ডেকেও তাঁর সাড়া না পেয়ে সে ভয় পেয়ে ডাঃ চৌবেকে গিয়ে দৌড়ে ডেকে আনে। তিনি এসে সাহেবকে দেখে বললেন, সাহেব নেই—মারা গেছেন।

তারপর দু'জনাই আবার চুপচাপ।

লেকের জলে রৌদ্র ঝলমল করছে অদূরে নীচে যতদূর দৃষ্টি চলে। কিছু নৌকা-বিলাসী বোটিং করছে—নীল সাদা জাফরানী রং-এর পালগুলো যেন হেলছে দুলছে এদিক ওদিক।

দূরে পাহাড়ের গায়ে পাইন ও দেবদারু গাছগুলো কিছুটা ঝাপসা ঝাপসা মনে হয়।

ট্যাক্সীওয়ালা এতক্ষণ অপেক্ষা করে উঠে এসেছে—তার ডাকেই সম্বিৎ ফিরে পায় কঙ্কণা যেন আগে।

সামান উতারকে হামারা ভাড়া দে দিজিয়ে।

কঙ্কণা তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে খুলে টাকা বের করে ট্যাক্সীর ভাড়া মিটিয়ে দিল। প্রতাপ লগেজগুলো বয়ে নিয়ে এলো এক এক করে এবং ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে রেখে দিল।

দিদিমণি—

প্রতাপের ডাকে কঙ্কণা ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

ভিতরে চলুন দিদিমণি—প্রতাপ সিং বললে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে কঙ্কণা, হ্যাঁ—চল।

প্রতাপ সিং-এর পিছনে পিছনে কঙ্কণা এসে ক্লান্ত পায়ে সামনের হলঘরটার মধ্যে প্রবেশ করল।

ঘরে ঢুকতেই সামনে ফায়ার প্লেসের উপরে নজর পড়লো কঙ্কণার—পিনাকীভূষণের একখানা বাঁধানো ছবি।

পিনাকীভূষণ—

কর্ণেল পিনাকীভূষণ। পরণে মিলিটারী ইউনিফর্ম। ফটোর পিনাকীভূষণ যেন হাসছেন। যে হাসি তিনি সর্বদা হাসতেন সেই হাসির ইঙ্গিত ছবির পিনাকীভূষণের ওষ্ঠপ্রান্তে।

কানে ভেসে এলো যেন পিনাকীভূষণের সেই গলা, টুম্পা—এসেছিস—আয়—

কঙ্কণা পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় কৌচটার সামনে।

কি দেখছিস রে—আমি এয়ারপোর্টে যাই নি বলে অভিমান হয়েছে বুঝি।

প্রতাপ সিং এক এক করে সুটকেশগুলো ঘরের মধ্যে নিয়ে আসে। —সেই সাজানো গোছান ঘর যেখানকার যেটি ঠিক তেমনি আছে কেবল নেই পিনাকীভূষণ। হ্যাটর‍্যাকে পিনাকীভূষণের সেই মোটা লাঠিটা ঝুলছে। যে লাঠিটা হাতে পিনাকীভূষণ প্রত্যূষে বেড়াতে বের হতেন। এবং ফিরে এসে ঘরে ঢুকে হ্যাটর‍্যাকে ঝুলিয়ে রাখতেন।

দিদিমণি—

কি-রে।

হাত মুখ ধুয়ে নাও, আমি চা তৈরি করে আনি। এগুলো তোমার ঘরে রেখে দিচ্ছি।

কঙ্কণা কোন জবাব দিল না।

প্রতাপ সিং এক এক করে সুটকেশগুলো তার ঘরে রেখে এলো।

॥ ১০ ॥

দিন চার পাঁচ কঙ্কণা কোথায়ও বের হলো না। ঘরের মধ্যেই শুয়ে কাটাল। পাঁচ দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা ডাঃ চৌবে এলেন। নৈনি-তাল শহরে পিনাকীভূষণের একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

ডাঃ চৌবের বয়স হয়েছে এবং বয়সে পিনাকীভূষণের চাইতে বছর দুই তিন বড়ই ছিলেন। মাথা ভর্তি লম্বা লম্বা পাকা চুল, একজোড়া পাকানো গোঁফ। চোখে চশমা। দুইজনে মিলেছিলও ভাল—কারণ ডাঃ চৌবেও হাসি-খুশি দিলখোলা মানুষ ছিলেন।

বেঁটে-খাটো হৃষ্টপুষ্ট চেহারা।

চৌবের বাড়ি ঐ শহরেই। লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে উত্তরপ্রদেশ সরকারের চাকরি নিয়েছিলেন। অবশেষে রিটায়ার করবার পর নৈনিতালেই অবসর জীবন যাপন করছিলেন।

ডাঃ চৌবেও কঙ্কণাকে 'টুম্পা' বলে ডাকতেন।

কঙ্কণা বাইরের বারন্দায় বসে ছিল একটা বেতের আরাম কেদারায় গা ঢেলে—অন্যমনস্কভাবে অদূরে লেকের দিকে তাকিয়ে।

সূর্য অস্ত গিয়েছে কিছুক্ষণ হল—ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে লেকের জলে—অত্যাসন্ন অন্ধকারের ইঙ্গিত।

চৌবের হাতের লাঠির শব্দে কঙ্কণা তাকায় ওর দিকে।

আসুন ডাঃ চৌবে—কঙ্কণা বললে।

ডাঃ চৌবে বারান্দায় উঠে হাতের লাঠিটা একটা বেতের চেয়ারের পাশে রেখে উপবেশন করলেন।

তুমি আসবে গত রবিবার আমি জানতাম টুম্পা—খবরও পেয়েছি প্রতাপের মুখে তুমি এসেছো। রোজই ভাবি আসবো কিন্তু গাউটের ব্যাথাটা এমন চাড়া দিয়েছিল ক'দিন যে বাড়ি থেকে আর বেরই হতে পারি নি মা—

কঙ্কণা কোন কথা বলে না। চুপচাপ বসে থাকে।

ডাঃ চৌবে একটু থেমে আবার বললেন, it was so sudden এবং

unexpected যে আমারও যেন ব্যাপারটা এখনো বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। আগের দিন রাত ন'টা পর্যন্ত কর্ণেলের সঙ্গে এখানে বসে গল্প করেছি—সে বললে টুম্পা আসছে—তোমাকে সে রিসিভ করতে বোম্বাই যাবে—কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কি ঘটে গেল।

কঙ্কণা দূরের লেকের দিকে তাকিয়ে থাকে। সব ঘনায়মান অন্ধকারে যেন আবছা হয়ে গিয়েছে—চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। একটা বহুদূর বিস্তৃত কালো শাড়ির উপরে যেন আলোর চুমকি।

এই ক'টা বছর কর্ণেল কেবল তোমারই গল্প করেছে। তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্ল্যান করেছে, ভাওয়ালী স্যানাটোরিয়ামের সুপারিনটেনডেণ্ট ডাঃ কাটজুর সঙ্গে পরামর্শ করেছে। দুঃখ করে আর কি করবে বল মা। মানুষ কিছু ত চিরদিন বাঁচে না।

তা জানি। কঙ্কণা এতক্ষণে মৃদুকণ্ঠে কথা বললে। ডাঃ চৌবে। আমার দুঃখ, ফিরে এসে তার দেখা পেলাম না।

চল মা—ভিতরে চল—বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে—ডাঃ চৌবে বললেন।

দু'জনে এসে বসবার ঘরে বসল।

প্রতাপ চা করে নিয়ে এলো।

চা পানের পর কঙ্কণা শুধালো, আপনি তো ডাঃ কাটজুকে চেনেন ডাঃ চৌবে।

হ্যাঁ—যথেষ্ট চিনি।

কাল একবার তাঁর কাছে আমায় নিয়ে চলুন না।

কালই যাবে ?

হ্যাঁ—এভাবে হাত পা কোলে করে আর বসে থাকতে পারছি না।

বেশ তো চল। এক কাজ করবো আমি আমার গাড়ি নিয়ে আসবো সকাল সাতটার মধ্যে তারপর দু'জনে যাওয়া যাবে—কি বলো।

বেশ।

অতঃপর ডাঃ চৌবে বিদায় নিলেন।

পরের দিন সকালে ডাঃ চৌবে এলে তাঁর গাড়ির হর্ণ শুনে বের হয়ে এলো কঙ্কণা। সে খুব ভোরে উঠেছিল এবং প্রস্তুত হয়ে ছিল।

ঢালু পথ বেয়ে নেমে এলো কঙ্কণা।

রেডি।

হ্যাঁ—চলুন।

দু'জনে গাড়িতে উঠে বসল—ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল।

নৈনিতালে বেশ শীত পড়ে গিয়েছে—ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীরে কাঁপুনি ধরায় কঙ্কণার—সে গাড়ির জানালার কাঁচ তুলে দেয়।

পাহাড়ী আঁকা-বাঁকা উঁচু-নীচু পথ ধরে গাড়ি ছুটে চলে। বাঁদিকে খাড়া পাহাড়—ডানদিকে বহু নিম্নে খাদ। খাদের মধ্যে চোখে পড়ে বুনো গাছপালা ঝাপসা ঝাপসা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে বড় বড় পাথর।

ভাওয়ালীতে স্যানাটোরিয়ামটা উঁচুনীচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত—আঁকা-বাঁকা কংক্রিটের পথ পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে উঠে গিয়েছে উপরের দিকে। সাদা ধবধবে কংক্রিটের দেওয়াল—লাল টালির ছাদ।

মধ্যে মধ্যে পাইন ও দেবদারু গাছ, ইতস্ততঃ ছড়ানো। তারই ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশটা যেন নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

কঙ্কণার ভারী ভাল লাগে। কঙ্কণা গাড়ির জানালাপথে চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

কেমন লাগছে?

খুব ভালো, কঙ্কণা মৃদু গলায় বললে।

আমারও খুব ভাল লাগে। ডাঃ চৌবে বললেন।

অবশেষে গাড়ি এসে এক জায়গায় থামল। সামনেই অফিস। অফিসে ঢোকার মুখে কঙ্কণার নজরে পড়লো চার পাঁচজন সাদা ইউনিফর্ম পরা, গায়ে লাল রংয়ের গরম শাল ভাঁজ করা, মাথায় ক্যাপ নার্স একটা টিলার উপর থেকে নেমে আসছে।

লম্বা লম্বা ব্যারাকের মত বাড়ি—ঐগুলোই ঐ স্যানাটোরিয়ামে রোগীদের ওয়ার্ড। নামে স্যানাটোরিয়াম হলেও আসলে ওটা একটা ছোটখাটো হাসপাতাল। সবসমেত দেড়শতটি বেড আছে, অপারেশন থিয়েটার আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত। এক্সরে ইউনিট,

প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটারী। ডাক্তার ছয়জন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ইউরোপীয়ান, ক্রিশ্চান-মিশনারী।

স্যানাটোরিয়ামের ইনচার্জও একজন ক্রিশ্চান মিশনারী রেভারেণ্ড ফাদার ডাঃ ওহারা—জাতে আইরিশ ম্যান।

বয়েসে প্রৌঢ়।

বাকী ডাক্তারের মধ্যে বেশীর ভাগই ভারতীয়। এবং ডাঃ ওহারা বৃদ্ধ হওয়ায় এখন আর তিনি কোন কাজকর্মই করেন না, মধ্যে মধ্যে এক আধদিন হয়ত আসেন—ঘুরে ফিরে দেখে যান। ঐ পাঁচজনের মধ্যে ডাঃ কাটজু যদিও তাঁরও বয়স হয়েছে তিনিই সব দেখাশোনা করেন। তিনিই ওখানকার ইনচার্জ। ডাঃ কাটজু উত্তরপ্রদেশের লোক, ওঁরই কথা মামা তাকে লিখেছিলেন চিঠিতে।

অফিস ঘরে ঢুকতেই ডাঃ কাটজুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি হাসপাতালের সকালের রাউণ্ড দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

রোগা পাতলা চেহারা, বেশ লম্বা—বয়েস হয়েছে প্রায় আটষট্টি। মাথার চুল প্রায় সাদা। তালুর উপরে বিস্তৃত একটি টাক।

চোখে চশমা।

পরনে স্যুট, গরম সার্জের—মড্ কালারের।

ডাঃ চৌবেকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সানন্দে অভ্যর্থনা জানালেন, ডাঃ চৌবে, গুড মর্নিং।

ডাঃ চৌবে প্রত্যুত্তরে বললেন, গুড মর্নিং—লেট মি ইনট্রডিউস—ডাঃ সোম—

How do you do !

Fine—how do you do !

ডাঃ কাটজু, এরই কথা তোমাকে বলেছিলেন কর্ণেল—তাঁর নীস্—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

তুমি ত শুনেছো—কর্ণেল কয়েক দিন আগে স্ট্রোকে মারা গেছেন।

হ্যাঁ শুনেছি—কাটজু বললেন, ভেরি স্যাড্—বসুন না ডাঃ চৌবে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন।

দুটো চেয়ার অধিকার করে দু'জনে বসল। ডাঃ চৌবে ও কঙ্কণা।

ডাঃ কাটজু বললেন, দিন কুড়ি আগেও কর্ণেল এসেছিলেন এখানে, বললেন—তুমি এফ-আর-সি-এস হয়েছো—কয়েক দিনের মধ্যেই ইণ্ডিয়াতে ফিরে আসছো। তোমার পাসের সংবাদ পেয়ে he was so happy! কথাগুলো ডাঃ কাটজু কঙ্কণার দিকে তাকিয়ে বললেন।

মামা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, মৃদু কণ্ঠে কঙ্কণা বললে।

তোমার কথা অনেক বলেছেন কর্ণেল। এখানে এলে কর্ণেল কেবল তোমার কথাই বলতেন মিসেস সোম।

মিসেস সোম।

ডাঃ কাটজুর শেষ কথাটা যেন অনেক কাল পরে কঙ্কণার বুকের পাঁজরে একটা ধাক্কা দিল। তার নামের সঙ্গে ঐ পদবিটা আজো তার জীবনে অমীমাংসিতই রয়ে গিয়েছে। ইন্দ্রজিতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কের অবসান ঘটাবার জন্যই একদিন সে বিষপান করেছিল। কিন্তু মরতে দিল না নীলাদ্রিদা তাকে। আপ্রাণ চেষ্টা করে তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলল। বেঁচে ওঠার পর থেকেই তার জীবনের পাতা থেকে ঐ ইন্দ্রজিৎ নামটা সে মুছে ফেলেছিল।

নৈনিতাল চলে এলো সে তারপর।

এখানে মামা তাকে টুম্পা বলেই ডাকতেন। এবং পরে লক্ষ্ণৌ মেডিক্যাল কলেজে যখন সে গিয়ে ভর্তি হলো তার কলকাতার ছাত্র-জীবনের পদবীটাই দিয়েছিল, কঙ্কণা রায়—মিস কঙ্কণা রায়।

বিলেতে পরে গিয়ে পড়াশুনা করেছেও ঐ নামে। রায়, মিস কঙ্কণা রায়।

মামা হয়ত তার পরিচয় দেবার সময় ডাঃ কাটজুকে বলেছিলেন—তার নাম কঙ্কণা সোম। মিসেস কঙ্কণা সোম।

মামা ত জানতেন ঐ পদবিটা সে তার নামের থেকে মুছে ফেলেছিল—তবে ডাঃ কাটজুকে ঐ পদবিটা বলতে গেলেন কেন।

আইনের দিক থেকে মীমাংসা না হলেও সে ত নিজেই শেষ মীমাংসা করে নিয়েছিল—না—ঐ ভুল আর করা চলবে না।

ডাঃ কাটজু—

ইয়েস মিসেস সোম।

মামা মানে কর্ণেল দত্তই বোধহয় মনে হচ্ছে আপনাকে বলেছিলেন আমার নাম মিসেস কঙ্কণা সোম।

হ্যাঁ—কেন বল ত।

একসময় আমি মিসেস সোম ছিলাম বটে তবে এখন আর নই।

তুমি—তুমি মিসেস সোম নও।

ডাঃ চৌবেও কথাটা প্রথম শুনছেন তাই বোধহয় তিনিও কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গেই কঙ্কণার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

কঙ্কণা শান্ত গলায় বললে, না। আজ আর আমি মিসেস সোম নই—আমার স্বামীর সঙ্গে অনেক দিন হলো আমার সেপারেশন হয়ে গিয়েছে।

সেপারেশন!

হ্যাঁ—এখন আমি মিস্ কঙ্কণা রায়। ঐ নামেই আমাকে সম্বোধন করবেন।

ডাঃ কাটজু যেন কি ভাবলেন। তারপর বৃদ্ধ মাথাটা আপন মনেই দোলাতে দোলাতে বললেন, বেশ—তাই হবে। যাক্ কাজের কথায় এবারে আসা যাক ডাঃ রায়, তুমি এখানে কাজ করতে চাও।

হ্যাঁ—কর্ণেল দত্ত আমার মামা কি সে কথা আপনাকে বলেন নি।

হ্যাঁ—হ্যাঁ—বলেছিলেন। তুমি বিলেত থেকে ফিরে এসে এখানেই জয়েন করবে। তুমি বোধহয় জান না—আমাদের এই স্যানাটোরিয়ামটা একটা ছোট প্রতিষ্ঠান—উত্তর প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট কিছু সাহায্য করে—এমাউণ্টটা খুবই সামান্য—বস্তুতঃ এখানকার সমস্ত খরচ আমাদেরই চালাতে হয়, তাই—

বলুন ডাঃ কাটজু থামলেন কেন।

এখানে যারা কাজ করে তারা খুব সামান্য পারিশ্রমিক নিয়েই কাজ করে, কারণ সামর্থ আমাদের খুব সামান্য। তোমার কোয়ালিফিকেশন অনুযায়ী তোমাকে আমরা তেমন ত বিশেষ কিছুই দিতে পারব না।

ও জন্য আপনি ভাববেন না ডাঃ কাটজু—যা পারেন তাই দেবেন। টাকাটা আমার কাছে বড় কথা নয়।

খুশী হলাম তোমার কথা শুনে ডাঃ রায়। অবিশ্যি হসপিটাল আওয়ার্সের বাইরে তুমি প্র্যাকটিশ করতে পার—তুমি যদি চাও—

সে রকম কিছু আপাততঃ আমার প্রয়োজন হবে না। আমি কাজ চাই—কাজের মধ্যে থাকতে চাই—কঙ্কণা বললে।

কাজের অভাব এখানে তোমার হবে না ডাঃ রায়।

ক'টা বেড আছে—এখানে। কঙ্কণা শুধালো।

জেনারেল বেড পঞ্চাশটি আছে—অবিশ্যি সবই পেয়িং বেড। বুঝতেই পারছো পেয়িং বেড না হলে এখানে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব হতো না।

বুঝেছি। কঙ্কণা বললে।

আর আছে পাঁচটি কেবিন। কেবিনের চার্জ বেশী বলে—এখানে সবাই এসে থেকে চিকিৎসা করাতে পারে না আর আছে একটা একস্‌-রে ইউনিট—একটা প্যাথলজিক্যাল ইউনিট।

কয়জন ডাক্তার আছেন এখানে।

আমাকে নিয়ে পাঁচ জন। তুমি এসে জয়েন করলে ছয় জন হবে। আমাদের একজন স্ত্রীলোক ডাক্তারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল—কিন্তু এখানে কেউ আসতে চায় না—একে মাহিনা কম তার উপরে জায়গাটা —Way out of place. এক প্রান্তে নৈনিতাল অন্য প্রান্তে ভীম-তাল—মাঝামাঝি জায়গা এটা—

বর্তমানে সব বেডেই কি রোগী আছে। কঙ্কণা প্রশ্ন করল।

না, কেবিনে তিন জন আর জেনারেল বেডে ত্রিশ জন।

সব মেল পেশেণ্ট।

না—আট জন ফিমেল বাকী বাইশ জন মেল পেশেণ্ট। ফিমেল পেশেণ্টরা সবই উত্তরপ্রদেশের—তার মধ্যে তিন জন মুসলমান। তারা একটু পর্দানশিন—বিশেষ করে ঐ কারণেই এবং ফিমেল পেশেণ্টদের জন্যই আমাদের একজন লেডি ডাক্তারের প্রয়োজন অনেক দিন থেকেই অনুভব করছিলাম। তুমি ঐ রোগিনীদেরই চার্জটা নাও, আমার ইচ্ছা।

॥ ১১ ॥

কঙ্কণা বললে, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে ডাঃ কাটজু, মেল পেশেণ্টদেরও কিন্তু আমি দেখবো—অবিশ্যি ফিমেল পেশেণ্টদের সব ভারই আমি নেবো।

না, না—আপত্তির কি আছে। তুমি তোমার খুশী মত এখানে কাজ করবে। যাঁরা এখানে আছেন সকলেরই সহযোগিতা পাবে।

কবে থেকে তাহলে কাজে জয়েন করবো বলুন। কঙ্কণা বললে।

যে দিন খুশী তোমার। কবে জয়েন করবে বল।

কাল।

খুব ভাল, তবে কাল ত হবে না—কারণ তোমার কোয়ার্টারটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। তুমি বরং আগামী পরশু প্রস্তুত হয়ে থেকো, আমাদের অ্যাম্বুলেন্সটা পাঠিয়ে দেবো—তোমার জিনিসপত্র নিয়ে চলে এসো, কিন্তু ডাঃ রায়—তুমি ত জানতে চাইলে না কত তুমি পাবে এখানে।

যা দেবেন তাই নেবো।

শ চারেক মত পাবে।

যথেষ্ট—একা মানুষ আমি, আর ত বেশী আমার কিছু প্রয়োজন নেই। আমার সঙ্গে সকলের পরিচয়টা করিয়ে দিন।

বেশ ত, চল—

খান পাঁচেক ব্যারাকের মত লম্বা ঘর। সেগুলোর মধ্যেই রোগী ও রোগিণীদের থাকবার ব্যবস্থা। উপরে টালির শেড্—দেওয়াল ও মেঝে পাকা। পাহাড়ী উঁচু নীচু জায়গার মধ্যে ব্যারাকগুলো। সাদা দেওয়াল উপরে লাল রংয়ের টালি বিছানো।

কেবিন পাঁচটি—একটু তফাতে—ছাড়া ছাড়া।

ছোট্ট এক কামরাওয়ালা বাংলো টাইপের।

অফিস ঘরটা আলাদা—তারই সংলগ্ন একস্-রে ও প্যাথলজিক্যাল ইউনিট একপাশে ও অন্য পাশে ছোট একটি অপারেশন থিয়েটার।

আর আছে—ইমার্জেন্সী রুম।

হাসপাতালের কিছু দূরে খান আষ্টেক বাংলো প্যাটার্নের কোয়ার্টার। একটি করে শোবার ঘর—সংলগ্ন একটি বসবার ঘর—কিচেন ও বাথরুম। সামনে ছোট ছোট ফুলের বাগান। হরেক রকমের মরশুমি ফুল ফুটে আছে।

দূরে ধূসর পাহাড় শ্রেণী।

ঝাপসা ঝাপসা চোখে পড়ে।

পাঁচ জন ডাক্তার। সকলেই কাজে ব্যস্ত ছিল।

ডাঃ নারায়ণ মিশ্র—বয়েস হয়েছে পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। এক মাথা কাঁচা পাকা চুল—ছোটোখাটো মানুষটি। উত্তর প্রদেশের লোক। কৃতদার। হাসিখুশি মানুষটি।

আর একজন ডাঃ দেবব্রত সিন্‌হা—বিহার থেকে এসেছেন। তাঁরও বয়স পঁয়তাল্লিশের উপরে—মাঝারি গড়ন একটু খিটখিটে প্রকৃতির। ডাঃ সিন্‌হা তাঁর স্ত্রীকে নিয়েই থাকেন কোয়ার্টারে—ওদের কোনো ছেলেপিলে নেই।

ডাঃ চৌধুরী—তিনিও উত্তর প্রদেশের লোক। বয়েস চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে। বলিষ্ঠ গঠন—এখনো বিবাহ করেন নি। ব্যাচিলার।

ডাঃ আনন্দকিশোর গুপ্ত—বাংলা দেশের লোক যদিও কিন্তু পাস করেছেন লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজ থেকেই।

দুই পুরুষ লক্ষ্ণৌবাসী।

আনন্দকিশোর ডাক্তারদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ—একত্রিশ বত্রিশ বয়েস হবে।

ভারী সুন্দর চেহারা। রোগা পাতলা। রং কালো কিন্তু কালোর উপরে এমন একটা কমনীয়তা আছে যে দেখলে চোখ ফেরান যায় না।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একমাথা চুল। টিকোল নাসা—গভীর আঁখিপক্ষে ঢাকা দুটি চোখের তারায় যেন হরিণ চোখের চাউনি।

ডাঃ কাটজু বললেন, মিস রায়—এই ডাঃ আনন্দকিশোর গুপ্ত। সরকারের ভাল ও লোভনীয় চাকরি পেয়েছিল। বিলেত থেকে এম. আর. সি. পি হয়ে এসে কিন্তু সে চাকরি নিল না—এখানে আমাদের এই হাসপাতালে এসে চাকরি নিল। ফুল অফ লাইফ—ফুল অফ এনার্জি। আনন্দ—

ইয়েস ডাঃ কাটজু—আনন্দ কাটজুর মুখের দিকে তাকাল।

ইনি আমাদের এই ইনস্টিটিশনে জয়েন করছেন—বিলেত থেকে এফ-আর-সি-এস পাশ করে এসেছেন। ডাঃ কঙ্কণা রায়।

আনন্দ হাসি মুখে বললে, নমস্কার—আপনি ত বাঙ্গালী।

কঙ্কণা মৃদু হেসে বললে, তাই—

যাক। বাঁচা গেল—অন্ততঃ একজন এখানে বাংলা কথা বলার মানুষ পাবো।

ডাঃ কাটজু বললেন, আনন্দ, তোমার পাশের বাংলো যেটা খালি আছে সেটাতেই ওর থাকার ব্যবস্থা করছি।

চমৎকার ব্যবস্থা। আনন্দকিশোর বললে।

আমি এখানে নতুন আসছি—আপনি আমাকে সাহায্য করবেন ত।

আনন্দ বললে, কোন সাহায্যের প্রয়োজন হবে না ডাঃ রায়। এখানে যা কেবল কাজের নীতি শৃঙ্খলা আছে—তাও আপনি নিজের মত করেই সব কিছু করতে পারবেন—নো ইণ্টারফিয়ারেন্স।

সত্যি নাকি ?

হ্যাঁ, দেখবেন কাজ করে এখানে আনন্দ পাবেন। তাছাড়া জায়গাটা এমন ভাল না চারিদিকে পাহাড় তারই উপরে এই স্যানাটোরিয়াম—শহর নয় জায়গাটাকে একটা গ্রামও বলতে পারেন। আশেপাশে কিছু পাহাড়ী আছে। একটা থানা, একটা ফরেস্ট অফিস—কেবল একটা কথা।

কি ?

নির্জনতা আপনি ভালবাসেন ত ডাঃ রায়।

খুব ভালবাসি।

ব্যস্—তাহলে দেখবেন এখানে কোন অসুবিধাই আপনার হবে না। তা কবে আসছেন।

পরশু—সামনের শনিবার।

আমি আপনার কোয়ার্টার সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দেবো।

আনন্দ—কাটজু ডাকলেন।

বলুন ডাঃ কাটজু—

ওর কাজকর্ম করে দেবার জন্য একজন লোকের বোধ হয় দরকার হবে।

না—ডাঃ কাটজু। আমার আঙ্কেলের যে লোকটি আছে প্রতাপ সিং সে যদি আসে।

তবে ত খুবই ভাল হবে। ডাঃ কাটজু বললেন।

অতঃপর সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে ডাঃ চৌবের সঙ্গে নৈনিতাল ফিরে এলো কঙ্কণা। পথে আসতে আসতে ডাঃ চৌবে বলেন, তাহলে ওখানেই কাজ করবে তুমি কঙ্কণা?

হ্যাঁ—

খুব ভাল, তোমার আঙ্কেলেরও ঐ ইচ্ছা ছিল—কিন্তু কর্ণেলের বাড়িটার কি করবে—বাড়িটা ত তোমাকেই উনি দিয়ে গেছেন আমি যতদূর জানি।

হ্যাঁ, আমাকেই উইল করে দিয়ে গিয়েছেন। ভাবছি বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেবো।

মন্দ আইডিয়া নয়, ডাঃ চৌবে বললেন।

প্রতাপ সিং কিন্তু রাজী হলো না ভাওয়ালীতে যেতে।

সে বললে, নেহি দিদি, হাম ইধারহি রহেগে।

কিউ—হামারা সাথ চলো না।

না।

কেন রে?

এই কোঠিতে সাহেবের কাছে আমি পনের সাল ছিলাম। আচ্ছা দিদি—

কি রে ?

এ কোঠি কি তুমি বিক্রী করে দেবে ? সাহেবের খুব পেয়ারের কোঠি ছিল এটা। সমস্ত দিল দিয়ে সাহেব এই কোঠিটা ভালবাসতো। এটা তুমি বিক্রী করে দিও না।

না প্রতাপ, এ কোঠি আমি বিক্রী করবো না।

সত্যি বলচো দিদি !

হ্যাঁ, ভাবছি ভাড়া দেবো।

ভাড়া দেবে ?

তাছাড়া খালি কোঠি ফেলে রেখে লাভ কি বল।

তবে তাই দাও।

কিন্তু প্রতাপ যারা ভাড়াটে আসবে তারা যদি তোমাকে নোকরি না দেয় ?

নোকরি আর আমি ত করবো না দিদি। তুমি যদি অনুমতি দাও ত এই কোঠির যে গ্যারাজ ঘরটা আছে সেটাতেই আমি থাকবো। বাড়িটার দেখাশোনা করবো।

চলবে কি করে তোমার প্রতাপ।

সে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে দিদি।

অত ত আমি পারবো না। তোমাকে মাসে মাসে সাহেব কত করে দিতেন।

কর্ণেল সাহেব ?

হ্যাঁ।

একশ করে টাকা দিতেন।

অত ত আমি পারবো না। তোমাকে মাসে মাসে আমি পঞ্চাশ করে দিতে পারি।

তোমার মেহেরবানী দিদি। ওতেই আমার হয়ে যাবে।

সেই ব্যবস্থাই হলো।

পরের দিন আপাততঃ প্রতাপের উপরেই বাড়ির ভার দিয়ে একটা বেডিং ও গোটা তিনেক সুটকেশ নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আসতে তাতে উঠে বসল কঙ্কণা।

জীবনের আর এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলল কঙ্কণা।

ডাঃ আনন্দকিশোর তার বাংলোর সামনেই অপেক্ষা করছিল। অ্যাম্বুলেন্সটা এসে বাংলোর সামনে দাঁড়াতেই আনন্দ কঙ্কণাকে হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানাল।

আসুন ডাঃ রায় আপনার কোয়ার্টার ঠিক করে রেখেছি। আপনার লোক কোথায় ডাঃ রায়, যাকে সঙ্গে আনবেন বলেছিলেন।

সে এলো না ডাঃ গুপ্ত।

এলো না।

না, ও কোঠি ছেড়ে সে আসবে না।

তাহলে কি হবে ?

কিসের কি হবে ?

আপনার কাজকর্ম করে দেবে কে ? রান্না করবে কে ?

কেন—নিজের হাত দুটো ত আছে। হাসতে হাসতে বললে কঙ্কণা।

তা আছে—কিন্তু হাসপাতালের কাজ করে কেমন করে ঐ সব ঝামেলা আপনি পোহাবেন।

দেখা যাক একটা লোক খুঁজে নিলেই হবে যদি দেখি সত্যিই অসুবিধা হচ্ছে।

না। তা সম্ভব হবে না। বরং এক কাজ করবো—আমার যে কাজ করে তার বৌ আছে—বয়েস অল্প হলে কি হবে—দেখেছি খুব চট্‌পটে মাঝে মাঝে ওর স্বামীকে এসে সাহায্য করে। দেখি একবার আমার লোকটাকে বলে, আর যে কটা দিন লোক না পাওয়া যায় আপনি কিন্তু আমার সঙ্গে খাবেন।

না, না—আপনাকে ঝামেলা করতে হবে না ডাঃ গুপ্ত। কঙ্কণা প্রতিবাদ জানায়।

ঝামেলা আবার কি ? আমার ত রান্না হয়ই তার সঙ্গে দু' মুঠো চাল আর দুটো চাপাটি বেশী—

তা হোক, যা পারি আমি নিজেই করে নেবো। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি বরং যার কথা বলছেন তাকে দেখুন।

আনন্দকিশোর আর কোন কথা বলে না।

অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে যে স্ট্রেচার বেয়ারা ছিল সেই সুটকেশ ও বিছানা ঘরে তুলে দিল কঙ্কণার।

ঘরটা ছোট হলে কি হবে, বেশ ছিমছাম। প্রচুর আলোবাতাস্ ঘরে—কঙ্কণার ভালই লাগে ঘরটা দেখে। পুবে পশ্চিমে দুটো জানালা। পশ্চিমের জানালা খুললেই দূরে চোখে পড়ে ঢেউ তুলে তুলে যেন চলে গিয়েছে গিরিশ্রেণী।

তার নীচে পাকা পীচ ঢালা রাস্তাটা সোজা নৈনিতালের দিকে চলে গিয়েছে দেখা যায়। কাঠের ব্রীজটাও দেখা যায় রাস্তাটা যেখানে বাঁয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে বাঁক নিয়েছে—তারপর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। নীচু দিয়ে বহে চলেছে শীর্ণকায়া এক পার্বত্য নদী।

অফিসে যাবেন ত, আনন্দ বললে।

হ্যাঁ, ডাঃ কাটজুর সঙ্গে দেখা করতে হবে—চলুন।

ঐ দিন সকালটা কাজকর্ম বুঝে নিতেই চলে গেল। ফিমেল পেশেণ্টদের এতদিন দেখাশোনা করতেন ডাঃ মিশ্রই।

ডাঃ কাটজু আপাততঃ ঐ ফিমেল পেশেণ্টদের ভার কঙ্কণার হাতেই তুলে দিলেন। কঙ্কণা ঘুরে ঘুরে রোগিণীদের ট্রিটমেণ্ট চার্টগুলো পড়ে নিল। ওয়ার্ডটায় পনেরটি বেড—তার মধ্যে মাত্র দশটি বেডে পেশেণ্ট ছিল।

প্রধানতঃ ঐ স্যানাটোরিয়ামটা যখন তৈরি হয় টি বি রোগীদেরই ওখানে চিকিৎসা করা হতো এবং তাদেরই চিকিৎসার জন্য তৈরী হয়েছিল। এখনো সবই টি বি রোগী।

ডাক্তার ফাদার বারলো একজন আইরিশম্যান, অনেক বছর আগে কাছাকাছি একটা জায়গায় মিশনারীতে কাজ করতে এসেছিলেন।

আশেপাশে কোন হাসপাতাল নেই—লোকেদের চিকিৎসার খুব অভাব—মিশনারীর অর্থ সাহায্যেই ঐ স্যানাটোরিয়ামটা গড়ে তুলেছিলেন তিনি। মাত্র পাঁচটি বেড।

ক্রমশ তিনি একটি দু'টি করে গৃহ বাড়িয়ে যান প্রয়োজন দেখা দেওয়ায়। ভারতের নানা জায়গা থেকে রোগীরা আসতে থাকে। প্রথম দিকে ডাঃ বারলো একাই চিকিৎসা করতেন। তেমন কিছু অসুবিধাও হতো না তার, কিন্তু ক্রমে রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় আরো ডাক্তারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

আরো একজন ডাক্তার এলো ডাঃ নারায়ণ মিশ্র। ডাঃ মিশ্র বহু-দিন হলো ঐ হাসপাতালে আছেন—তারপরই এলেন ডাঃ হৃদয়নাথ কাটজু।

এদিকে হাসপাতালের বেডের সংখ্যা বাড়তে থাকে যত কাজও বাড়তে থাকে। হাসপাতালের প্রসার হয়। একস্‌রে ইউনিট-এর সঙ্গে অপারেশন থিয়েটার ও প্যাথলজিক্যাল ইউনিট চালু করা হয়।

সার্জেন বলতে একমাত্র ডাঃ হৃদয়নাথ কাটজু। তিনি যদিও এডিন-বারার এফ. আর. সি. এস। থোরাসিক সার্জেন কেউ এতদিন ছিল না।

কঙ্কণা থোরাসিক সার্জেন হয়ে এলো।

হাসপাতালটা ঘুরে ঘুরে কাজকর্ম দেখতে দেখতেই বেলা প্রায় একটা বেজে গেল।

ডাঃ আনন্দকিশোর একস্‌রে ইউনিটের ইনচার্জ। সে এসে কঙ্কণার ঘরে ঢুকলো।

ডাঃ রায়—

কে, ডাঃ গুপ্ত, আসুন—

আপনি আমাকে আনন্দকিশোর বলেই ডাকবেন, ইচ্ছা করলে কেবল আনন্দও বলতে পারেন।

আনন্দকিশোরই বলবো তাহলে কেমন—

বেশ। তাই বলবেন। আনন্দকিশোর বললে, খেতে যাবেন না।

হ্যাঁ—চলুন।

হাসপাতাল থেকে বের হয়ে দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

অক্টোবরের শেষ—বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। কিন্তু সূর্যালোকে বেশ আরাম লাগে হাঁটতে।

কঙ্কণা নিজের কোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছিল আনন্দ বললে, ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন। আজ আমার ওখানে আপনার খাবার কথা না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ চলুন। মৃদু হেসে বললে কঙ্কণা।

আনন্দকিশোর তার ভৃত্যকে বলায় ইতিমধ্যে সে তার স্ত্রী কুন্তীকে ডেকে এনেছিল।

সে বললে, সাহেব আমার বহু এসে গেছে।

এসে গেছে ?

হ্যাঁ, এই কুন্তী এদিকে আয়।

কঙ্কণা চেয়ে দেখলো বছর আঠারো উনিশ হবে মেয়েটির। ছিপ্-ছিপে গড়ন।

তুমহারা নাম কুন্তী ? কঙ্কণা বললে—

জী মেমসাব—

নেহি মেমসাব নেহি, দিদি বোলনা।

দিদি—

হ্যাঁ, দিদি।

কুন্তী ফিক্ করে হেসে ফেললে।

তুম খানা পাকানে জানতা।

কিউ নেহি—

ওর স্বামী পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল—বললে, কুন্তী বহুৎ আচ্ছা খানা পাকাতা দিদি।

ঠিক হ্যাঁয়, তুম বইঠো—হাম খানা খাকে—এক সাথ যায়েঙ্গে।

ঠিক হ্যাঁয়—

কুন্তী সত্যিই খুব কাজের এবং চটপটে—আনন্দকিশোর মিথ্যা বলেনি। কিছু রান্না করবার জিনিস পত্র কঙ্কণা সঙ্গেই এনেছিল।

সন্ধ্যাবেলা হাসপাতাল থেকে ফিরতেই কুন্তী সামনে এসে দাঁড়াল, দিদি চা লাই—

বানায়া—

নেহি আভি বানাকে লাতি হুঁ।

যাও—

কুন্তী চলে গেল।

॥ ১২ ॥

দেখতে দেখতে একটা মাস কেটে গেল।

কোথা দিয়ে কেমন করে যে সময় কেটে যায়—কঙ্কণা জানতেও পারে না। হাসপাতাল আর তার পেশেণ্টরা।

ইতিমধ্যে আটজন ফিমেল পেশেণ্টের মধ্যে দু'জন চলে গিয়েছে ডিসচার্জ হয়ে এবং একজন মারা গিয়েছে। আছে এখন মাত্র ছয়জন ফিমেল পেশেণ্ট জেনারেল ওয়ার্ডে—অবিশ্যি কেবিনে একজন ফিমেল পেশেণ্ট কয়েকদিনের মধ্যেই আসছে। যে কোনদিন সে এসে পৌঁছাতে পারে। ডাঃ কাটজু বলে দিয়েছেন তার সব ভার কঙ্কণাকেই নিতে হবে।

কঙ্কণারও অবিশ্যি আপত্তি নেই।

মেল ওয়ার্ডেও মধ্যে মধ্যে কঙ্কণা যায়। বিশেষ করে ওখানে একটি সতর আঠারো বছরের যুবক আছে কল্যাণশ্রী দত্ত। তাকেই দেখতে যায়।

অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে কিন্তু এই বয়সেই ঐ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। ডাঃ মিশ্র তাকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন কিন্তু কল্যাণশ্রী কারো কথা শুনবে না, ফাঁক পেলেই বেড থেকে উঠে বাইরে চলে যাবে।

ডাঃ মিশ্র বলে বলে হার মেনেছেন।

ডাঃ কাটজু এমন কথাও বলেছেন, কথা না শুনলে তাকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হবে।

কল্যাণশ্রী প্রত্যুত্তরে মৃদু মৃদু হাসে।

কঙ্কণার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বিচিত্রভাবে কল্যাণশ্রীর।

এখানে আসার দিন পনের বাদে একদিন হাসপাতালের কাজ সেরে সন্ধ্যার অন্ধকারে টর্চ ফেলে ফেলে ফিরছে কঙ্কণা—হঠাৎ কানে এলো মিষ্টি বাঁশীর সুর।

সুরটা চেনা-চেনা—ভারী মিষ্টি—ছায়ানট।

থমকে দাঁড়ায় কঙ্কণা—এখানে এই হাসপাতালের মধ্যে কে বাঁশী বাজায়? হাসপাতালের অফিস ঘরের ঠিক পিছনেই একটা ইউক্যালিপটাস গাছ আছে—এক পাশে একটা বড় পাথর। তার সুর অনুসরণ করে সেই গাছের নীচে গিয়ে দেখে কে একজন আবছায়া অন্ধকারে পাথরটার উপরে বসে আপনমনে বাঁশী বাজাচ্ছে।

কঙ্কণা আশ্চর্য হয়—হাসপাতাল এরিয়া। কে ওখানে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। আরো দু পা এগিয়ে গেল কঙ্কণা—কে?

বাঁশী থেমে গেল।

কৌন হো তুম—কঙ্কণা প্রশ্ন করে।

আ—আমি—বাংলায় জবাব এলো।

কে তুমি—কোথা থেকে এসেছো? কঙ্কণা শুধায়।

আমি এই হাসপাতালে থাকি। রোগী।

রোগী, কোন্ ওয়ার্ডের রোগী তুমি?

তিন নং ওয়ার্ড—

কি নাম তোমার?

কল্যাণশ্রী দত্ত—পাঁচ নম্বর বেড।

এ সময় এই ঠাণ্ডায় হাসপাতাল থেকে বের হয়ে এসেছো কেন? তোমার বুকের অসুখ—

তা কি করবো—রাত দিন একটা বেডে কেবল শুয়ে থাকা যায় নাকি—কেউ বুঝি পারে? গলায় অভিমানের সুর একটা।

ডাক্তার যখন বলেছে শুয়ে থাকতে তখন শুয়ে থাকতে হবে বৈকি। এটাই ত তোমার রোগের চিকিৎসা।

ভাল লাগে না আমার—দিনরাত কেবল শুয়ে থাকতে।

এসো – ওঠো চল আমার সঙ্গে—

আপনি ডাঃ মিশ্রকে বলে দেবেন।

না—বলবো না।

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ—এসো—

কল্যাণশ্রী উঠে এলো। কঙ্কণা তাকে নিয়ে আবার ওয়ার্ডের দিকে চলতে থাকে। চলতে চলতে বললে—ছিঃ, খুব অন্যায় করেছো—তোমার বুকের অসুখ ঠাণ্ডা লেগে—

কি আর হবে—

কি আর হবে মানে?

আমি জানি আমি আর ভাল হবো না।

কে বললে তোমায় যে তুমি ভাল হবে না। তুমি দেখো ভাল হয়ে যাবে।

আমি জানি। আচ্ছা আপনি কে?

আমি এ হাসপাতালের ডাক্তার—

আপনিই এখানে নতুন এসেছেন লেডি ডাক্তার, তাই না? ডাঃ রায়।

হ্যাঁ—

রাত তখন প্রায় আটটা—তিন নম্বর ওয়ার্ডের পেশেণ্টরা যে যার সব কম্বল মুড়ি দিয়ে মশারি টাঙ্গিয়ে শুয়ে পড়েছে। মাত্র তিনজন পেশেণ্ট—তাদের মধ্যে একজন ঐ কল্যাণশ্রী।

কল্যাণশ্রীর মশারিটা ফেলা—কেউ এলে ভাববে—সে শুয়ে আছে।

দূরে একটা টেবিল—টেবিলের উপরে আলো জ্বলছে।

সেই আলোতেই কঙ্কণা তাকালো কল্যাণশ্রীর মুখের দিকে। কিশোর বললেও অত্যুক্তি হয় না। রোগা পাতলা চেহারা, পরনে একটা পায়জামা—তার উপরে একটা শার্ট ও গরম পুলওভার। চোখে চশমা।

ওষ্ঠের ওপর সরু চিকন গোঁফ।

কল্যাণ—

বলুন।

যাও শুয়ে পড়গে—

ডাঃ মিশ্রকে আপনি বলে দেবেন না ত?

না, না—যাও—শুয়ে পড়।

আপনি যান। আমি শুয়ে পড়ছি—

না—তুমি আগে শোও, তারপর আমি যাবো।

শুলে এখন আমার ঘুম আসবে না।

শোও—শুলেই দেখবে ঘুম আসবে—

কল্যাণশ্রীকে শুইয়ে মশারি গুঁজে দিয়ে কঙ্কণা চলে গেল।

* * *

পরের দিন নিজের ওয়ার্ডের কাজ শেষ হতেই কঙ্কণা হাঁটতে হাঁটতে তিন নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে ঢুকল।

সিস্টার মার্থা পেশেণ্টদের টেম্পারেচার চার্টগুলো ঠিক করে রাখছিল—কঙ্কণার জুতোর শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে বলে গুড মর্নিং ডাক্তার—

৩নং বেডের পেশেণ্ট কোথায় সিস্টার? কঙ্কণা শুধালো।

কল্যাণশ্রী।

হ্যাঁ—

ও কি এক মুহূর্তও বেডে থাকে নাকি—দেখুন গিয়ে বাইরের বারান্দায় বসে ছবি আঁকছে—ভারী চমৎকার হাত ছেলেটির ছবির।

কঙ্কণা ঘরের বাইরে পিছন দিককার বারান্দায় গিয়ে দেখলো—একটা চেয়ারে বসে সামনের টুলটার উপরে কাগজ রেখে রং তুলি দিয়ে কল্যাণ ছবি আঁকছে। ওর আগমন টেরও পায় নি। এক মাথা এলোমেলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—তৈলহীন রুক্ষ।

কল্যাণ—

কঙ্কণার ডাকে মুখ তুলে তাকাল কল্যাণশ্রী। এক মুখ হাসি, লেন্সের ওপরে বড় বড় টানা টানা দুটি চোখ।

আপনি?

কি করছো—

ছবি আঁকছিলাম।

কি আঁকছিলে দেখি—

সেদিন বিকেলে একটা পাহাড়ী পাখি এসে ঐ বাগানের লেবু

গাছটায় বসেছিল—ভারী সুন্দর দেখতে—সেইটাই আঁকছিলাম। এখনো শেষ হয় নি—

বাঃ সুন্দর !

কল্যাণশ্রী উঠে দাঁড়িয়েছিল। কঙ্কণা বললে—দাঁড়িয়ে কেন, বোস।

জানেন—আজ চিঠিতে লিখেছি দিদিভাইকে আপনার কথা।

আমার কথা ?

হ্যাঁ—

তুমি ত আমাকে চেনোই না—জানই না।

বাঃ, জানবো না কেন, রোজ ত দেখি ওয়ার্ডে যাবার সময়—

তাই বুঝি, তা কি লিখলে ?

লিখেছি—দিদিভাই, এখানে একজন নতুন লেডি ডাক্তার এসেছেন—ঠিক তোমার মত দেখতে সুন্দর—

আমি বুঝি সুন্দর ?

সুন্দরই তো।

বাড়িতে তোমার আর কে কে আছেন কল্যাণ ?

আর ত কেউ নেই—দিদিভাই আর আমি।

তোমার মা বাবা—

অনেক দিন আগে একটা মোটর অ্যাকসিডেণ্টে মারা যান—আমি তখন মাত্র আট বছরের। দিদিভাই আমাকে মানুষ করেছে।

দিদিভাইয়ের তোমার বিয়ে হয় নি ?

দিদিভাই বিয়ে করে নি। প্রফেসারি করে।

কোথায় থাকে ?

পাটনায়। আচ্ছা আপনাকে যদি দিদি বলে ডাকি, রাগ করবেন ?

কেন রাগ করবো। তাই ডেকো।

অদ্ভুত একটা আকর্ষণ যেন অনুভব করে কল্যাণশ্রীর প্রতি কি এক দুর্বার আকর্ষণে যেন ছেলেটি তাকে টানে।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার পরই কল্যাণের রোগ ধরা পড়ে। পাটনা শহরে বেশ কিছুদিন চিকিৎসা করার পর সেখানকারই একজন বড় ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে এই স্যানাটোরিয়ামে ভাইকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে কল্যাণের দিদি শকুন্তলা।

সকালে বিকালে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলেই কল্যাণের ওয়ার্ডে যায় কঙ্কণা।

ডাঃ নারায়ণ মিশ্রের কাছে কল্যাণের রোগের সম্পূর্ণ হিস্ট্রি পেয়েছিল কঙ্কণা। কঙ্কণা একদিন বলে, ওর লেফ্‌ট লাংসটায় লোবাকটমি করলে হয় না ডাঃ মিশ্র। আপার লোবটা যদি কেটে বাদ দেওয়া যায় যেখানে ক্যাভিটি দুটো আছে—

ডাঃ নারায়ণ মিশ্র বললেন—কথাটা যে আমার মনে হয় নি ডাঃ রায় তা নয়। কিন্তু আমার ছুরি চালাতে ইচ্ছা করেনি।

কেন?

মনে হয়েছে ন্যাচারাল ওয়েতেই ঐ ক্যাভিটি দুটো হিল আপ করে যাক। আর একটু একটু করে মনে হচ্ছে যাচ্ছেও তাই। সারজিক্যাল ইন্টারফিয়ারেন্স—

আমি যদি করি আপনার আপত্তি আছে ডাঃ মিশ্র?

না। আপত্তির কি থাকতে পারে? তা ছাড়া ডাঃ কাটজু—তিনিও আমার মতে মত দিয়েছিলেন।

আমি ডাঃ কাটজুর সঙ্গে কথা বলবো।

কঙ্কণা একদিন ডাঃ কাটজুর কাছে কথাটা উত্থাপন করলো। তিনি সব শুনে বললেন—আমিই করতাম ডাঃ রায়। কিন্তু বয়েস হয়েছে তাই—

আমি যদি করি আপনার আপত্তি নেই ত?

না—না। কোন আপত্তি নেই।

অপারেশন করাই স্থির করে কঙ্কণা।

কল্যাণশ্রীকে একদিন বললে কঙ্কণা, আমি প্রায় এখানে দু মাসের কিছু বেশী জয়েন করেছি—এর মধ্যে ত তোমার দিদিভাই একবারও তোমাকে দেখতে এলেন না কল্যাণ?

কঙ্কণা মনে মনে ভেবেছিল—কল্যাণশ্রীর দিদি শকুন্তলা ত মধ্যে মধ্যে ভাইকে দেখতে আসে। একবার অপারেশনের কথাটা তাকে বলবে।

কল্যাণশ্রী বললে, দিদিভাইয়ের আসবার সময় হয়েছে—আড়াই মাস তিন মাস অন্তর অন্তরই দিদিভাই আমাকে দেখতে আসে—যে কোন দিন আসতে পারে। দেখবেন দিদি, আমার দিদিভাই আসলে তার সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন—খুব ভাল লাগবে আপনার আমার দিদিভাইকে।

দিন দুই বাদেই বেলা এগারটা নাগাদ একটা ট্যাকসি এসে হাসপাতালের সামনে দাঁড়াল। কঙ্কণা তখন ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে অফিসের দিকে যাচ্ছিল—সে দেখতে পেলো ট্যাকসী থেকে নামছে এক তরুণী।

রোগা পাতলা চেহারা। রং যদিও কালো, দেখতে কালোর উপরে চমৎকার। পরনে একটা হালকা নীল রংয়ের সিল্কের শাড়ি। মাথার চুল খোপা করে বাঁধা। গায়ে একটা সাদা রংয়ের শাল। চোখে সরু সোনার ফ্রেমের চশমা।

মনে হয় কঙ্কণার তরুণী অনেকটা কল্যাণশ্রীর মতনই যেন দেখতে —মুখের আদল ঠিক যেন তেমনি। কঙ্কণা এগিয়ে যায় এবং তরুণীকে সম্বোধন করে বলে, আপনি বোধহয় কল্যাণশ্রীর দিদিভাই শকুন্তলা দেবী।

শকুন্তলা মুখ তুলে তাকাল। বললে, হ্যাঁ—কেন বলুন ত? কল্যাণ ভাল আছে ত?

হ্যাঁ—ভালই আছে।

আঃ, বাঁচালেন। কিন্তু আপনাকে ত চিনতে পারলাম না। আগেও এখানে আপনাকে কখনো দেখি নি—

না। দেখেন নি, আমি এখানে নতুন এসেছি। আচ্ছা আপনি যান ওয়ার্ডে—আমি অফিস থেকে ঘুরে ওখানেই যাবো।

শকুন্তলা চলে গেল।

তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে শকুন্তলা ওয়ার্ডের দিকে।

॥ ১৩ ॥

কল্যাণশ্রীর ওয়ার্ডে ঢুকে দাঁড়িয়ে গেল শকুন্তলা।

তিনটি বেড ঘরের তিন দিকে—দুটো বেডে শয্যা পাতা—অন্য বেডটি খালি। ম্যাট্রেসটাও কট থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে—ঘরের মধ্যে কেউ নেই।

শকুন্তলা জানত তার ভাইটি কি রকম চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির। ডাক্তার যদিও তাকে বেশীর ভাগ সময়ই খাটে শুয়ে বিশ্রাম নিতে বলেছেন—কল্যাণশ্রী ডাক্তারের কথামত চলে না।

শকুন্তলাও যখনই এসেছে ভাইকে সে কথা বলেছে। কল্যাণশ্রী বলেছে, ভাল লাগে না দিদিভাই, দিনরাত ঐ বিছানায় শুয়ে থাকতে। শুয়ে থাকলে কেবলই আমার মনে হয় আমি যেন কত কাল শুয়ে আছি—শুয়েই আছি।

একটা চিঠিতে কল্যাণশ্রী লিখেছিল ঃ

জান দিদিভাই, সেদিন দুপুরে বিছানায় শুয়েছিলাম। হঠাৎ কানে এলো একটা পাখির মিষ্টি ডাক—মনে হলো পাখিটা এসে বলছে, এসো বাইরে এসো—বাইরে কী সুন্দর নীল আকাশ—তার গা বেয়ে আলোর ঝরনা ঝরছে—মেঘেরা পাল তুলে দিয়েছে—দেওদার আর শিরিষ গাছের পাতায় পাতায় হাওয়ার দোলা। আমি শয্যা থেকে উঠে পড়লাম। ভুলে গেলাম গত রাত্রে আমার জ্বর হয়েছিল—সকালের দিকেও জ্বর ছিল।

বের হয়ে ঘর থেকে পেছনের বাগানে গেলাম। সেই যে ইউ-ক্যালিপটাস গাছটা তুমি দেখেছিলে আমার ঘরের পিছনে, দেখি তারই নীচু ডালটায় বসে একটা ছোট নীল রংয়ের পাখি আপন মনে লেজ দুলিয়ে ডেকে চলেছে।

নীল পালকের উপর লাল রংয়ের ছিটার মত বুটি। কি সুন্দর পাখিটা না দিদিভাই। পাহাড়ী পাখি নামও জানি না।

হঠাৎ পাখিটা ডাকতে ডাকতে এক সময় উড়ে গেল।

পরের দিনও দুপুরে শুনতে পেলাম পাখিটা ডাকছে। বের হয়ে গেলাম ঘর থেকে—সেই নীল পাখিটা।

মনে আছে দিদিভাই, তোমার সেই মেটারলিংকের ব্লু বার্ডের কথা। সেই নীল পাখিটা। আমার মনে হলো এ যেন সেই পাখিটাই।

পাখিটা কিছুক্ষণ পরে খোলা আকাশের তলায় ডানা মেলে দিয়ে উড়ে গেল। পর পর দুদিন এসেছিল পাখিটা। আর আসে না। আমি কান পেতে থাকি কখন সে এসে গাইবে নীল আকাশের গান।

সংবাদ আনবে দখিন হাওয়ার—ফুল ফোটার। কোন নাম-না-জানা ঝরণার—আসে না কেন আর দিদিভাই পাখিটা। সেই নীল পাখিটা—

শকুন্তলা ওয়ার্ডের পেছনে বাগানে গেল।

সেই বড় পাথরটার উপরে ইউক্যালিপটাস গাছটার নীচে বসে আছে কল্যাণশ্রী চুপটি করে।

কল্যাণ—

শকুন্তলার ডাকে চোখ তুলে তাকাল কল্যাণ, দিদিভাই—

কল্যাণ তাড়াতাড়ি উঠে এসে শকুন্তলাকে দু হাতে আঁকড়ে ধরে।

কেমন আছিস রে ?

ভাল। খুব ভাল—জান দিদিভাই আজকাল আর আগের মত এখানে থাকতে অত খারাপ লাগে না।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ, দিদি প্রায়ই আসে—

দিদি ?

হ্যাঁ—দেখ না তার আসার সময় হয়েছে। এখুনি আসবে।

কে সে ?

এখানকার নতুন ডাক্তার একজন। কয়েক মাস হলো এখানে এসেছে, তোমাকে ত চিঠিতে লিখেছিলাম।

শকুন্তলার মনে হয় সেই মহিলা যাকে এখানে আসতে আসতে সে দেখলো।

হ্যাঁ রে কল্যাণ।

কি দিদিভাই—

তোদের ঘরে যে আর একজন ছিল তার বিছানাটা দেখলাম খালি।

শচীনদার কথা বলছো ত?

হ্যাঁ—

সে নেই দিদিভাই।

নেই?

না—দিন পাঁচেক আগে হঠাৎ একদিন রক্তবমি করলেন শচীনদা খানিকটা, তারপরই আমাকে বললেন—কল্যাণ-ভাই, আমি চললাম। চোখ দুটো তার বুঁজে এলো—ঘুমিয়ে পড়লেন। ডাঃ মিশ্র যখন এলেন খবর পেয়ে—শচীনদা চলে গেছেন।

চল কল্যাণ ওয়ার্ডে যাই—শকুন্তলা বললে।

না দিদিভাই—ওয়ার্ডে গেলেই যেন আমার মনে হয়—পশ্চিম দিকটার বেডটা থেকে শচীনদা আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

কঙ্কণাকে ঐ সময় দেখা গেল—ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে ওদের দিকেই আসছে।

কল্যাণশ্রী বললে, ঐ যে দিদি আসছে।

কল্যাণ বললে, দিদি, এই আমার দিদিভাই।

কঙ্কণা হাসতে হাসতে বললে, আলাপ আমাদের হয়ে গিয়েছে। তারপর শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে বললে, আমার নাম কঙ্কণা রায়।

দিদিভাই, কল্যাণ ডাকল।

কি রে?

তুমি ত আজই বিকালের দিকে চলে যাবে?

হ্যাঁ—ট্যাকসিওয়ালাকে বলে দিয়েছি চারটা নাগাদ আসতে—

কঙ্কণা বললে, না, না—আজই যাবেন কেন? দুটো দিন ভাইয়ের

কাছে থেকে যান। ও যে কিভাবে আপনার এখানে আসার দিনটির প্রতীক্ষায় থাকে।

জানি ডাঃ রায়। কিন্তু এখানে যে থাকার কোন ব্যবস্থা নেই।

আগে ছিল না ঠিকই, কিন্তু এখন ত আর কোন অসুবিধা নেই। আপনি আমার কোয়ার্টারেই থাকবেন আমার কাছে।

আপনার কোয়ার্টার।

হ্যাঁ—কোন অসুবিধা হবে না আপনার।

না—না, আপনাকে আবার বিব্রত করাটা—

বিব্রত করবেন কেন, আমার ঘরে না শুতে চান আমার পাশের ছোট ঘরটায় ব্যবস্থা করে দেবো।

কেন কষ্ট করবেন আমার জন্য।

এর মধ্যে কষ্টের কি আছে। চলুন বেলা প্রায় বারোটা বাজে। আমার কোয়ার্টারে চলুন খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করে আবার কল্যাণের কাছে আসবেন।

শকুন্তলা তথাপি আপত্তি জানায়, কিন্তু কঙ্কণা ওর কোন আপত্তিই কানে তোলে না। কল্যাণও বলে—তাই যাও না দিদিভাই। ঘণ্টা কয়েকের জন্য তুমি আসো, তারপরই চলে যাও। আমার একটুও ভাল লাগে না।

শকুন্তলা আর আপত্তি জানায় না।

ছোট একটা টেবিলে মুখোমুখি খেতে বসে শকুন্তলা বললে, জোর করে ধরে রাখলেন আমাকে—আপনার কত কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট এতটুকুও না—বরং এই বিদেশে এই জায়গায় আপনাকে পেয়ে আমার সত্যিই খুব ভাল লাগছে। কষ্টর কথা যদি বলেন ত—আপনারই কষ্ট হচ্ছে।

না—না। এতটুকুও না। জানেন ডাঃ রায়, ঐ ভাইটি ছাড়া দুনিয়ায় আমার আর আপনার বলতে কেউ নেই। ঐ ভাই আর আমি।

কল্যাণ আমাকে আপনার সব কথা বলেছে শকুন্তলা দেবী।

তাই নাকি। কি বলেছে?

আপনি ঐ ভাইয়ের জন্যই বিয়ে করলেন না।

কেমন করে করি বলুন। ও যে এখনো মানুষ হলো না। অমন ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র—বি-এস-সি পরীক্ষা দেবার আগেই রোগটা ধরা পড়লো। আচ্ছা ডাঃ রায়, ও এখন কেমন আছে?

ভালই—তবে আমার মনে হয় একটা অপারেশন করতে পারলে ও আরো তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে।

অপারেশন?

হ্যাঁ—বাঁ দিককার লাংসটা যেখানে ড্যামেজড্ হয়েছে সেখান থেকে খানিকটা কেটে বাদ দিয়ে দিলে—

ভয়ের কিছু নেই?

না—ভয়ের কি থাকবে। ওদেশে ত হরদম হচ্ছে—

না—থাক ডাঃ রায়। অপারেশন দরকার নেই।

আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?

কিন্তু—

ডাঃ মিশ্রর সঙ্গে আমার কয়েকদিন আগে কথাও হয়েছে। ডাঃ কাটজুকেও বলেছি—

ওরা কি বললেন?

ওরাও আমার সঙ্গে এগ্রি করেছেন। অবিশ্যি কথাটা আপনাকে না জানিয়ে করতাম না অপারেশন। তা আপনি যখন এসে গেছেন—

সত্যিই ভয়ের যদি কিছু না থাকে তাহলে আপনারা যা ভাল বোঝেন—করুন।

আপনি তাহলে বণ্ডে সই করে দিয়ে যাবেন।

শকুন্তলা যেন কেমন আনমনা হয়ে যায়। কঙ্কণা ব্যাপারটা বুঝতে পারে। বললে, কি ভাবছেন—

না—কিছু না।

কয়েকদিন বাদেই অপারেশন করবো। আপনি ইচ্ছা করলে সে সময় আসতে পারেন।

আমি আর এসে কি করবো?

আপনি কাছে থাকলে কল্যাণ মনে অনেকটা জোর পাবে।

ওর এমনিতেই খুব মনের জোর। ভয়ডর বলে কিছু ও জানে না।

জানি তা।

ঐ দিনই রাত্রে।

কঙ্কণা হাসপাতালের স্টোর থেকে একটা এক্স্ট্রা কট আনিয়ে নিয়েছিল। পাশাপাশি দুটো শয্যায় দুজনে শুয়েছিল।

ঘুমোলেন নাকি শকুন্তলা দেবী? কঙ্কণা শুধায়।

না। আপনি আমাকে শকুন্তলা বলেই ডাকবেন। আমরা বোধ হয় একবয়সী। আচ্ছা কঙ্কণা—

কি?

কল্যাণকে বলেছো?

কি?

বলছিলাম অপারেশনের কথা ওকে কিছু বলেছো?

না—এখনো বলিনি—কঙ্কণা বললে।

দু দিন থেকে তিন দিনের দিন শকুন্তলা চলে গেল। অপারেশনের দিন ঠিক হলে তখন শকুন্তলা আসবে বলে গেল।

যাচ্ছি ভাই কঙ্কণা, কি নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি তা আমিই জানি। শকুন্তলা কঙ্কণার হাত দুটি ধরে বলে।

হাসপাতালের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কঙ্কণা পাহাড়ী আঁকা-বাঁকা উঁচুনীচু পথটার দিকে চেয়ে থাকে যতক্ষণ একটা বাঁকের আড়ালে শকুন্তলার ট্যাক্সীটা না মিলিয়ে যায়।

কঙ্কণার মনের মধ্যে কিন্তু একটা ভয় জাগছে।

যে অপারেশন সে নিজের হাতে করতে চলেছে—সে অপারেশন

অনেকগুলো দেখলেও আজ পর্যন্ত নিজের হাতে সেই অপারেশন সে করে নি।

অপারেশনটা কঠিন।

শকুন্তলার সঙ্গে আলাপ হবার আগে পর্যন্ত তার মনের মধ্যে কোথাও কোন দ্বিধা ছিল না, কিন্তু এখন যেন একটা দ্বিধায় মনটা পীড়িত হচ্ছে।

পারবে ত—ঠিক মত অপারেশন করতে পারবে ত সে ?

সেই কথাটাই ভাবতে ভাবতে ওয়ার্ডের দিকে হাঁটছিল কঙ্কণা, পথে ডাঃ কাটজুর সঙ্গে তার দেখা—

এই যে ডাঃ রায় তোমার খোঁজই আমি করছিলাম। ডাঃ কাটজু বললেন।

কেন ডাঃ কাটজু—

শেষ বার যখন বিলেতে যাই বছর দুই আগে এডিনবারাতে ইনটার-ন্যাশান্যাল সার্জিক্যাল কনফারেন্সে—ওখানে এডিনবারা হাসপাতালে একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। একজন ভারতীয় ইয়ং ডাক্তার—সে তখন ওখানে সবে লণ্ডন থেকে এফ-আর-সি-এস করে কাজ দেখছে—a bright young man—সে আসছে আগামী পরশু।

তিনি বুঝি এই হাসপাতালে জয়েন করছেন ?

না, না—

তবে ?

এখানে এই স্যানাটোরিয়ামে কিছুদিন থাকবেন। আমি তার চিকিৎসা করবো।

কেন—কি হয়েছে তার ?

ওখানকার মানে তোমাদের ক্যালকাটার অনেক ডাক্তার তাকে দেখেছেন—

কঙ্কণা অবিশ্যি বিস্মিত হয় না। কারণ ডাঃ কাটজুর নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে একজন বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক হিসাবে। বছর দুই আগে তিনি ইনটারন্যাশান্যাল কনফারেন্সে এটেণ্ড করতে গিয়ে-

ছিলেন—তাঁর নিজস্ব পেপার ছিল, ইলিওসিকাল রিজিয়ান গ্রোথের উপর। কাজেই তাঁর কাছে কেউ আসবে চিকিৎসার জন্য খুব একটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

ডাঃ কাটজু।

ইয়েস ডাঃ রায়।

আমি সামনের সোমবার কল্যাণশ্রীকে অপারেশন করবো স্থির করেছি।

ঠিক আছে—

আপনি কিন্তু আমার পাশে থাকবেন।

নিশ্চয়ই, মোস্ট গ্ল্যাডলি। আই উইশ ইয়োর সাকসেস।

থ্যাংক ইউ ডাঃ কাটজু—

কাটজু তাঁর অফিস ঘরের দিকে চলে গেলেন।

॥ ১৪ ॥

অত্যন্ত ভাল লাগে কঙ্কণার ঐ বর্ষিয়ান মানুষটিকে।

অতবড় একজন দেশবিশ্রুত শল্যচিকিৎসক—ইচ্ছা করলে কত বড় বড় হাসপাতালে থাকতে পারতেন কিন্তু এই ছোট্ট হাসপাতালটির মায়া কাটিয়ে কোথাও যান নি। বলতে গেলে সারাটা জীবনই এই হাসপাতালে কাটিয়ে গেলেন।

আগে অবিশ্যি খুব একটিভ ছিলেন—কিন্তু গত বৎসর একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবার পর থেকে একটু যেন কেমন মন্থর হয়ে গিয়েছেন।

হাসপাতালের এখনো সর্বেসর্বা—কিন্তু বেশীর ভাগ দায়িত্বই এখন ডাঃ নারায়ণ মিশ্রের উপরে।

নামে ডাঃ কাটজু ঐ হাসপাতালের ইনচার্জ হলেও প্রকৃতপক্ষে ডাঃ নারায়ণ মিশ্রের উপরই সব দায়িত্ব তিনি ছেড়ে দিয়েছেন।

কঙ্কণা এসে কল্যাণশ্রীর ওয়ার্ডে ঢুকলো।

কল্যাণ তার শয্যায় শুয়ে একটা বই পড়ছিল—শেষ বেলাকার খানিকটা রোদ তার শয্যার প্রান্তে এসে পড়েছে খোলা জানালাপথে।

কঙ্কণার জুতোর শব্দে হাতের বইটা মুড়ে কল্যাণ কঙ্কণার দিকে তাকাল, দিদি—

কি করছো কল্যাণ ?

দিদিভাই কয়েকটা বই দিয়ে গিয়েছে—তাই পড়ছিলাম।

কি বই ?

রহস্য উপন্যাস।

তুমি বুঝি রহস্য উপন্যাস পড়তে খুব ভালোবাসো।

হ্যাঁ—রহস্য উপন্যাস পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। আপনার লাগে না দিদি—

আমিও ভালবাসি। কল্যাণ—

বলুন।

আজ তো শুক্রবার—সামনের সোমবার ভাবছি তোমার অপারেশন করবো।

দিদিভাইকে বলেছেন নাকি। বলবেন না—দিদিভাই ভয় পাবে—

আরে না, না—সে একটুও ভয় পায় নি।

সত্যি বলছেন।

হ্যাঁ—তিনি তো মত দিয়ে গেছেন। তোমার ভয় হচ্ছে না তো।

না—একটুও না।

দেখো—তুমি আরো দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে অপারেশনের পর, কঙ্কণা বলল, তারপর দেখো তুমি বাইরে বেড়াতে পারবে।

নার্স মার্থা এসে ঐ সময় ওয়ার্ডে ঢুকল।

কিছু বলবেন সিস্টার।

আপনাকে খুঁজছিলাম। মার্থা বললে।

কেন?

ঐ যে নতুন পেশেণ্টটি এসেছে—

কার কথা বলছো—মাধবী চ্যাটার্জী।

হ্যাঁ—

কি হয়েছে তার?

জ্বরটা কিছুতেই একেবারে ফুল রেমিশান হচ্ছে না—অথচ ঔষধ খাবে না—

আবার গোলমাল শুরু করেছেন মিসেস চ্যাটার্জী।

হ্যাঁ—

চল আমি আসছি।

বয়স খুব বেশী নয় মিসেস মাধবী চ্যাটার্জীর।

বাংলাদেশের একজন নামকরা মঞ্চ অভিনেত্রী।

তার স্বামীই তাকে এখানে ভর্তি করে দিয়ে গিয়েছেন কেবিনে কিছুদিন আগে।

মাধবীর বয়স খুব বেশী নয়—তেত্রিশ চৌত্রিশ। প্রথম প্রথম ওকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন ওর স্বামী—কিন্তু ডাক্তারের কথা শুনতো না—সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন কিন্তু মাধবী চলে যেতো মঞ্চে—অভিনয় করবেই সে।

তাই কলকাতা থেকে এত দূরে এখানে এনে ভর্তি করে দিয়ে গিয়েছেন স্বামী—যাতে ভালো করে চিকিৎসা হয়।

এখানেও মাধবী একমাত্র কঙ্কণার কথা ছাড়া আর কারো কথা শোনে না। ওয়ার্ডের সিস্টার মার্থাকে তো আমলই দেয় না।

কি হয়েছে আমার? কেন সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকবো।

ডাঃ রায় তাই বলেছেন তো।

বলুন—আমি দিনরাত বিছানায় শুয়ে থাকতে পারব না।

আপনার জ্বরটা একেবারে রেমিশান হচ্ছে না—এ অবস্থায় হাঁটা-চলা করলে আরো যে অসুখ বেড়ে যাবে।

যাক। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল।

মাধবী কারো কথাই শুনবে না।

কঙ্কণা এসে দেখে ওয়ার্ডে বিছানায় নেই মাধবী। সামনের বাগানে একটা দেওদার গাছের নিচে বসে আছে।

কঙ্কণা বললে, আবার বেড ছেড়ে উঠে এসেছেন। চলুন ভিতরে চলুন।

কেন—এখানে একটু বসে থাকি না। মাধবী বললে।

জ্বরটা ফুল রেমিশান হোক তারপর বাইরে বেড়াবেন।

এ জ্বর আর ছাড়বে না।

কঙ্কণা হেসে ফেলে। বললে, কে বলেছে আপনাকে।

আমি জানি।

আপনি জানেন!

হ্যাঁ। আমার দিদিরও এই রোগ হয়েছিল—তার তো কত চিকিৎসা করেছি আমি—ভাল কি হলো দিদি—আমি জানি আমারও এ রোগ সারবে না—এ রোগ একবার হলে আর সারে না—

আপনি তো কলকাতার একজন নামকরা মঞ্চ অভিনেত্রী। কঙ্কণা ইচ্ছা করেই প্রসঙ্গটা পালটে দেয়।

আপনি দেখেছেন আমার অভিনয় ?

না।

দেখেন নি ?

দেখবার সুযোগ হয় নি। তবে শুনেছি কলকাতায় থাকতে আপনার নাম কাগজে।

শুনবেন আমার অভিনয় ?

কেমন করে শুনবো।

আজ তো শুক্রবার—আকাশবাণী কলকাতা থেকে রেডিওতে আজ আমার অভিনীত একটা বই শোনান হবে।

তাই নাকি !

আপনার রেডিও আছে ?

আছে ট্রানজিস্টার।

সত্যি—আনবেন সেটা আজ সন্ধ্যার পর ?

আনবো—শুনবো আপনার অভিনয়। চলুন সন্ধ্যা হয়ে আসছে আর এখন বাইরে থাকবেন না—উঠুন।

মাধবী উঠে পড়লো।

বললে, যাচ্ছি আমি কিন্তু শুয়ে থাকতে পারবো না।

না শুলে কি বিশ্রাম হয়। কঙ্কণা বললে।

বিশ্রামই তো করছি—দিবারাত্রই তো বিশ্রাম করছি। কোন কাজ নেই কর্ম নেই।

কঙ্কণা মৃদু মৃদু হাসে মাধবীর কথায়।

মাধবীকে তার কেবিনে পৌঁছে দিয়ে কঙ্কণা ওয়ার্ড থেকে আবার বের হয়ে এলো।

কাজ নিয়েই থাকে সর্বক্ষণ কঙ্কণা। আজকাল মধ্যে মধ্যে যে প্রশ্নটা তার মনে জাগে সেটা হচ্ছে এইভাবেই কি তার সারাটা জীবন সে কাটাতে চেয়েছিল। তা ত সে চায়নি।

কাজের শেষে একটি গৃহকোণ—যেখানে সারাদিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর সে খুঁজে পাবে একটু আনন্দ, শুনবে কারো কাছ থেকে একটি মধুর ডাক।

তার নিজস্ব একটি সংসার।

কিন্তু ভাগ্যবিধাতা আর তাকে সে আনন্দটুকু দিলেন না।

মিথ্যা লেখে নি সে নীলাদ্রিকে।

ইন্দ্রজিৎকে নিয়েই সে তেমনি একটি সংসার গড়ে নিতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নিজের ভাগ্যকেই মেনে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সে ব্যর্থ হলো—আর সেই ব্যর্থতাই তাকে শেষ পর্যন্ত তার ওষ্ঠের সামনে তুলে ধরেছিল বিষের পাত্র। কিন্তু সেখানেও সে প্রতারিত হলো।

যে নীলাদ্রিকে সে ভুলতে চেয়েছিল এবং ভুলেই গিয়েছিল। সেই নীলাদ্রিই আবার তিন বৎসর পরে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলল।

কেন? কি প্রয়োজন ছিল নীলাদ্রির সেদিন তাকে বাঁচিয়ে তুলবার?

প্রশ্নটা বার বার যেন আজকাল তার মনের সামনে এসে দাঁড়ায়। নীলাদ্রি কি সত্যিই তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে, না সে এক মৃত শরীর—মৃত মনের দুঃসহ ভার বহন করে চলেছে। সে তো সাধারণের বাইরে কিছু নয়—সাধারণ থেকে পৃথক কেউ নয়। যেসব মেয়ে আছে তাদেরই মতএকজন।

নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এসে অন্ধকারে নিজের শয়নঘরে একটা বেতের চেয়ারে বসে কঙ্কণা ঐ কথাগুলোই ভাবছিল।

দিদি--

অন্ধকারে কুন্তীর ডাক শুনে ঘুরে তাকাল কঙ্কণা।

আলো জ্বালাও নি কেন দিদি। কুন্তী শুধালো। আলোটা জ্বালিয়ে দেবো?

দে—

কুন্তী সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিল।

এমন ভাবে বসে আছো তবিয়ৎ কি তোমার আচ্ছা নেই দিদি ?

না-রে ভালই আছে—

দিদি—

কিরে—

একটা বাত বলবো। গোসা করবে নাতো ?

না, না—গোসা করবো না। বল না কি বলবি। কঙ্কণা বললে।

রাতে আমি যদি তোমার এখানে থাকি—

রাতে থাকবি—কেনরে বাড়ি যাবি না ?

না।

তোর মরদ তোকে কিছু বলবে না ?

বলুক গে—

কুন্তী সারাটা দিন থাকে—রাত্রে কঙ্কণার খাওয়া হয়ে গেলে সে চলে যায়—পাহাড়ের নীচে কিছু দূরে পাহাড়ী বস্তিতে ওরা থাকে।

রাত্রে ওর স্বামীই এসে ওকে যাবার সময় ডেকে নিয়ে যায় কোন কোন দিন। অবিশ্যি ও একা একাই ফিরে যায় বেশীর ভাগ দিন।

তা হ্যাঁরে বাড়িতে যাবি না কেন ? কঙ্কণা শুধায়।

না। যাবো না।

ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে বুঝি ?

না—

তবে ?

আমি আর ওর কাছে ফিরে যাবো না।

ঝগড়াঝাঁটি যদি না হয়ে থাকে তো কি হয়েছে—বল না।

আজ মাসখানেক হলো—রোজ রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়লে ও ঘর থেকে চলে যায়—ও ভাবে আমি ব্যাপারটা জানতে পারি নি—

কোথায় যায় ?

অন্য মেয়েমানুষের কাছে—

অন্য মেয়েমানুষ !

হ্যাঁ—গত বছর অর্জুন সিং মারা গেল—তার বিধবা স্ত্রী রাঙ্গিয়া আছে—তারই কাছে যায় রোজ রাত্রে। ঐ মেয়েটার সঙ্গে আজকাল ও রাত কাটায়।

তুই কথাটা যে জানতে পেরেছিস বলিস নি তোর মানুষকে ?

আজ সকালে বলেছি—

কি বললে সে ?

সে বললে—আমাকে ছেড়ে দেবে—রাঙ্গিয়াকে সাদি করবে।

দাঁড়া কাল আমি ডাঃ গুপ্তকে বলবো—

নেহি, নেহি দিদি বলো না।

কেন রে ?

আমি জানি বলে কোন লাভ হবে না।

কে বললে লাভ হবে না।

ও পুরুষগুলো অমনিই। একজনকে নিয়ে ওরা ঘর করতে পারে না। আমিও আসার সময় তাই বলে এসেছি।

কি বলে এসেছিস ?

যদি এখানে তুমি থাকতে দাও তো থাকবো—আর তা না হলে বেরিলিতে বাপুজীর কাছে চলে যাবো—বাপুজী সেখানে কাজ করে।

নারে - তোকে যেতে হবে না। তুই এখানেই থাকবি।

সাচ বলচো দিদি।

হ্যাঁ—

তুমি খুব ভাল দিদি। তোমার দিল খুব আচ্ছা। ভগবান তোমার ভাল করবেন। চা খাবে দিদি—চা করে এনে দেবো ?

যা। করে নিয়ে আয়—

জান দিদি আজ বাজার থেকে মছলি এনেছি—

মছলি !

হ্যাঁ—

ঐ জায়গায় ঐ বস্তুটি কদাচিৎ কখনো পাওয়া যায়, মছলির তেমন চল নেই ওখানে, সকলে মাংসই খায়।

তুই খাস মছলি ?

না দিদি।

কেন রে ? তুই মছলি খাস না ?

না।

তবে তুই কি দিয়ে খাবি ?

রোটি পাকাবো—ডাল আছে ও বেলার, যাই দিদি আমি চা করে নিয়ে আসি। কুন্তী চলে গেল।

॥ ১৫ ॥

ডাঃ কাটজুর কথা ভুলেই গিয়েছিল কঙ্কণা।

দিন পাঁচেক পরে সকালের দিকে ২ নম্বর কেবিনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ৩ নম্বর কেবিন থেকে মাধবীকে দেখে বের হয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

কে—কে বসে আছে কেবিনের মধ্যে চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে।

নীলাদ্রি না।

হ্যাঁ—নীলাদ্রিই ত? কিন্তু কি চেহারা হয়ে গিয়েছে নীলাদ্রির, চেনাই যায় না যেন, ফ্যাকাশে রক্তহীন চেহারা!

নীলাদ্রিদা—

কে! এ কি কঙ্কণা?

হ্যাঁ আমি।

তা তুমি এখানে?

খুব অবাক হয়ে গিয়েছেন আমাকে এখানে দেখে বুঝতে পারছি—আমি এখানে চাকরি করি—

চাকরি করো—এই হাসপাতালে?

হ্যাঁ।

কি চাকরি করো এই হাসপাতালে?

হাসপাতালে ডাক্তার কি করে। মৃদু হেসে কঙ্কণা বললে।

তুমি—তুমি ডাক্তারী পাস করেছো?

করেছি—বিলেতেও গিয়েছিলাম।

সত্যি বলছো কঙ্কণা?

সত্যি।

আমাকে তোমার সব কথা বলো কঙ্কণা। ভারী শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে—

বের করে দিয়েছিলাম। তা তুমি তার কোন খবর রাখ না?

না, that chapter of my life is closed for ever, ইন্দ্রজিৎ আমার কাছে আজ মৃত।

শ্যামলীর নাম শুনেছো তুমি কঙ্কণা?

কেন বল ত?

জিজ্ঞাসা করছি।

শুনেছি—

দেবব্রত সান্ন্যালকে তোমার মনে আছে? আমাদের দু'বছরের সিনিয়ার—আমাদের কলেজের টেনিসের ক্যাপটেন ছিল—ফাইন্যাল পাস করেই বিলেত চলে গিয়েছিল। খুব লম্বা চেহারা রীতিমত হ্যাণ্ডসাম।

না—মনে নেই—তাছাড়া কখনো দেখেছি বলেও মনে পড়ছে না।

সে শ্যামলীকে বিয়ে করেছে—

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ—আমি বিলেত থেকে ফিরে আসি যেবার সেবারই ওদের বিয়ে হলো, সেখানেই মানে ওদের বিয়ে পার্টিতে আমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল ইন্দ্রজিতের—

ইন্দ্রজিৎ সেই পার্টিতে গিয়েছিল?

হ্যাঁ। আর সেই পার্টিতেই—

কি?

হঠাৎ একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল সেই আনন্দ উৎসবের মধ্যে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ—

কি হয়েছিল?

নাই বা শুনলে সে কথা।

তুমি ভাবছো নীলাদ্রিদা আমি মনে দুঃখ পাবো—না। তুমি বলো।

ইন্দ্রজিৎ সঙ্গে করে প্যাণ্টের পকেটের ভেতর পিস্তল নিয়ে এসেছিল —হঠাৎ সে উৎসবের মধ্যে পিস্তল বের করে গুলি চালায়—

সে কি !

হ্যাঁ—দেবব্রতকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ইন্দ্রজিৎ ।

কি সর্বনাশ !

কিন্তু মিস করে সৌভাগ্যবশতঃ। প্রথমটায় অবিশ্যি সকলে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল—বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রথম গুলি মিস করায় দ্বিতীয়বার সে রিভলবার তুলতেই সকলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা কেড়ে নেয়—

সেই উৎসবে কে নিমন্ত্রণ করেছিল ওকে ?

কেউ না ।

নিমন্ত্রণ করে নি ?

না। পরে জানা যায় রবাহূত এসেছিল সে, হঠাৎই সে উৎসবে এসে উপস্থিত হয়েছিল ।

তারপর কি হলো ?

ইন্দ্রজিতকে পুলিসে হ্যাণ্ড ওভার করে দেওয়া হয়—বিচারে তার তিন বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হয়—সে এখনো জেলে—

তুমি তোমার বন্ধুর প্রকৃতি জানতে নিশ্চয়ই—এবং তুমিই আমাকে অনুরোধ করেছিলে ওকে বিয়ে করবার জন্য—

না—তুমি বিশ্বাস করো কঙ্কণা—আমি ওকে সামান্যই জানতাম ।

সামান্য জেনে তুমি—

আমি যে কত বড় ভুল করেছিলাম পরে সেটা বুঝতে পেরেছিলাম ।

বুঝতে পেরেছিলে ?

পেরেছিলাম বৈকি। কিন্তু তখন আর সংশোধনের কোন পথই ছিল না ।

ডাঃ কাটজু ঐ সময় নীলাদ্রির কেবিনে প্রবেশ করলেন—গুড মর্নিং ডাঃ চৌধুরী—

গুড মর্নিং ।

কঙ্কণা কেবিন থেকে বের হয়ে গেল।

তুমি ওকে চেন নাকি ডাঃ চৌধুরী—ডাঃ কাটজু প্রশ্ন করলেন নীলাদ্রিকে।

হ্যাঁ—আমার তিন বছরের জুনিয়ার, এক কলেজেই আমরা পড়তাম।

তাই নাকি।

আচ্ছা ডাঃ কাটজু—ডাঃ রায় কত দিন এখানে আছেন?

তা প্রায় এক বছর হয়ে গেল।

জানেন ডাঃ কাটজু কলেজে ও খুব ভাল ছাত্রী ছিল—অ্যানাটমির প্রসেকটর—ফিজিওলজীর ক্লাস এ্যাসিস্টেন্ট।

তা অবশ্যি জানি না—ও ত কিছু বলে না—নিজের সম্পর্কে ও কখনো কিছু বলে না। তবে এটুকু জানি এফ, আর, সি, এস, এ যে ও খুব ভাল রেজাল্ট করেছিল, আমরা সবাই ওর কাজে খুব সন্তুষ্ট। যাকগে তোমার একস্-রে প্লেটগুলো দাও—একবার আজ ভাল করে দেখি তারপর কাল আমি তোমাকে পরীক্ষা করবো।

নীলাদ্রি একস্-রে প্লেটগুলো বের করে ডাঃ কাটজুর হাতে তুলে দিল।

নিজের অফিস ঘরে ভিউ বক্সে একস্-রে প্লেটগুলো দেখতে দেখতে এক সময়ে ডাঃ কাটজুর মুখটা যেন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

বার বার করে এক একটা প্লেট ভিউ বক্সে লাগিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন ডাঃ কাটজু। ইতিমধ্যে কখন এসে কঙ্কণা তার পশ্চাতে দাঁড়িয়েছে ডাঃ কাটজু জানতেও পারেন নি। সে কাটজুর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে প্লেটগুলো দেখছিলো নিঃশব্দে।

হঠাৎ এক সময়ে ডাঃ কাটজুর নজর পড়ল কঙ্কণার উপরে, ডাঃ রায়—তুমি একবার দেখ তো প্লেটগুলো—

আমি আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ থেকেই দেখছিলাম।

দেখেছো?

হ্যাঁ—

এই প্লেটটার বাঁ দিকের আপার লোবের কাছে যে স্যাডোটা—আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে—

আমারও মনে হচ্ছে স্যার —

কি বলতো ?

কারসিনোমা।

তাহলে তোমারও তাই মনে হচ্ছে—

হ্যাঁ—কিন্তু প্লেটগুলো—আমাদের এখানকার কোন পেশেণ্টের কি ?

না।

তবে কার ?

ডাঃ নীলাদ্রি চৌধুরীর। আমি একটা কথা ভাবছি—

কি ?

একবার ওপেন করে দেখলে কেমন হয়—

বেশ ত স্যার করুন।

কঙ্কণার মনে পড়ে যায় ঐ দিনই নীলাদ্রির কথাগুলো, 'আমার মনে য় কারসিনোমা।'

শোন, তুমি কিন্তু কথাটা বলো না ডাঃ চৌধুরীকে। ডাঃ কাটজু ললেন।

বলবো না—তবে উনি বুঝতে পেরেছেন—

তাই নাকি ?

হ্যাঁ—আমাকে বলছিলেন, আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না স্যার ?

কি বল তো ?

ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ইংল্যাণ্ড পাঠিয়ে দিলে কেমন হয় ?

যদি আমরা যা ভাবছি তাই হয়ে থাকে—সেখানকার ডাক্তাররাই বা কি করবে ? হয়ত ওপেন করে খানিকটা কেটে বাদ দিয়ে দেবে।

কিন্তু আমরাই বা কি করতে পারি।

তা ঠিক। really very sad !

ঐদিন সন্ধ্যার পরে কঙ্কণা নীলাদ্রির কেবিনে এসে ঢুকে দেখলো—নীলাদ্রি শয্যার পরে শুয়ে কি একটা সার্জারীর বই পড়ছে। কতদিন অমনি শুয়ে শুয়ে বই পড়তে দেখেছে কঙ্কণা নীলাদ্রিকে। ও যখন মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে থাকত—ও যেতো ওর কাছে পড়া বুঝতে মধ্যে মধ্যে।

পদশব্দে মুখ তুলে কঙ্কণাকে কেবিনে ঢুকতে দেখে নীলাদ্রি বললে—এসো কঙ্কণা। উঠে বসে নীলাদ্রি হাতের বইটা একপাশে মুড়ে রাখল।

বাইরে ফুটফুটে চাঁদের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। খোলা জানালা পথে চন্দ্রালোকে অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে।

কঙ্কণা একটা টুল টেনে নিয়ে নীলাদ্রির শয্যার পাশে বসলো।

এখানকার ঐ স্তব্ধ নির্জনতা আমার খুব ভাল লাগছে জান কঙ্কণা। নীলাদ্রি বললে।

হ্যাঁ—সত্যিই। ভারী সুন্দর শান্ত পরিবেশ। কঙ্কণা বললে, মনে হয় যেন পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল থেমে গেছে—তারপর একটু থেমে ডাকল, নীলাদ্রিদা।

নীলাদ্রি ওর মুখের দিকে তাকাল। নীলাদ্রির সমস্ত মুখখানার ওপর যেন কেমন একটা ছায়া নেমেছে।

কিছু বলছো।

এক কাজ করো না। তুমি বিলেত চলে যাও না—

কি হবে বিলেতে গিয়ে ?

চিকিৎসা করিয়ে আসবে—ওদেশে কত বড় বড় সার্জন আছে। অপারেশনের কত ভাল ব্যবস্থা।

বিলেত যাবার মত অত টাকা কোথায় আমার।

নেই তোমার।

না। প্রথমতঃ কটা দিনই বা প্র্যাকটিস করতে পারলাম। সবে যখন প্র্যাকটিসটা জমে উঠেছে—

আচ্ছা আমি যদি দিই—

তুমি দেবে ?

হ্যাঁ—

না কঙ্কণা, তা হয় না।

কেন হয় না। কিসের তোমার আপত্তি। আমি পর বলে কি ?

না। না—

তবে ?

তুমি যদি আমার পর হও ত কে আমার আপনার। আমি কি জানি না, তুমি আমার কত আপনার জন।

নীলাদ্রিদা—

সেদিন কত বড় ভুলটা যে করেছিলাম হঠাৎ তোমার কথায় অভিমানের বশে—তুমি এসে বললে, ইন্দ্রজিৎ তোমায় বিয়ে করতে চায়—কি যে হলো আমার—ভাবলাম সেটা বোধহয় তোমারও ইচ্ছা—

একা তোমারই নয় হয়ত ভুল আমাদের দুজনারই হয়েছিল সেদিন নীলাদ্রিদা—

তোমার মনটাকে পরখ করবার জন্যেই সেদিন কথাটা তোমাকে আমি বলেছিলাম—

কিন্তু তুমি যখন বললে, বেশ ত—আমার মনে হলো—

নীলাদ্রি বোধহয় তোমায় চায় না। তাই না ?

হ্যাঁ—

অথচ তুমি হয়ত জানো না সেদিনও যেমন ছিলে তুমি আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে, আজো তেমনি আছো। তাই ত ভাবি, কোথা থেকে কি হয়ে গেল—দুজনে দুজনকে ভুল বুঝে দুজনা দুজনার কাছ থেকে চিরদিনের মত দূরে সরে গেলাম। কত দূরে চলে গেলাম।

কঙ্কণা নীলাদ্রির কথায় কোন জবাব দেয় না। চুপ করে বসে থাকে। নীলাদ্রি এক সময় হাত বাড়িয়ে কঙ্কণার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল।

কঙ্কণার আঙ্গুলগুলো নিয়ে খেলা করতে লাগল।

আচ্ছা দুঃখ হয়েছিল তোমার কঙ্কণা সেদিন আমার কথা শুনে তাই না।

কঙ্কণা চুপ করে থাকে। বাইরের দিকে চেয়ে থাকে খোলা জানালা পথে।

দেখো দু'জনার মাঝখানে ছোট্ট একটা ভুল আমাদের পরস্পরের মধ্যে লৌহ প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে রইলো, নীলাদ্রি বলতে লাগল, কি দুঃসহ সেই প্রাচীর।

কঙ্কণার ইচ্ছা হয় ঐ মুহূর্তে সে বলে, যতই দুঃসহ হোক না কেন সে প্রাচীর আমরা কি আজ ভেঙ্গে ফেলতে পারি না।

কিন্তু কিছুই বলে না সে। সে কি জানে না ঐ প্রাচীর আজ আর কেউ ভেঙ্গে ফেলতে পারবে না। যা একদিন হয়ত খুব সহজ ছিল—আজ সেটাই তাদের দু'জনারই নাগালের বাইরে। সাধ্যের বাইরে।

একটা নাম-না-জানা পাখি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ পথে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল।

হঠাৎ আবার কঙ্কণা বললে, চল না—যাবে ইংল্যাণ্ড।

না কঙ্কণা।

কেন ?

কি হবে আর ছুটোছুটি করে।

কেন ? ও কথা বলছো কেন ?

আমি কি জানি না, আমি কি বুঝতে পারছি না—মিথ্যাই হবে সব ছোটাছুটি।

না, না—তুমি—

আজ বিকেলের দিকে ডাঃ কাটজু এসেছিলেন।

এসেছিলেন ?

হ্যাঁ—আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম প্লেটগুলোর কথা—

কি—কি বললেন তিনি ?

এখনো নাকি দেখছেন, স্টাডি করছেন—আমি কি বুঝতে পারিনি তিনি এড়িয়ে যাচ্ছেন—

এড়িয়ে যাচ্ছেন—

হ্যাঁ—কারণ কলকাতার ডাঃ ললিত ব্যানার্জীও বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন তাই তিনিও স্পষ্ট করে কিছু না বলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন আমাকে।

ডাঃ ব্যানার্জী কি বলেছিলেন ?

বললেন, দেখো নীলাদ্রি আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি—তাছাড়া মেডিকেল সায়েন্স আজকাল অনেক এগিয়ে গিয়েছে—তুমি বরং পারতো ও দেশে চলে যাও।

তাহলে তিনিও বলেছেন—ও দেশে যেতে তোমাকে।

হ্যাঁ বলেছিলেন সে কেবল আমাকে এড়িয়ে যাবার জন্য।

তা হোক। চল না তুমি।

কঙ্কণা !

প্লিজ চলো—তুমি আর অমত করো না।

অত টাকা তুমি—

বললাম ত আমার আছে। মামা মরার আগে বেশ কিছু টাকা আর তার নৈনির বাড়িটা আমাকে দিয়ে গিয়েছেন—বাড়িটাও নাহয় বিক্রী করে দেবো।

বিক্রী করে দেবে ?

হ্যাঁ—

কেন বিক্রী করবে—

তোমার চাইতে ঐ বাড়িটা ত আমার কাছে বেশী নয়। বলতে বলতে কঙ্কণার চোখের কোণ দুটো জলে ভরে ওঠে।

কঙ্কণা—

বল।

জান। সত্যি আমার যেন নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছা করছে।

বাঁচবে—তুমি নিশ্চয়ই বাঁচবে।

বাঁচি আর নাই বাঁচি—এটুকু সান্ত্বনা ত আমার থাকলো—শেষ কটা দিন তোমাকে পেলাম।

কঙ্কণা হঠাৎ কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে নীলাদ্রির কোলে মুখ গোঁজে।

নীলাদ্রি ওর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাতে থাকে।

কেঁদো না কঙ্কণা—হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে—ওঠো, উঠে বোস। লক্ষ্মিটি।

কঙ্কণা তবু মাথা তোলে না। যেমন কাঁদছিল তেমনিই কাঁদতে থাকে উচ্ছ্বসিত হয়ে।

নীলাদ্রি বলতে থাকে, ভাগ্যে হঠাৎ ডাঃ কাটজুর কথা মনে পড়েছিল, এখানে এসেছিলাম বলেই না তোমার সঙ্গে দেখা হলো নচেৎ আর তোমার দেখাই ত পেতাম না। জীবনে হয়ত আর দেখাই হতো না তোমার সঙ্গে। জান কঙ্কণা কত দিন ভেবেছি তোমাকে একটা চিঠি দেবো।

দিলে না কেন? কঙ্কণা মাথা তুলে বললে।

কোথায় দেবো? তোমার ঠিকানা কি জানতাম!

আমিও ভেবেছি দেবো—

দিলে না কেন? নীলাদ্রিও বললে।

তোমারও ঠিকানা ত আমি জানতাম না। কঙ্কণা বললে।

সত্যি—আশ্চর্য। আশ্চর্য—আবার এ ভাবে দু'জনার দেখা হওয়া।

আমি তোমার কোন কথা শুনবো না। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলছি—যত তাড়াতাড়ি পারি—তার পরই—

বেশ—তোমার যখন এত ইচ্ছা—আচ্ছা কঙ্কণা—

বল।

ইন্দ্রজিতের কথাটা ত—

ইন্দ্রজিৎ আমার জীবন থেকে মরে গেছে অনেক দিন।

তোমাদের ডিভোর্স ত হয়নি।

প্রয়োজন আছে কি তার।

আছে বৈকি। আইনতঃ আজো সে তোমার স্বামী—তুমি তার স্ত্রী।

আইনই ত একজনের জীবনে শেষ কথা নয় নীলাদ্রি।

তবু সমাজে থাকতে গেলে সমাজের আইনকে ত অস্বীকার করতে পারবে না কঙ্কণা।

কেন পারব না—ডিভোর্স নাই বা হলো আদালতে গিয়ে—ছয় বছর হয়ে গিয়েছে—সেইটে ত কম সময় নয়।

তা নয় বটে তা হলেও যতক্ষণ না আইনের আশ্রয় নিচ্ছো—

কথাটা যে আমারও মনে হয় নি নীলাদ্রি তা নয়, কিন্তু কেন যেন আমার প্রবৃত্তি হয় নি।

কুন্তী এসে ঢুকলো ঐ সময় কেবিনে।

কিরে কুন্তী ?

দিদি একজন সাহেব এসেছে।

সাহেব !

হ্যাঁ—

কখন ?

এইত ঘণ্টা খানেক আগে -এসে তোমার খোঁজ করছিল—আমি বললাম তুমি এখনো ফেরো নি—সে বললে তাহলে সে অপেক্ষা করবে।

কঙ্কণা মনে মনে রীতিমত বিস্মিতই হয়—কে আবার সাহেব এলো এই রাত্রে তার সঙ্গে এখানে দেখা করতে।

ডাঃ চৌবে নয় ত।

কিন্তু এত রাত্রে তিনি আসবেন কেন ?

আমি চলি নীলাদ্রি—

এসো। দেখো আবার কে এলো।

কঙ্কণা কোন কথা বললো না—কুন্তীকে নিয়ে বের হয়ে গেল।

॥ ১৬ ॥

বাইরের ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল কঙ্কণা।

যদিচ চেহারার ও বেশভূষার পরিবর্তন হয়েছে তথাপি কঙ্কণার চিনতে কষ্ট হয় না একটুও।

এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রুক্ষ।

মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি। গায়ে একটা জীর্ণ পুরাতন ওভার কোট—পরনের প্যান্টটা জীর্ণ—পায়ে কেডস্ জুতো।

বসেছিল মানুষটা একটা চেয়ারের উপরে—হাঁটুর উপরে পাটা তুলে।

কে ?

আমি—

কঙ্কণা নির্বাক, বিস্ময়ে লোকটার দিকে চেয়ে থাকে।

চিনতে পারছো না ? আমি ইন্দ্রজিৎ—

তুমি কেন এসেছো ? কে তোমাকে আমার এখানকার ঠিকানা দিল ?

কুৎসিত ভাবে হাসলো ইন্দ্রজিৎ। বললে, যে খায় চিনি তাকে যোগায় চিন্তামণি।

কঙ্কণা স্তব্ধ।

বড্ড পিপাসা পেয়েছে—ভাগ্যে তোমাদের অ্যাম্বুলেন্সটা পেয়ে গেলাম—ট্যাক্সী বা বাসের পয়সা ছিল না—এক কাপ চা খাওয়াবে কঙ্কণা ?

তুমি কেন এসেছো এখানে ?

বাঃ, ওয়াইফের কাছে হাসব্যাণ্ড কেন আসে ?

আমি তোমার কেউ নই —

কেউ নও ?

না—তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু আইন তা বলবে না।

থামো—আইন—কিসের আইন—

পেনাল কোডের আইন—যাক গে শোন, আমি কটা দিন তোমার এখানে থেকে বিশ্রাম নেবো—তার পরই আবার চলে যাবো—only a few days।

একটা দিনও তোমার এখানে স্থান হবে না। চলে যাও—

Don't be so cruel my dear!

যাও—বেরিয়ে যাও বলছি।

এই শীতের রাত্রে ঠাণ্ডার মধ্যে তুমি আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে?

বের হয়ে যাও!

কোথায় যাবো এই রাত্রে—এখানে তুমি ছাড়া আর আমাকে একটু আশ্রয় দেবার তো কেউ নেই।

আশ্রয়—আশ্রয় চাও তুমি আমার কাছে?

হ্যাঁ—কেবল দুটো দিন। জেল থেকে বেরুবার পর কটা দিন কেবল পথে পথে ঘুরেছি—তারপর হঠাৎ খবরের কাগজে তোমার অপারেশনের কথাটি ছাপা হওয়ায়—তুমি যে এখানে আছো আমি জানতে পারলাম। কি ভাবে যে এখানে এসেছি—

তোমার কোন কথাই আমার শোনবার প্রয়োজন নেই। বের হয়ে যাও তুমি—এখানে এক মুহূর্তও তোমাকে আমি থাকতে দেবো না। ওঠো।

আমি তোমার স্বামী—

না—তোমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আমার শেষ হয়ে গিয়েছে অনেক বছর আগেই।

জানি কঙ্কণা, আমি অন্যায় করেছি—জঘন্য অপরাধ করেছি আমি—তার জন্য ক্ষমা চেয়ে তোমাকে বিব্রত করতে চাই না। বেশী কিছু নয়—কেবল কটা দিন—যদি তুমি এখানে—

একটা মুহূর্তও নয় এখানে আর।

কঙ্কণার স্বর কঠিন। শান্ত।

কঙ্কণা—

আমার যা বলবার আমি তা বলেছি ইন্দ্রজিৎবাবু—

পরিশ্রান্ত—ক্ষুধার্ত একটা মানুষ আমি—বিশ্বাস করো—ট্রেনে পথে—

পথ আছে—গাছতলা আছে—সেখানে যাও।

ইন্দ্রজিৎ কিছুক্ষণ অতঃপর কঙ্কণার মুখের দিকে চেয়ে রইলো, তারপর উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। বিষণ্ণ পর্যদুস্ত একটা মানুষ।

নিঃশব্দে বের হয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে ইন্দ্রজিৎ—কঙ্কণা ডাকলো, দাঁড়াও—একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি—

কঙ্কণা শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো—ড্রয়ার খুলে হাতের কাছে যা পেল কয়েকটা নোট বের করে ঘরের মধ্যে এসে ইন্দ্রজিতের সামনে দাঁড়ালো। বললে, মনে হচ্ছে তোমার কাছে একটা কপর্দকও নেই—নাও এগুলো—

কি ?

টাকা—

না। থাক—আমি যাচ্ছি। বলতে বলতে ইন্দ্রজিৎ যাবার জন্য আবার পা বাড়ালো।

ঠিক আছে শোন—আজকের রাতটা তুমি থাকতে পারো এই ঘরে—কিন্তু কাল ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাবে।

থাকবো ? থাকতে দেবে রাতটা এখানে ?

থাকো।

কঙ্কণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নিজের শোবার ঘরে ঢুকে থপ্ করে চেয়ারটার উপর বসে পড়লো। আশ্চর্য। যা তার কল্পনারও অতীত ছিল শেষ পর্যন্ত সেই ইন্দ্রজিৎ এত দূরে এখানে এসে হাজির হয়েছে। ইন্দ্রজিৎ যখন তার খবর একবার পেয়ে গিয়েছে আর কি সহজে তাকে এখন নিষ্কৃতি দেবে। বুঝতে

পারছে কঙ্কণা—দেবে না। নচেৎ এখানে এসে ঐ মানুষটা হাজির হতো না।

লোকটার চেহারা দেখে আজ তার অনুকম্পার বদলে ঘৃণাই হচ্ছে। সারা গাটা তার যেন ঘিনঘিন করছে।

একটা কথা মনে হচ্ছে কঙ্কণার—এখন যদি ঐ মানুষটা এখান থেকে আর না যায়। না, না—এখানে আর একটা দিনও তার থাকা চলবে না।

কুন্তী এসে ঘরে ঢুকলো, দিদি—

কি? কুন্তীর মুখের দিকে তাকাল কঙ্কণা।

লোকটা কে দিদি?

ও—মানে—এক সময় ঐ লোকটার সঙ্গে আমার জানা-শোনা ছিল।

তোমার কোন আত্মীয়?

না—না—

এখনো বাইরের ঘরে বসে আছে—

কাল সকালেই চলে যাবে—রাতটা এখানে থাকবে।

খাবে ত—

হ্যাঁ—খেতে দিস।

বাইরের ঘরে ক্যাম্প খাটটা পেতে দেবো দিদি?

না—

তবে শোবে কোথায়?

বলেছে ঐ চেয়ারেই বসে থাকবে।

সেকি দিদি—ঐ ঠাণ্ডায়—

তুই যা—তোর কাজ করগে—কঙ্কণা হঠাৎ যেন ঝাঁঝিয়ে ওঠে। স্পষ্ট বিরক্তি গলার স্বরে।

কুন্তী চলে গেল। বেচারী বুঝতে পারে না হঠাৎ দিদি কেন বিরক্ত হলো?

মুখে কিন্তু যাই বলুক কঙ্কণা রাত্রে আহারের পর ঐ বাইরের ঘরেই কুন্তীকে দিয়ে একটা ক্যাম্প খাট পেতে দেয় তারপর একটা চাদর, একটা বালিশ ও কম্বলটা নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

এক পেট খাবার পর ইন্দ্রজিৎ তখন চেয়ারে বসে একটা চার্মিনার ধরিয়ে টানছিল। পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল।

এই চাদর আর কম্বল রইলো—কাল সকালেই উঠে কিন্তু চলে যাবে।

আমার বোধহয় জ্বর আসছে কঙ্কণা? ইন্দ্রজিৎ বললে একটু যেন ইতস্ততঃ করে।

জ্বর? কঙ্কণার ভ্রূ দু'টো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ—শীত শীত করছে কেমন যেন।

জ্বর হোক আর যাই হোক—কাল সকালেই উঠে তোমাকে চলে যেতে হবে।

যাবো। তোমার আজকের দয়া আমি জীবনে কখনো ভুলবো না।

কঙ্কণা ইন্দ্রজিতের কথার কোন জবাব দিল না—তাকালও না তার মুখের দিকে—ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নিজের ঘরে ঢুকে ঘরের দরজায় খিল তুলে দিল। একবার মনে হয় কঙ্কণার সত্যিই যদি লোকটার জ্বর হয়ে থাকে ত—কিছু ওষুধ দিয়ে এলে হতো। আবার জ্বরটর বাধিয়ে বসলে সত্যি সত্যি তাকেই নতুন এক ফ্যাসাদে পড়তে হবে। হঠাৎ অমন করে দয়া না দেখালেও হতো—বলে দিলেই হতো চলে যেতে। চলেও ত যাচ্ছিল কিন্তু কি যে হঠাৎ তার হলো—

জামা কাপড় বদলাল। তারপর কঙ্কণা আলোটা নিভিয়ে শয্যায় গা ঢেলে দেয়। গোটা দুই কম্বল শরীরের উপরে টেনে নেয়—সত্যি শীতও পড়েছে যেন হাড়-কাঁপানো কয় দিন থেকে। পায়ের আঙ্গুল-গুলো শয্যায় শোবার পরও অনেকক্ষণ যেন কনকন করতে থাকে।

ঘুম কিন্তু আসে না কঙ্কণার চোখে।

অন্ধকারে কম্বলের তলায় দু'চোখ মেলে পড়ে থাকে। একটিবারের জন্যেও কঙ্কণা চোখ বুজতে পারল না সে রাত্রে।

একটিমাত্র চিন্তাই তার সমস্ত চেতনাকে যেন আচ্ছন্ন করে থাকে। কেন? কেন এলো ইন্দ্রজিৎ। আবার কেন এলো? জীবনের যে অধ্যায়টা সে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে দিয়েছিল—সে অধ্যায়ের

পাতাগুলো কেন আবার ঐ লোকটা এসে এলোমেলো করে দিল। জেল থেকেই বা মানুষটা কবে ছাড়া পেল ?

ওর কি লজ্জা ঘৃণা বলে কোন বস্তু নেই।

কিন্তু সত্যিই কি কঙ্কণা তার জীবন থেকে একেবারে মানুষটাকে মুছে ফেলতে পেরেছিল ? মধ্যে মধ্যে কি কখনো জীবনের ঐ দুঃস্বপ্নটা তার মনের প্রশান্তিকে বিঘ্নিত করে নি ? বাইরে কনকনে শীতের রাত্রি—কোথায়ও কোন শব্দ নেই—নিঃশব্দতার অতলে যেন তলিয়ে আছে।

সমস্ত রাতটা বিনিদ্র কাটাবার পর ভোরের আলো চারিদিকে স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই কঙ্কণা শয্যা হতে উঠে পড়ল। যদি মানুষটা না যায়—রাত শেষ হবার আগেই ওকে তাড়াতে হবে। এখানে আর ওর এক মুহূর্তও থাকা চলবে না।

গায়ে শালটা জড়িয়ে চপ্পলটা পায়ে গলিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরুল কঙ্কণা। বাইরে এখনো বেশ অন্ধকার।

অন্ধকার ভেদ করে একটা আলোর ইশারা জাগছে সবে। আলোর একটা চাপা দ্যুতি যেন অন্ধকার পর্দা ভেদ করে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

পাশের ঘরের দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে পা দিল কঙ্কণা। ঘরটা অন্ধকার। অন্ধকারেই ক্যাম্প খাটটার দিকে কঙ্কণা তাকাল। প্রথমটা ঠিক নজরে পড়ে না কিন্তু ক্রমে অন্ধকার স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওর চোখে। লোকটা এখনো বেশ আরামে ঘুমাচ্ছে। রাগ হয় কঙ্কণার—সে চাপা কণ্ঠে ডাকে—ইন্দ্রজিৎ বাবু ইন্দ্রজিৎ বাবু—

কিন্তু কোন সাড়া এলো না।

হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচটা টিপল কঙ্কণা—ঘরের বাইরে যাবার পরদাটা ভেজান।

কেউ ত নেই ঘরে। ক্যাম্প খাটটা শূন্য। রাত্রে শোবার আগে কম্বলটা যে ভাবে ক্যাম্প খাটের উপর সে ছুড়ে দিয়ে গিয়েছিল তেমনিই পড়ে আছে। কিন্তু ওটা কি ? একটা ভাঁজ করা কাগজ শয্যার ওপর পড়ে আছে।

এগিয়ে গিয়ে কঙ্কণা ভাঁজ করা কাগজটা হাতে তুলে নিল। ভাঁজ খুলে দেখলো একটা চিঠি। কয়েকটি লাইন পেন্সিলে লেখা চিঠিতে।

কঙ্কণা—

আমি চলেছি। কেন যে এতদূরে এখানে তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম জানি না।

একটা তাগিদ যেন এখানে আমাকে ঠেলে এনেছিল। কিন্তু এসে বুঝলাম ভুল করেছি। আসা উচিত হয়নি।

ক্ষমা চেয়ে নিয়ে গেলাম। আর কখনো তোমাকে বিরক্ত করবো না —তোমার সামনে আসবো না। তোমার টাকাগুলো আমি রেখে যাবো ভেবেছিলাম কিন্তু কপর্দকহীন আজ আমি। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো লোকটা কি লোভী? আজ চাকরিও আমার নেই—টাকা কটা তাই নিয়ে গেলাম—ইন্দ্রজিৎ।

চিঠিটা হাতের মধ্যে ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো কঙ্কণা, তারপর এক সময় চিঠিটা হাতে নিয়েই নিজের শয়নঘরে এসে আবার ঢুকলো।

ঘরের আলো জ্বেলে চিঠিটা আবার পড়লো। যাক, ভালই হয়েছে—শেষ পর্যন্ত যে লোকটার সুবুদ্ধি হয়েছে—সত্যি সত্যি চলে গেছে।

কুন্তী ঐ রাত্রে কিচেনের মধ্যে শুয়ে ছিল। তার ঘুম ভাঙ্গার পর স্টোভ জ্বালিয়ে চা তৈরি করে যখন সে কঙ্কণার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল —বাইরে তখন আলো বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কঙ্কণার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে—কঙ্কণা প্রস্তরমূর্তির মত শয্যার উপর বসে।

দিদি—

য়্যাঁ—কুন্তী—

চা—

কঙ্কণা হাত বাড়িয়ে কাপটা নিল।

ঐ সাহেবকে চা দিয়ে আসবো? কুন্তী বললে।

না—সাহেব চলে গেছে—

চলে গেছে। কখন চলে গেল ?

এই ত কিছুক্ষণ আগে—

কুন্তী আর কোন কথা বললো না—ঘর ছেড়ে চলে গেল।

এত সহজে যে ইন্দ্রজিৎ এখান থেকে চলে যাবে ভাবতে পারে নি কঙ্কণা। ওর মনে হয়েছিল সহজে এখান থেকে যাবে না ইন্দ্রজিৎ।

যাক্—চলে গেছে সে বেঁচেছে।

ঐ দিন স্নান করে সাজগোজ করে বেরুতে বেরুতে কঙ্কণার বেশ খানিকটা বেলাই হয়ে গেল। একটু দ্রুতই পা চালিয়ে চলে কঙ্কণা ওয়ার্ডের দিকে।

গত পরশু ও আর আনন্দ কল্যাণশ্রীর অপারেশন করেছে। এখনো সুস্থ হয়ে ওঠেনি। কল্যাণশ্রীর কেবিনের দিকেই যাচ্ছিল কঙ্কণা, গতকাল সন্ধ্যায় তার খবর একবারও নেওয়া হয় নি।

পথে ডাঃ আনন্দকিশোরের সঙ্গে দেখা।

ডাঃ আনন্দকিশোরও ওয়ার্ডের দিকে চলেছিল।

গুড মর্নিং ডাঃ রায়—

গুড মর্নিং।

আপনার ৩নং কেবিনের পেশেণ্ট কেমন আছে ?

ভাল।

ডাঃ রায়, কাল আমি কাটমাণ্ডুর দিকে গিয়েছিলাম—একটা লোক, shabby looking আপনার খোঁজ করছিল—অ্যামবুলেন্স গাড়ি থামিয়ে আমার কাছে, আমি তাকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। আপনার কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়েছি—কে লোকটা ?

কঙ্কণা এতক্ষণে বুঝতে পারে ডাঃ আনন্দকিশোরই ইন্দ্রজিৎকে এখানে নিয়ে এসেছে।

লোকটা বলছিল। আপনার খোঁজেই নাকি সে এসেছে। দেখা হয়েছে লোকটার সঙ্গে ?

হ্যাঁ—চলি আনন্দ—

কঙ্কণা আর দাঁড়ালো না ওয়ার্ডের দিকে চলে গেল।

॥ ১৭ ॥

কঙ্কণা কল্যাণশ্রীর কেবিনে গিয়ে ঢুকল।

কঙ্কণাকে দেখে কল্যাণের দু' চোখের দৃষ্টি হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে.

দিদি।

কেমন আছো কল্যাণ?

ভাল। কবে আমি উঠে হেঁটে চলে বেড়াবো দিদি?

দিন দশেক পরেই।

আবার আগের মত ঘুরে বেড়াতে পারবো?

নিশ্চয়ই পারবে।

দিদিভাই আজ আসবে, তাই না?

তাই ত চিঠিতে লিখেছিলেন।

কলকাতায় ফিরে যাবো কবে?

আরো মাসখানেক পরে।

জান দিদি, তোমার জন্য আমার মন খুব খারাপ লাগবে।

দিদিকে হয়ত তোমার কলকাতায় গিয়ে মনেই পড়বে না।

না, না—তোমাকে আমি কখনো ভুলবো না। তুমি কিন্তু কলকাতায় গেলে আমাদের বাড়িতে যাবে।

আমি তো এখানে থাকবো না। কঙ্কণা বললে।

থাকবে না?

না—আমি বোধহয় সামনের মাসেই বিলেত যাচ্ছি—কবে ফিরবো ঠিক নেই—

তুমি বিলেত যাচ্ছো?

হ্যাঁ—

কেন দিদি?

কাজ আছে—

কঙ্কণা আর দাঁড়ালো না। কেবিন থেকে বের হয়ে গেল।

নীলাদ্রির কেবিনে ঢুকে দেখে—নীলাদ্রি শয্যায় বসে একটা বই পড়ছে।

কঙ্কণাকে কেবিনে ঢুকতে দেখে হাতের বইটা মুড়ে একপাশে রেখে ওর দিকে তাকালো। মৃদু হেসে বললো—এসো—

কাল রাত্রে তোমার এখান থেকে কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে দেখি—ইন্দ্রজিৎ—

ইন্দ্রজিৎ!

হ্যাঁ—আমার বসবার ঘরে একটা চেয়ারে বসে আছে।

জেল থেকে তাহলে ছাড়া পেয়েছে। নীলাদ্রি বললে।

হ্যাঁ—কিন্তু আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

তাড়িয়ে দিয়েছো? কথাটা বলে নীলাদ্রি কঙ্কণার মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ। তাড়িয়ে দিয়েছি।

সে তোমার অ্যাড্রেস পেল কি করে?

ইন্দ্রজিৎ কেমন করে তার ঠিকানা পেয়েছিল এবং ডাঃ আনন্দকিশোরের সঙ্গে এখানে কেমন করে এসেছিল বললে।

নীলাদ্রি কোন জবাব দেয় না। নিঃশব্দে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নীলাদ্রি।

য়্যাঁ—কিছু বলছিলে?

কি ভাবছো?

কিছু না তো।

ইন্দ্রজিৎকে আমি জানিয়ে দিয়েছি—তার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই।

না কঙ্কণা। এত সহজে ব্যাপারটার মীমাংসা হতে পারে না।

নীলাদ্রি।

ইন্দ্রজিৎকে আমি জানি—সে যখন একবার তোমার সন্ধান পেয়েছে—

সে এত সহজে তার দাবিটা ছেড়ে দেবে তোমার উপরে বলে আমার মনে হয় না।

কঙ্কণার মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। সে বললে, জোর করে সে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু জোর খাটালেই যে আমি আবার তার কাছে ফিরে যাবো—তা যদি সে ভেবে থাকে তো জেনো—সে ভুলই করবে।

কঙ্কণা ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর ইন্দ্রজিৎ স্তব্ধ হয়ে চেয়ারটার উপর অনেকক্ষণ বসে রইলো।

ইন্দ্রজিতের বুঝতে কষ্ট হয় না—কঙ্কণার হৃদয়ে আজ তার জন্য এতটুকুও স্থান নেই। কিন্তু সেই বা আজ এখন যাবে কোথায়। শ্যামলীকে ইন্দ্রজিৎ হত্যা করতে গিয়েছিল—কিন্তু পারল না—ধরা পড়ে গেল। তারপর হলো আদালতে বিচার।

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কিন্তু ইন্দ্রজিৎ একটা কথাও বলে নি সরকার পক্ষের কৌঁসুলীর প্রশ্নের জবাবে। সে আগাগোড়াই চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

জজ সাহেব যখন জিজ্ঞাসা করলেন, শ্যামলী দেবীকে কেন আপনি হত্যা করতে গিয়েছিলেন।

তখন সে শুধু একটি কথাই বলেছিল—সৌভাগ্য তার, আর দুর্ভাগ্য আমার যে ওর মত একটা স্বৈরিণীকে আমি হত্যা করতে পারলাম না।

আপনি তাহলে স্বীকার করছেন যে শ্যামলী দেবীকে আপনি হত্যা করবার জন্যই সে রাত্রে ওদের ম্যারেজ পার্টিতে গুলীভরা পিস্তল সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ—

বিচারে ইন্দ্রজিতের কয়েক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হলো—চাকরিও গেল।

আজ সে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত। তার সব পরিচয়—সব কিছু শেষ হয়ে গিয়েছে।

জেল বাসের দীর্ঘ দিনগুলো ইন্দ্রজিতের একজনার কথাই মনে পড়েছে —অনেকবার। সে কঙ্কণা।

জেলের ফটকের বাইরে পা দিয়ে ইন্দ্রজিৎ অনেক দিন পরে যেন খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে খোলা বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল।

এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। একমুখ দাড়ি—আজ আর পরিচিত কারো ইন্দ্রজিতকে চিনবারও ক্ষমতা নেই।

হাঁটতে লাগল ইন্দ্রজিৎ। অগণিত মানুষের স্রোত—পুরুষ, রমণী, নানাবয়েসী মানুষ। যে যার নিজের কাজে চলেছে। ইন্দ্রজিতের মনে হলো সেও ত একদিন এদেরই একজন ছিল কিন্তু আজ যেন ওদের থেকে সে অনেক দূরে চলে গেছে।

সে আজ ওদের কেউ নয়। চিহ্নিত জেলখাটা এক কয়েদী। হাঁটতে হাঁটতে অনির্দিষ্টভাবে কখন যে এক সময় সে তাদের পূর্বেকার সি-আই-টি ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনে এসে হাজির হয়েছে জানতেও পারে নি।

মুখ তুলে তিনতলার ফ্ল্যাটটার দিকে তাকাল। ঐ ফ্ল্যাটেই একদিন সে কঙ্কণাকে নিয়ে এসে ঘর বেঁধেছিল।

সত্যিই কি সে কঙ্কণাকে ভালবেসেছিল—না সবটাই ছিল তার নেশা? কঙ্কণা ত দেখতেও এমন কিছু একটা সুন্দরী ছিল না। তবে কেন সেদিন সে কঙ্কণাকে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। সতীনাথ তার কলেজের সহপাঠী—তারই বাড়িতে একদিন তার বন্ধু নীলাদ্রি কঙ্কণার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। নীলাদ্রি আর কঙ্কণাকে পাশাপাশি দেখে সেদিন ইন্দ্রজিতের বুঝতে কষ্ট হয়নি কঙ্কণা নীলাদ্রিকে ভালবাসে—নীলাদ্রিও কঙ্কণাকে ভালোবাসে। আর যে মুহূর্তে ইন্দ্রজিৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারে একটা হিংসা তার মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল।

সেই হিংসা থেকেই আকর্ষণ। কঙ্কণাকে তার চাই—নীলাদ্রির হবে না কঙ্কণা, তারই হবে—একান্তভাবে তারই। কঙ্কণাকে মনের কথাটা জানাতে সে খোলাখুলি ভাবে না বললেও অস্বীকারই জানাল। সতীনাথের পরামর্শে সে তখন নীলাদ্রির দ্বারস্থ হয় এবং তখুনি সে

বুঝতে পারে নিঃসংশয়ে নীলাদ্রি কঙ্কণাকে ভালবাসে। মনে মনে তখন আরো দৃঢ়সংকল্প করে ইন্দ্রজিৎ কঙ্কণাকে তার পেতেই হবে।

ঘর বাঁধলো কঙ্কণাকে বিবাহ করে ইন্দ্রজিৎ। সেই সময় সে বুঝতে পেরেছে কঙ্কণা তাকে বিবাহ করেছে কেবলমাত্র নীলাদ্রিরই অনুরোধে। কঙ্কণার মন অন্যত্র বাঁধা। কঙ্কণার দেহটাই সে বিবাহের মন্ত্রবলে অধিকার করেছে মাত্র। মনটা কঙ্কণার সে পায় নি। তবু হয়ত সে কঙ্কণাকে নিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তা হলো না—বিবাহের সাত মাস পরে শ্যামলী ফিরে এলো তার জীবনে, যে শ্যামলীর সঙ্গে একদিন তার ট্রেনিংয়ের সময় কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

ইন্দ্রজিতের মন সম্পূর্ণভাবে শ্যামলীর দিকে ঝুঁকে পড়লো।

কঙ্কণা একটু একটু করে তার জীবন থেকে সরে গেল—অনেক দূরে চলে গেল কঙ্কণা। তাতে ইন্দ্রজিতের কোন দুঃখ ছিল না, কারণ শ্যামলী তখন তার পাশে।

শিলং থেকে ফিরে এসে ইন্দ্রজিৎ কঙ্কণার সংবাদ পেল—সে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু নীলাদ্রিই তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে শেষ পর্যন্ত এবং হাসপাতাল থেকে সে নিরুদ্দিষ্টা।

যাক গে। যেখানে খুশী সে তার যাক। কঙ্কণার আর খোঁজও করল না ইন্দ্রজিৎ। তারই কিছুদিন পরে অকস্মাৎ ডাঃ দেবব্রত সান্ন্যাল এলো শ্যামলীর জীবনে—দুজনার দেখা-সাক্ষাৎ হয় ঘন ঘন—দেবব্রতের কোয়ার্টারে যায় শ্যামলী। কথাটা কানে যেতেই একদিন ইন্দ্রজিৎ শ্যামলীর ওখানে গেল।

শ্যামলী একটা কথা বলতে এলাম।

শ্যামলী বললে, কি?

কঙ্কণা নিজেই আমার জীবন থেকে সরে গেছে তুমি ত জান।

শ্যামলী বললে, কঙ্কণার আর কোন খোঁজ পাও নি?

না। আর খোঁজ নেবার কোন দরকারও নেই আমার।

ভুলো না সে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী।

তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আমার শেষ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আবার যখন সে ফিরে আসবে ?

আসবে না। আর আসলেও তাকে ফিরে যেতে হবে। তাই বলছিলাম।

কি ?

চল আমরা রেজেস্ট্রী করে বিয়ে করি।

ছিঃ—

ছিঃ কেন ?

তাই—

কিন্তু তোমাকে কি অনেকদিন বলি নি, কঙ্কণাকে ডিভোর্স করে আমি তোমাকে বিয়ে করবো ?

না—তা হতে পারে না। শান্ত গলায় বললে শ্যামলী।

তবে যা শুনছি তা সত্যি ?

কি শুনছো ?

ডাঃ দেবব্রত সান্ন্যালের সঙ্গে তোমার —

ঠিকই শুনেছো।

তাহলে ডাঃ দেবব্রত সান্ন্যালকেই তুমি বিয়ে করছো ?

হ্যাঁ—

তাহলে আমাকে নিয়ে এতদিন খেলা করলে কেন ?

দেখ ইন্দ্রজিৎ, তোমার সঙ্গে আমি মিশেছি সত্যি, কিন্তু এমন কথা কখনো তোমাকে বলি নি যে তোমাকে আমি বিয়ে করবো।

বল নি ?

না।

কিন্তু অনেক রাত কাটিয়েছো তুমি আমার সঙ্গে। ডাঃ সান্ন্যাল সে সব কথা জানেন ত ?

তুমি বোধ হয় ভাবছো ইন্দ্রজিৎ, ঐসব কথা তুমি গিয়ে দেবব্রতকে বলবে ?

যদি বলি—

বলতে পারো—

তখনো ডাঃ দেবব্রত তোমাকে বিয়ে করবে ?

সে প্রশ্নটার জবাব তার কাছ থেকেই না হয় যাও শুনে নাও গে।

তাই যাবো।

হ্যাঁ—যাও—কথাটা বলে শ্যামলী বাইরের ঘর থেকে তার শোবার ঘরে চলে গিয়েছিল। প্রচণ্ড একটা হতাশা আর আক্রোশ নিয়ে ফিরে এসেছিল সেদিন ইন্দ্রজিৎ শ্যামলীর গৃহ হতে।

ইচ্ছে হয়েছিল দু'জনকেই সে খুন করে।

সেই ইচ্ছাটাই একটা ধোঁয়ার মত এসে তার মনের মধ্যে জমাট বেঁধে উঠেছিল। খুন—খুন করবে সে শ্যামলীকে।

কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল। হঠাৎ খেয়াল হলো ইন্দ্রজিতের সি-আই-টি ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনের রাস্তায় সে উপরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ইন্দ্রজিৎ সরে এলো বাড়িটার সামনে থেকে।

কিন্তু কঙ্কণাকে ইন্দ্রজিৎ ভুলতে পারে না! আজ কেবলই কঙ্কণার কথা তার মনে পড়ছে। কঙ্কণার খোঁজে সে সর্বত্র ঘুড়ে বেড়াতে লাগল।

হঠাৎই কঙ্কণার সন্ধান ইন্দ্রজিৎ পেয়ে গেল সংবাদপত্রের পাতায়।

এবং আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ইন্দ্রজিৎ তার শেষ সম্বল খরচা করে ট্রেনে চেপে বসল। কঙ্কণার কাছে তাকে যেমন করে হোক পৌঁছতেই হবে।

কঙ্কণা যে তাকে কোনদিনই আর ক্ষমা করতে পারে না—তা কি ইন্দ্রজিতের মনে হয় নি? মনে হয়েছে বৈ কি। তবু—সে ছুটে এসেছিল কঙ্কণার কাছে বুকের মধ্যে ক্ষীণ একটা আশা পোষণ করে।

মনে হয়েছিল তার, কঙ্কণা হাজার হলেও তার স্ত্রী—সে তার স্বামী। সে না হয় পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে।

কিন্তু বুঝতে পারে নি ইন্দ্রজিৎ—কঙ্কণা তার দিক থেকে সম্পূর্ণ-

ভাবেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কঙ্কণা তার জীবন থেকে ইন্দ্রজিৎকে চিরদিনের মতই মুছে ফেলেছে।

কঙ্কণার কাছে আজ সে মৃত।

কঙ্কণা তার শেষ কথাগুলো বলে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ ইন্দ্রজিৎ চেয়ারটার উপরে পাথরের মত বসে রইলো।

কঙ্কণা তার শেষ কথা জানিয়ে দিয়ে গেল। এবারে সে কি করবে, এর পরও কি সে রাত্রি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

না—আর কোন লাভ নেই। হাজার রাত্রি অপেক্ষা করলেও কঙ্কণার মন আর তার দিকে ফিরবে না। তার চাইতে চলে যাওয়াই ভাল।

পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে তার একটা পাতা ছিঁড়ে একটা পেন্সিল দিয়ে একটা চিঠি লিখলো। সামনের টেবিলের 'পরে সেটা ভাঁজ করে রেখে—টেবিলের উপর থেকে নোটগুলো তুলে জামার পকেটে ভরে দরজাটা খুললো।

হিংস্র জন্তুর ধারালো দাঁতের মত যেন বাইরের হিমকণাবাহী বাতাস তার সর্বাঙ্গে—চোখে মুখে এসে বিঁধিল।

অন্ধকার। ঠাণ্ডা অন্ধকার যেন বাইরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রজিতের সর্বাঙ্গে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো—তাকে গ্রাস করলো চার পাশ থেকে। কয়েকটা মুহূর্ত সেই অন্ধকারে—প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে ইন্দ্রজিৎ হাত বাড়িয়ে দরজার পাল্লা দুটো টেনে দরজাটি বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিল।

হাঁটতে সুরু করল ইন্দ্রজিৎ সামনের দিকে।

অ্যামবুলেন্সে ডাঃ আনন্দর সঙ্গে আসতে আসতেই লক্ষ্য করেছিল ইন্দ্রজিৎ—ঐ দীর্ঘপথে সামান্য কোথাও কোথাও দু চারজন স্থানীয় মানুষজন এবং কদাচিৎ একটি গাড়ি ছাড়া একটি যানবাহনও চোখে পড়ে নি। কাজেই যানবাহন পাওয়া অসম্ভব, বিশেষ করে এই রাত্রিশেষে।

ইন্দ্রজিৎ হেঁটেই চললো।

পাহাড়ী উঁচু নীচু পথ—ইন্দ্রজিতের হাঁটতে হাঁটতে পা দুটো ব্যথা করে। সামনের দিকেই সে হেঁটে চলে। হাঁটছে তো হাঁটছেই।

কিন্তু ভুল করে কাঠগুদামের দিকে না গিয়ে ইন্দ্রজিৎ উলটো পথে ভীমতালের দিকে হাঁটতে লাগল। পথ কখনো উপরে উঠে গিয়েছে কখনো ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে মুখে যেন সূচের মত বিঁধছে।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে। তরল অন্ধকারে মাথার উপরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তারাগুলো দেখা যায়।

কঙ্কণা—কঙ্কণা তাকে তাড়িয়ে দিল।

শ্যামলীও তাকে তাড়িয়ে দিল।

পথটা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে চলেছে ঘুরে ঘুরে। কোথায় এ পথ গিয়েছে কে জানে। লোকালয় কতদূর কে জানে।

ভোরের আলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ—সামনে শুধু জল আর জল—বিরাট এক তলাও।

॥ ১৮ ॥

বিলেত যাত্রার জন্য কঙ্কণা প্রস্তুত হতে থাকে।

একবার লক্ষ্ণৌ যাওয়া দরকার দু'জনার পাসপোর্ট ভিসা প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

কঙ্কণা দুপুরের দিকে কথাটা বললে নীলাদ্রিকে।

লক্ষ্ণৌ যাবে?

হ্যাঁ—পাসপোর্ট ভিসা ঠিক করতে হবে।

নীলাদ্রি কোন কথা বলে না।

ইন্দ্রজিতের কথাটা শোনার পর থেকে কেমন যেন হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে গিয়েছে।

কি ভাবছো? কঙ্কণা নীলাদ্রির দিকে প্রশ্ন করে।

কিছু না তো।

তবে অমন চুপচাপ আছো কেন?

এমনি।

না—নিশ্চয়ই তুমি ভাবছো ইন্দ্রজিতের কথা।

নীলাদ্রি বললে, সত্যিই তাই কঙ্কণা—তুমিও কি ভাবছো না?

না।

ভাবছো তুমি, আমি জানি।

না। সত্যিই আমি তার কথা ভাবছি না।

কিন্তু আমি ভাবছি কঙ্কণা। কেবলই কি মনে পড়ছে জান।

কি?

ইন্দ্রজিৎ আমার বন্ধু। এক কলেজে চার বছর পড়েছি। বি-এস-সি পাস করে আমি ভরতি হলাম বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজে আর ইন্দ্রজিৎ এম. এ. পড়তে লাগল। এম. এ. পড়তে পড়তেই সে কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিল। প্রথমবার অকৃতকার্য হলেও দ্বিতীয় বার পাস করে চাকরি পেল—ট্রেনিংয়ে গেল দিল্লী। তারপর একটু থেমে বললে,

কি আশ্চর্য দেখ—দু'জনা দুদিকে ছিটকে পড়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আবার সে কলকাতায় পোস্টেড হয়ে এলো তিন বছর পরে - দেখা হলো আবার—আর তখুনি তুমি এসে দাঁড়ালে আমাদের দু'জনার মধ্যখানে।

তোমাকে বিয়ের কথাটা যখন একদিন ও এসে আমাকে বললো—

সে সব তো কবে চুকে বুকে গিয়েছে—

হয়তো চুকে বুকে গিয়েছে। তবু—তবু যেন মনে হচ্ছে—আমি তোমাকে যেন তার নাগালের বাইরে ছিনিয়ে নিতে চলেছি—

ওসব কথা ভুলে যাও নীলাদ্রি।

ভুলতে চাইলেই কি সব ভোলা যায় কঙ্কণা—

আমি তো বেশ ভুলতে পেরেছি—কেন তুমি পারছো না।

না। কঙ্কণা তুমি তো ভুলতে পারনি—আমিও ভুলতে পারছি না। কঙ্কণা।

বল।

এক কাজ করি—

কি।

আমি চলে যাই—

চলে যাবে।

হ্যাঁ—কারণ আমি বুঝতে পারছি—ইন্দ্রজিৎ আজো তোমায় ভুলতে পারছে না।

কঙ্কণা নীলাদ্রির কথায় কোন জবাব দেয় না, চুপ করে বসে থাকে।

নীলাদ্রি বলতে থাকে। আর ভুলতে পারেনি বলেই অনুসন্ধান করে এত কষ্ট করে এতদূরে সে তোমার কাছে ছুটে এসেছিল।

ভুল করেছে সে এসে—

ভেবে দেখো—আজ তার এই চরম বিপর্যয়ের দিনে তুমি ছাড়া তার আর কেউ নেই। আজ সত্যিই তার পাশে একজনের প্রয়োজন।

এই পৃথিবীতে লোকের তো অভাব নেই।

তা নেই তবু—তবু স্ত্রীর মতো তো কেউ নেই।

আমি তার স্ত্রী নই।

ইন্দ্রজিৎকে সত্যিই কি তুমি আজও ক্ষমা করতে পার না ?

না।

কঙ্কণা, সে আজ বড় দুঃখী—

তার প্রয়োজন আমার কাছে অনেক দিনই ফুরিয়ে গিয়েছে নীলাদ্রি।

সব প্রয়োজনের শেষেও প্রয়োজন থাকে কঙ্কণা। না। আমাকে তুমি আর বাধা দিও না কঙ্কণা—আমাকে চলে যেতে দাও অন্ততঃ তার ফিরে আসবার পথটা আমাকে দিয়ে বন্ধ করে দিও না।

তুমি আজ চলে গেলেও জেনো নীলাদ্রি—আমার দিক থেকে যে দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে তার সে দরজা আর খুলবে না।

কঙ্কণা—

হ্যাঁ—নীলাদ্রি—বিষের পাত্র যেদিন যে মুহূর্তে আমি আমার মুখের সামনে তুলে ধরেছিলাম—সেই মুহূর্তেই তার সঙ্গে আমার সব শেষ হয়ে গিয়েছে। তুমি মিথ্যে আর ঐ নিয়ে মাথা ঘামিও না—শোন আমি কালই লক্ষ্ণৌ যাবো।

তোমার পাসপোর্টটা তোমার সঙ্গে আছে।

আছে—সুটকেশে—

দাও সেটা আমায়।

পরের দিন চলন্ত ট্রেনের কামরায় বসে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল কঙ্কণা।

মুখে সে যাই বলুক—সত্যিই কেন জানি তার মনের মধ্যে ইন্দ্রজিতই আনাগোনা করছিল। যে ইন্দ্রজিৎকে সে অনেক বছর আগেই মন থেকে মুছে ফেলেছিল—আজ আবার সেই ইন্দ্রজিৎই তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কঙ্কণা মন থেকে ইন্দ্রজিতের চিন্তাটা সরাতে চায় কিন্তু পারে না।

ডাঃ কাটজু, লক্ষ্ণৌর একজন বড় সরকারী অফিসারকে একটা পার্সোন্যাল চিঠি দিয়েছিলেন—সেই অফিসার মিঃ চৌধুরীই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। তাহলেও দুটো দিন লেগে গেল।

হাসপাতালে ফিরে আসতেই ডাঃ কাটজুর সঙ্গে তার অফিসে দেখা হলো।

এসো ডাঃ রায়—একটা বড় স্যাড ব্যাপার ঘটে গেছে। ডাঃ কাটজু বললেন।

কঙ্কণা চমকে ওঠে—নীলাদ্রির কিছু হয়নি তো। জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল হয়ে। কি হয়েছে ডাঃ কাটজু—

তোমার সেই আত্মীয়টি—

আত্মীয়। কার কথা বলছেন।

কলকাতা থেকে যে এসেছিল লক্ষ্ণৌ যাবার আগে এখানে তোমার সঙ্গে এসে দেখা করেছিল।

কি হয়েছে তার—

হি ইজ ডেড্—

ডেড্—

হ্যাঁ—মনে হয় বোধহয় সাঁতার জানত না—ভীমতালের তলাওয়ে পড়ে—জানো ডুবে মারা গেছে। অবিশ্যি ব্যাপারটা আমরা জানতেও পারতাম না—আন-আইডেন্টিফাইড হয়ে হয় ত ওখানেই পড়ে থাকতো কিন্তু ভাগ্যে ঐদিন সকালের দিকে আনন্দকিশোর ঐদিকে গিয়েছিল—স্থানীয় অধিবাসীরা যখন ডেড বডিটা নিয়ে জটলা করছে আনন্দকিশোর এগিয়ে গিয়ে ডেড বডিটা দেখে চিনতে পারে। সে এসে আমাকে সব বলায় আমরা ডেড বডিটা পুলিসকে বলে মর্গে রাখার ব্যবস্থা করেছি।

কঙ্কণা নিঃশব্দে ডাঃ কাটজুর সব কথা শুনে গেল তারপর ধীরে ধীরে বললে, আপনারা একটু ভুল করেছেন ডাঃ কাটজু।

ভুল করেছি।

হ্যাঁ। লোকটা আমার কেউ নয়—

কেউ নয়!

না।

কিন্তু ডাঃ চৌধুরী যে আনন্দের মুখে সব শুনে বলেছেন—

কি বলেছেন—

তোমার আত্মীয় ছিল সে।

না।

ওঃ, তাহলে আমাদেরই ভুল হয়েছে—পুলিসকে তাহলে জানিয়ে দিই—ডেড বডিটা ডিসপোজ আপ করবার জন্য—

তাই জানিয়ে দিন।

কঙ্কণা ডাঃ কাটজুর অফিস থেকে বের হয়ে সোজা এলো নিজের কোয়ার্টারে—কোয়ার্টারে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়াল।

নীলাদ্রি একটা চেয়ারে বসে।

নীলাদ্রি।

এসো কঙ্কণা। তুমি ফিরেছো জানতে পেরে—এখানে এসে তোমারই অপেক্ষা করছিলাম।

আমি বড্ড শ্রান্ত নীলাদ্রি—

ইন্দ্রজিৎ জলে ডুবে মারা গেছে শুনেছো—ও সাঁতার জানতো না—

শুনেছি—

শুনেছো!

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে কঙ্কণা হ্যাঁ—হ্যাঁ শুনেছি—শুনেছি—কতবার বলতে হবে যে শুনেছি। কিন্তু আমি কি তার করবো বলতে পারো?

কঙ্কণা—তার মৃতদেহটার সৎকার—

পারবো না। ওসব আমার দ্বারা হবে না। কেন—কেন তোমরা কেবলই ইন্দ্রজিতের কথা আমাকে সকলে মিলে তখন থেকে বলছো। সে মরেছে তাতে আমার কি করবার থাকতে পারে।

কঙ্কণা। জীবিত অবস্থায় যাই থাক তোমাদের মধ্যে—সে আজ মরে গেছে—সব কিছুর বাইরে সে আজ—আজ তার মৃতদেহটা মর্গে পড়ে আছে—আমরা না সৎকার করলে কে আর সৎকার করবে।

তার আমি কি জানি—যার খুশি করে করুক ডোমের তো অভাব নেই—

ছিঃ কঙ্কণা, আমরা আমাদের শেষ কাজটুকু—বন্ধু হিসাবে—স্ত্রী হিসাবে—যদি আজ না করি—

না, না, না—চিৎকার করে ওঠে কঙ্কণা। প্লীজ প্লীজ—ওর কথা তুমি আর আমাকে বলো না—

কঙ্কণা—আজ সে মৃত—মৃতের প্রতি কেন আমরা অসম্মান দেখাবো। আর কেনই বা তার প্রতি আমাদের আক্রোশ থাকবে, চল—

না।

কঙ্কণা—লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোন। চল—

যা খুশী তুমি তোমার কর। আমাকে—আমাকে মুক্তি দাও।

ছিঃ অমন করে না—চল আমার সঙ্গে—

যেতেই হবে ?

হ্যাঁ। চল।

মর্গ থেকে বডি বের করতে বেলা আড়াইটা হয়ে গেল এবং নদীর ধারে শ্মশানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা গড়িয়ে আসে। কঙ্কণা কিন্তু কিছুতেই মুখাগ্নি করলো না—করলো নীলাদ্রিই।

চিতা যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো—সূর্যের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। কঙ্কণা একটা পাথরের উপরে বসে রইলো।

অনেক রাত্রে দু'জনে ফিরে এলো হাসপাতালে। হাসপাতাল অ্যামবুলেন্স থেকে নেমে নীলাদ্রি চলে গেল তার কেবিনে—আর কঙ্কণা ফিরে এলো তার কোয়ার্টারে।

কোয়ার্টারে ফিরে কঙ্কণা সেই যে তার শোবার ঘরে ঢুকে জামা কাপড় না বদলিয়েই শয্যার উপর গিয়ে শুয়ে পড়লো—রাত দশটার সময় কুন্তী তাকে ডাকতে এসে দেখে সে ঘুমাচ্ছে।

সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল কঙ্কণা।

পরের দিন সকালে নীলাদ্রি যখন কঙ্কণার কোয়ার্টারে এলো তখনো সে ঘুমাচ্ছে।

মাইজি জাগে নি ?

নেহি তো। সেই যে কাল রাত্রে ফিরে এসে শুয়েছেন এখনও ঘুমোচ্ছেন।

কাল কিছু খায়নি ?

না।

ও !

তুলে দেবো বাবুজী ?

না থাক। নীলাদ্রি বললে।

নীলাদ্রি ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে কঙ্কণার শিয়রের পাশে বসল।

কঙ্কণা ঘুমাচ্ছে।

অনেক বেলায় কঙ্কণা চোখ মেলে তাকাল।

চোখ মেলতেই নীলাদ্রিকে দেখে শুধালো—তুমি ?

হ্যাঁ—

কখন এসেছো ?

তা প্রায় ঘণ্টা চারেক হবে—

আমাকে ডাকনি কেন ?

তুমি ঘুমাচ্ছিলে তাই—

তাই ডাকোনি।

নীলাদ্রি মৃদু হাসলো।

কঙ্কণা যেমন শুয়ে ছিল—তেমনিই শুয়ে থাকে।

নীলাদ্রি হাত বাড়িয়ে কঙ্কণার মাথার পরে একখানি হাত রাখল পরম স্নেহভরে।

কঙ্কণা—

উঁ—

আমি ভাবছি আজ বিকেলেই চলে যাবো।

চলে যাবে ?

হ্যাঁ।

বেশ। যাও।

কঙ্কণা চোখ বুজলো।

———

কলঙ্কমোচন

১

নিজেকে নিজে যেন ঐ একই প্রশ্ন করেছে চন্দনা।

কিন্তু প্রশ্নটার কোন জবাব খুঁজে পায় নি যেন চন্দনা কিছুতেই। প্রশ্নটা প্রশ্নই থেকে গিয়েছে তার মনের মধ্যে। ঐ আকর্ষণ আজ ত নতুন করে নয় সেই প্রথম দেখা ও পরিচয়ের দিনটি থেকেই যেন ঐ মানুষটার প্রতি এক বিচিত্র দুর্বোধ্য আকর্ষণ অনুভব করে এসেছে চন্দনা, এবং দিনে দিনে কি অদ্ভুত সেই আকর্ষণটা যেন বেড়েই চলেছে।

ক্রমশঃ চন্দনা ঐ মানুষটার কাছে আরো কাছে গিয়েছে।

সনৎ ভট্টাচার্যকে প্রথম দেখে চন্দনা তা প্রায় বছর তিনেক পূর্বে। এক গানের জলসায় গান শেষ করে ডায়াস থেকে বের হয়ে এলেন স্টেজে।

জায়গাটা ছিল বিচিত্র এক আলো আঁধারীতে কিছুটা আবছা আবছা।

সাজঘরের পাশ দিয়ে বাইরে যাবার দরজাটার দিকে এগিয়ে চলেছিল চন্দনা, বাস ধরতে হবে—যেতে হবে সেই যাদবপুরে। নেতাজী কলোনীতে।

হঠাৎ কানে এল সুবিমলদার কণ্ঠস্বর।

চন্দনা।

কে। ফিরে তাকাল চন্দনা।

এদিকে এসো।

চন্দনা কয়েক পা সেই আবছা আবছা আলো-আঁধারীর মধ্যেই এগিয়ে গেল। সুবিমলদা বললে, এসো আলাপ করিয়ে দিই। ইনি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট—বিরাট একজন ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সনৎনারায়ণ ভট্টাচার্য। এস. এন. ভট্টাচারিয়া।

উইংসের ফাঁক দিয়ে স্টেজের কিছুটা আলো জায়গাটায় এসে পড়েছে। সেই আবছায়ার মধ্যে সেই আলোতেই এক দীর্ঘদেহী মানুষকে দেখতে পেল চন্দনা।

উইংসের ফাঁক দিয়ে আলোর খানিকটা এসে ভদ্রলোকের দেহে পড়েছে, স্পষ্ট মুখখানা, দেহের ঊর্ধ্বাংশ নিম্নাংশ ঝাপসা ঝাপসা।

উনি তোমার গান শুনে উচ্ছ্বসিত। সুবিমলদা আবার বললে।

চন্দনা এবার আরো ভালো করে তাকায় মানুষটির মুখের দিকে।

নামকরা ব্যবসায়ী ও ধনী সনৎনারায়ণ ভট্টাচার্যের বয়স তখন মধ্য পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হতে চলেছে। মাথার চুলে বেশ কিছুটা শুভ্রতা এসেছে, রগের দু' পাশের চুলও বলতে গেলে সাদাই।

খুব, একটা দীর্ঘ নয়—পাঁচ ফুট পাঁচ-ছয় ইঞ্চি হবে দৈর্ঘ্যে। গাত্রবর্ণ কালোই। দোহারা গড়ন। মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুলগুলো, সযত্নে ব্যাক ব্রাশ করা, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামান।

চোখে কালো মোটা সেলুলয়েডের ফ্রেমে চশমা।

পরণে দামী অ্যাসকালার ট্রপিক্যাল স্যুট, গলায় ব্লু রংয়ের রক্তবুটির টাই।

সনৎনারায়ণ ভট্টাচার্য বললেন, চমৎকার লাগলো আপনার গান। গান শুনতে আমি ভালবাসি। তেমন তেমন গানের আসর বা জলসা বড় একটা মিস করি না কলকাতায় থাকলে।

চন্দনা তখন তাকিয়ে ছিল সনৎ ভট্টাচার্যের মুখের দিকে।

সুবিমলদা ঐ সময়ে বললে, জান চন্দনা মিঃ ভট্টাচার্য আমাদের সুরশ্রী ক্লাবের বিশেষ পেট্রোন।

লোকটির দাঁড়ানোর ভঙ্গি, বেশভূষা—কথা বলার মধ্যে যেন একটা বিশেষ আভিজাত্য রয়েছে। চন্দনা যেন কেমন বিহ্বল, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে।

চোখের দৃষ্টি যেন ফেরাতে পারে না।

বিমল, একদিন তোমরা আমার লেক টেরেসের বাড়িতে এসো না—গানবাজনা হবে। সনৎ ভট্টাচার্য বললেন।

বেশ তো।

বেশ তো নয়, সোমবার আমি দিল্লী যাচ্ছি—শনিবার রাত্রে—অসুবিধা হবে ?

না—না, অসুবিধা কি।

তোমাদের ক্লাবের সবাই যাবে, কেমন ?

বেশ।

তবে সেই কথাই রইলো।

চন্দনা তখনো তাকিয়ে সনৎ ভট্টাচার্যের মুখের দিকে।

ঐ সময় স্টেজের মধ্যে আলো জ্বলে উঠলো, ঐ জায়গাটাতেও আলো এসে পড়ল। স্পষ্ট আলোয় এবারে আরো ভাল নজরে পড়ে চন্দনার মানুষটি।

ওষ্ঠের কোণে একটু যেন চাপা হসি।

এক হাতে ধরা একটা অর্ধদগ্ধ সিগারেট, অন্য হাতে একটা লাইটার। সিগারেটটা বোধ হয় নিভে গিয়েছিল। সেটা ফেলে দিয়ে পকেট থেকে ৫৫৫-য়ের প্যাকেটটা বের করে নতুন একটা সিগারেট ওষ্ঠপ্রান্তে চেপে ধরে সনৎ ভট্টাচার্য হাতের লাইটারটা জ্বালাতেই টুং টাং একটা মৃদু মিষ্টি মিউজিক।

চন্দনা নমস্কার জানিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ঘুরে সামনের গেট বরাবর আসতেই ধাপে ধাপে সিঁড়ি—চন্দনা দেখতে পেল, সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে সনৎ ভট্টাচার্য। সামনে একটা দামী সাদা রঙের ইমপোর্টেড কার—ইউনিফর্ম পরিহিত সোফার গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। সনৎ ভট্টাচার্যের সামনে দাঁড়িয়ে সুবিমলদা।

সনৎ ভট্টাচার্য গাড়িতে উঠবার আগে পাশে তাকাতেই তার সমস্ত মুখখানি চন্দনা যেন ঝকঝকে আলোয় আরো স্পষ্ট দেখতে পেল।

চন্দনা যেন চোখ ফেরাতে পারে না। সনৎ ভট্টাচার্যের দৃষ্টি কিন্তু চন্দনার পরে পড়ে নি। তাকে বোধ হয় তিনি দেখতেই পান নি।

সনৎ ভট্টাচার্য গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বের হয়ে

গেল। তখনো চন্দনা একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই রয়েছে। বাস ধরতে হবে কথাটা যেন মনেই নেই।

হঠাৎ যেন এক সময়ে চমক ভাঙ্গলো চন্দনার, রাস্তার দিকে পা বাড়ালো। কেমন যেন মন্থর তার চলাটা। বেশী রাত হয় নি—মাত্র নয়টা বেজে দশ।

ঝিরঝিরে একটা হাওয়া দিচ্ছে। একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব হাওয়ায়। হয়ত কোথায়ও দূরে একটু আধটু বৃষ্টি হয়েছে।

জুন মাসের মাঝামাঝি। সেই যে বৈশাখে দু এক দিন আকাশে মেঘ করে ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে দু' চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছিল, ব্যস। তারপর আর কালবৈশাখীর চিহ্নমাত্রও দেখা দেয় নি। কি অসহ্য গরমই না পড়েছে। বর্ষা ত শুরু হবার কথা, গতবার এ সময়েই দু' চার পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

পর পর দুটো বাস ছেড়ে দিতে হলো—যাত্রীতে একেবারে ঠাসাঠাসি, পা ফেলবারও জায়গা নেই। আর একটা বাস কিছুক্ষণ বাদে এলো। আগের মত বাসে যাত্রীর ভিড় যেন উপছে পড়ছে।

ন'টা প'চিশ হয়ে গেল।

কি ভেবে আর বাসের জন্য অপেক্ষা না করে ট্রাম রাস্তার দিকে এগুতে লাগল চন্দনা। ট্রামে চেপে রাসবিহারীর মোড় পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে না হয় যাদবপুরের বাস ধরা যাবে। ট্রাম স্টপেজে এসে চন্দনা একটা দক্ষিণমুখী ট্রামে উঠে পড়ল।

দাঁড়ান যায়, কিন্তু বসবার জায়গা নেই।

বাস স্টপেজ থেকে নেমে বেশ কিছুটা হাঁটতে হয় নেতাজী কলোনীতে পৌঁছাতে হলে। কয়েক বছর হলো কলোনীতে বেশ কয়েকটা পাকা বাড়ি তৈরী হয়েছে—একতলা, দোতলা তিনতলা—তারই পাশে পাকা ভিত ও মাথার উপরে টিন ও অ্যাসবেসটসের ছাত।

দেশ বিভাগের পর পরই অমলেন্দু রায় এদেশে চলে আসেন নি। আসবার তাঁর ইচ্ছাও ছিল না। বছর তিনেকের উপর ছিলেনও সেখানে—কুমিল্লাতে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু থাকতে পারলেন না। সাহসে কুলাল না।

মেয়ে চন্দনা তার বড় হচ্ছে—বয়স তখন তার বারো।

মুসলমান পাড়ার অল্প দূরেই বাড়ি। মাত্র তিন ঘর হিন্দু তখন সেখানে। বাকী সব একে একে চলে গিয়েছে। স্ত্রী বিভাবতী অস্থির হয়ে উঠলেন, বলতে লাগলেন, আর নয়। এবারে চল, সব বজায় থাকতে এ দেশ থেকে চলে যাই।

তথাপি প্রথমটায় দোনামনা করেছেন অমলেন্দু। কিন্তু চন্দনার দিকে তাকিয়েই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত আর থাকতে সাহস হলো না।

মেয়েটার গড়নও বাড়ন্ত। দেখতে শুনতে সুশ্রী।

পৈত্রিক বাসগৃহ বিক্রী করে অমলেন্দু কলকাতায় চলে এলেন। তার কিছুদিন পরেই শুনতে পেলেন—ঐ দুই ঘর হিন্দু যারা ছিল, তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মনে হয়েছিল অমলেন্দুরা তখন ভাগ্যে চলে এসেছিলেন কটা দিন আগে।

ওখানকার হাই স্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ছিলেন অমলেন্দু রায়। কলকাতায় এসে খোঁজখবর নিয়ে অনেক ঘুরে ঘুরে অবশেষে নেতাজী কলোনীতে ঐ জায়গাটুকু পেয়ে মাথা গোঁজবার মত ঠাঁই করে নেন।

মানুষজন বেশী নয়। স্ত্রী বিভাবতী, বড় মেয়ে বার বছরের চন্দনা, আর দুটি ছোট মেয়ে—একটি নয় বৎসরের ও একটি সাত বৎসরের এবং একটি ছেলে বিমান। সেও ঐ বার বৎসরের যমজ ভাইবোন চন্দনা আর বিমান। কিছুদিন বাদে একটা স্কুলে চাকরিও পেয়ে গেলেন, দেশেরই পরিচিত এক কংগ্রেসের নেতাকে ধরে। শ্রীযুক্ত দিবাকর ভট্টাচার্য—লোকসভার মেম্বার। ঐ একদেশেরই মানুষ। যথেষ্ট পরিচয় ছিল—তাঁকে ধরেই ঐ স্কুলের চাকরিটা অমলেন্দুর হয়ে গিয়েছিল।

অনেকগুলো বছর গড়িয়ে গিয়েছে তার পরে।

ছেলে বিমান এখন বি-কম পাশ করে একটা সওদাগরী অফিসে কোনমতে একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। শ আড়াই মত মাস গেলে পায় সব মিলিয়ে।

চন্দনা আই-এ পর্যন্ত পড়ে আর পড়ে নি। গান নিয়েই আছে। ছোটবেলা থেকেই চমৎকার গানের গলা ছিল চন্দনার। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে সে গানের চর্চাও চালিয়ে যাচ্ছিল। এখন সে গান গেয়ে মোটামুটি দু পয়সা রোজগার করে।

রেডিওতে গায়, জলসায় গায়, দুটো গানের ডিস্ক-ও এইচ-এম-ভি থেকে বের হয়েছে।

জলসায় জলসায় প্রায়ই গান গাইতে যাবার ডাক পড়ে।

সুবিমলদার সঙ্গে জলসায় গেলে বেশ ভাল টাকাই পায় চন্দনা। এই আজই তো সে দেড়শ' টাকা পেয়েছে তিনটি গান গাইবার জন্য।

চন্দনা অবশ্যি জানে এবং বুঝতে তার কোন কষ্ট হয় না, সুবিমলদা যে তাকে বেশী বেশী পাইয়ে দেয় সেটা একেবারে তার দিক থেকে নিঃস্বার্থ নয়।

মধ্যে মধ্যে সুবিমলের তার প্রতি স্পষ্ট দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সুবিমল নন্দী।

একটা সঙ্গীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা সে। তা ছাড়া নানা জায়গায় নানা সময়ে জলসা কনডাক্ট করে। বেলেঘাটা অঞ্চলে নিজস্ব পৈত্রিক বাড়ি। একতলা ও তিনতলাটা ভাড়া। দোতলায় থাকে ওরা।

একটা ছোট মরিস গাড়ি আছে। সেই গাড়িটা নিয়েই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

সুবিমলদা অবিশ্যি আজো বলেছিল, জলসার পর তার গাড়িতেই তাকে সে বাড়ি পৌঁছে দেবে। কিন্তু চন্দনা সম্মত হয় নি।

একদিনের অভিজ্ঞতাই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

গাড়ি চালাতে চালাতেই সুবিমল সেদিন চন্দনার প্রতি ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিল।

চন্দনার অবিশ্যি মনে হয় কেবল সুবিমলদাই নয়, বেশীর ভাগ পুরুষেরই যেন মেয়েদের প্রতি একটা গায়েপড়া স্বভাব। কেবল পুরুষদের দোষ দিলেই বা হবে কেন, তার বয়েসী জানাশোনা মেয়েরাও ত কম যায় না। আসলে ঐ ব্যাপারটাই যে কেমন পছন্দ হয় না কোনদিন চন্দনার।

পলাশ মিত্র বলেছিল—সে অত্যন্ত কোল্ড।

কোল্ড বলতে ঠিক কি বুঝায় চন্দনা জানে না। হয়ত পলাশ যা বলেছিল, সে তাই। সত্যিই সে কোন পুরুষের প্রতি কোন আকর্ষণই বোধ করে নি কোনদিন।

জয়ন্ত সেন বলেছিল তাকে—মরবিড। আজকালকার দিনে তার মত পঁচিশ বৎসরের এক মেয়ের একটি কোন পুরুষ বন্ধু নেই, সে নেহাত কোল্ড বলেই সম্ভব—পলাশ মিত্রই বলেছিল।

আশ্চর্য। ঐ ব্যাপারটা নিয়ে কোন দিন আজ পর্যন্ত ভাবেও নি চন্দনা। গান নিয়েই যত কিছু চিন্তাভাবনা।

গানের জগতের বাইরেও যে একটা জগত আছে কখনো ত আজ পর্যন্ত মনে হয় নি চন্দনার।

গানের সঙ্গেই তার ভালবাসা—প্রেম।

সমস্ত বাসের পথে আসতে আসতে যে অন্যমনস্কতার মধ্যে ছিল চন্দনা সেই অন্যমনস্কতাই যেন তাকে তখনো ঘিরে রেখেছে। দম দেওয়া একটা কলের পুতুলের মতই যেন চন্দনা হেঁটে চলেছে।

মাঝপথে পলাশের সঙ্গে দেখা। পরনে বেলবট ও হাওয়াই শার্ট। মুখে সিগারেট। পলাশ ফিল্ম লাইনের লোক। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ক্যামেরাম্যান।

মোটামুটি ভালই রোজগার করে। নেতাজী কলোনীতেই তাদের বাড়ির দু' খানা বাড়ির পরেই ওদের পাকা দালান।

চন্দনা যে! এত রাত্রে ফিরছো, জলসা ছিল বুঝি?

হ্যাঁ। পাশ কাটাবার চেষ্টা করে—চন্দনা।

কিন্তু পলাশ তাকে ছাড়ে না। পাশে পাশে চলতে থাকে।

তোমার কাছে আমি কাল যেতাম।

চন্দনা বললে—কেন ?

একজন নতুন ডাইরেক্টর তার নতুন ছবির নায়িকার রোলের জন্য একটা নতুন মুখ খুঁজছে। কাল একবার চল না আমার সঙ্গে স্টুডিওতে। আমার ধারণা তোমার যেমন ফটোজেনিক ফেস—পছন্দ হয়ে যাবে।

চন্দনা হেঁটে চলে, কোন কথার জবাব দেয় না।

পাশে পাশে পলাশও হেঁটে চলেছে। বললে, কি চুপ করে আছো যে ?

চন্দনার কোন জবাব নেই।

গান গেয়ে আর ক'টা টাকা পাও, একটা ছবি হিট করলে—চাই কি—

তোমার মার অসুখ জেনেছিলাম, এখন কেমন আছেন, চন্দনা বললে পলাশকে তার কথাটা শেষ না করতে দিয়ে।

আমার কথার ত জবাব দিলে না, পলাশ আবার বললে, সত্যি বলছি—দেখো তোমাকে তার ঠিক পছন্দ হয়ে যাবে।

রাত অনেক হলো পলাশ চলি। কথাটা বলে আর দাঁড়াল না চন্দনা বেশ একটু জোর পায়েই হেঁটে এগিয়ে গেল।

মা বিভাবতী তখনো জেগেই ছিলেন। সদরের কড়াটা বেজে উঠতেই এগিয়ে গিয়ে সদর দরজাটা খুলে দিলেন, এত দেরী হলো যে তোর চুনী।

বাড়িতে মা বাবা ও ভাই ওই 'চুনী' বলেই তাকে ডাকে, কেউ তাকে চন্দনা বলে না।

উঃ কি প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছে মা। চল খেতে দেবে চল, বলতে বলতে চন্দনা মায়ের পাশ কাটিয়ে সোজা গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল।

ওরা তিনবোন এক ঘরে শোয়। দুটো চৌকি পাতা পাশাপাশি, একটায় ওর শয্যা অন্যটায় ছোট বোন দুটি।

ওর পরের বোনটি মণিকার বাইশ বছর বয়স হলো। মণিকা বি. এ. পাশ করে শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখছে।

সবার ছোট শমিতারও কুড়ি বছর বয়স হলো। ডিগ্রী কোর্সে পড়ছে।

মণিকা আর শমিতা দু'জনেই জেগে ছিল, ঘুমোয় নি। দু'জনে দুটো ফিল্ম ম্যাগাজিন নিয়ে পড়ছিল ঘরের আলোয়।

শমিতা বললে, আমি একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছি, দিদি!

চাকরি, হাতের ব্যাগটা দেওয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে চন্দনা বললে, কি চাকরি—তোকে আবার কে চাকরি দিল রে।

ক্লাশ থি্র আর ফোরের দু'টো মেয়েকে পড়াতে হবে এক ঘণ্টা করে, যোধপুর পার্কে।

টিউশনী।

হ্যাঁ। ত্রিশ করে মাসে দেবে।

টিউশনী করবি ত, পড়বি কখন।

ও হয়ে যাবে।

না, না—ওসব চাকরি-বাকরি করতে হবে না তোর—আগে পাশটা করে নে।

পাশ আমি করে যাবো।

পাশ করবি তুই জানি। কিন্তু তোকে অনার্স পেতে হবে। তারপর এম এস-সি পড়বি। বাবার কতদিনের ইচ্ছা।

চাকরি করলেও সব হবে।

কিন্তু চাকরির দরকারটাই বা কি তোর এখনই—

বাবা এই বছরই রিটায়ার করছেন জান ত, এখন ত একমাত্র তোমার রোজগারের পরেই ভরসা, দাদা ত একটা আধলাও দেবে না।

হ্যাঁরে, বিমান ফেরে নি। চন্দনা শুধালো।

রাত সাড়ে এগারটা-বারটার আগে সে কবে ফেরে পার্টি অফিস থেকে।

সত্যি বিমানটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। তোয়ালে আর সাবানের কেসটা হাতে কুয়ো তলার দিকে যেতে যেতে চন্দনা বললে।

খেতে বসার আগেই ঐ দিন গান গেয়ে যে দেড়শ টাকা চন্দনা পেয়েছিল তা থেকে ত্রিশটা টাকা নিজের খরচের জন্য রেখে বাকী একশ' টাকা মার হাতে তুলে দিল।

আঁচলে নোটগুলো বেঁধে রাখলেন বিভাবতী।

২

বার বছর যখন বয়েস তখন চন্দনা কলকাতায় এসেছিল।

সেই সময় থেকেই চন্দনা সংসারে অভাব আর অনটন দেখে আসছে। বাবা ত প্রথমে দুইশত দশ টাকা মাত্র মাহিনায় স্কুলের চাকরিতে এখানে ঢুকেছিলেন, তার উপরে গোটা দুই টিউশনী করতে হতো তাঁকে।

ঐ গোনাগুনতি আয়েই সংসার চালিয়েছেন ছেলেমেয়েকে পড়িয়েছেন সাধ্যমত। কি মেয়েদের বিয়ে দেওয়া তার সামর্থ্যে কুলায় নি।

চন্দনা আই-এ পাশ করে আর পড়লো না। গান গাইতে শুরু করলো, আগে কিছুই পেতো না, এখন বৎসর তিনেক কিছু কিছু টাকা পায়।

দু'শো থেকে তিনশ'।

মধ্যে মধ্যে আরো বেশী হয়। যা পায় সে গান গেয়ে সামান্য কিছু হাতে রেখে সবটাই মায়ের হাতে তুলে দেয়।

বিমান চাকরি পেল বটে কিন্তু সংসারের মধ্যে থেকেও সংসারের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে রইলো। অমলেন্দুও জেনে কোন কথা বললেন না।

কিন্তু বিভাবতী একদিন বলেছিলেন, কিছু কিছু ত সংসারে দিলেই পারিস খোকন।

তাতে কি হবে? বিমানের প্রশ্ন।

কিছুটা সাহায্যও ত হয়, ঐ বুড়ো মানুষটার কথাটাও কি ভাববি না, সারাটা জীবন খেটে খেটেই গেল।

ভাবাটা ঐ ভদ্রলোকটিরই উচিত ছিল—এতগুলো সন্তান উৎপাদন করার কি প্রয়োজন ছিল—বলতে পার মা।

বিভাবতী একেবারে পাথর, কি বলবেন আর।

জন্ম দিয়েছেন যখন তার ফলভোগটা তিনি করবেন না ত আর কেউ এসে করবে।

ছিঃ ছিঃ লেখাপড়া শিখে ঐ সব কথাবার্তা বলিস তুই। এত কষ্ট করে লেখাপড়া শেখান—

কেন কি এমন খারাপটা বলেছি। লেখাপড়া শেখান, মানুষ করা তাঁর কর্তব্য ছিল—he has done his duty. তার বেশী কিছু নয়, আর তাই যদি বলত— একে মানুষ করা বলে, এম-কমটা পড়বার ইচ্ছা ছিল তা বললেন ভদ্রলোক, যা করেছি তাই। আমার আর সামর্থ্য নেই।

বিভাবতী অতঃপর চুপ করে ছিলেন।

বিমান কিন্তু থামে না। তখনো বলে চলেছে, কেন চুনী ত যা রোজগার করে তার সবটাই দেয়, তুমি ভাবছো আমিও ঐ সঙ্গে দিলে তোমার এই হরি ঘোষের গোয়ালের অনেকটা সাশ্রয় হবে তাই না। না, তা হবে না। সেই সকালে ডাল-ভাত আর আলু বুমড়োর ঘ্যাট— আর রাত্রে খান কতক আটার রুটি—আর ডাল তরকারি। মাছের ত আজকাল মুখই দেখি না।

যা পারেন উনি তাই করি— তাই তোদের খেতে দিই।

তাই দিও। বুঝেছো, তাতেই সন্তুষ্ট আমি।

ঐ প্রথম আর ঐ শেষ।

আর কোনদিন বিভাবতী ছেলের কাছে সাহায্যের কথা বলেন নি।

চন্দনা শুনে বলেছিল, কেন মানুকে টাকার কথা বলতে গেলে মা। সংসারের কথা ও কি কোন দিন ভাবে, ওর ধ্যানজ্ঞান সব কিছু ওর পার্টি।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ঐ সময় ছোট বোন শমিতাও। সে বলেছিল, কিন্তু দেবেই বা কেন। দু' বেলা খায় না—তার খরচ একটা আছে না।

আঃ শমি চুপ কর—চন্দনা চাপাগলায় ধমক দিয়ে ওঠে।

কেন চুপ করবো কেন, তুইও কম ম্যান্তামুখো নোস দিদি—তুই বলতে পারিস না।

চন্দনা প্রত্যুত্তরে কেবল হেসেছে।

তিন বোন একত্রেই খেতে বসেছিল, বিভাবতী পরিবেশন করছিলেন।

ডালটা বোধহয় ধরে গিয়েছিল, শমিতা বললে। ডালটা পুড়ে গিয়েছিল বুঝি মা।

হ্যাঁ। ডালটা চাপাবার পর সেই ফিক ব্যথাটা উঠলো, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।

দিদি, শমিতা ডাকে।

চন্দনা যেন ঐ ডাকে চমকে ওঠে, বললে—য়্যাঁ। কিছু বলছিস, শমি।

বিভাবতী বললেন, ডালটা সরিয়ে রাখ, জানতাম ও খেতে পারবি না কেউ। আর একটু করে তরকারি দিচ্ছি।

চন্দনা বললে, কেন খেতে পারবো না কেন?

বিভাবতী বললেন, ডালটা পুড়ে গিয়েছে। কেন গন্ধ পাচ্ছিস না।

গন্ধ! না, কই—

ঐ সময় সেজো বোন মণিকা বললে, তখন থেকে লক্ষ্য করছি দিদি তুই যেন কি ভাবছিস, কেমন যেন অন্যমনস্ক।

ঐ কথায় চন্দনা যেন একটু লজ্জা পায়। মাথাটা নীচু করে—কোন জবাব দেয় না বোনের কথায়।

কি ভাবছিস রে দিদি?

কি আবার ভাববো।

তিন বোনের মধ্যে চন্দনাই বেশী হাসিখুশি। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে গুনগুন করে আপন মনে কোন গান গায় বা সুর ভাজে।

সর্বদা মনে হয় যেন ও একটা সুরের জগতে আছে।

চন্দনা চট্ করে উঠে পড়লো।

বিভাবতী বললেন, ওকি রে চুনী—উঠে পড়লি কেন, আর একটু তরকারি দিচ্ছি খেয়ে নে।

না মা ক্ষিধে নেই।

চন্দনা কুয়োতলার দিকে চলে গেল।

অন্য দুই বোন ওর দিকে তাকাল।

বিভাবতী বললেন, খোকন ত এখনো এলো না।

শমিতা বললে, দাদা আজ আর এলেও খাবে না মা, এত রাত হলো নিশ্চয়ই হোটেল থেকে খেয়ে আসবে।

বিভাবতী আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। বিমান প্রায়ই রাত্রে হোটেল থেকে খেয়ে আসে, এসে বলে, খাবো না।

কেন বাইরে থেকে খেয়ে এসেছিস বুঝি, বিভাবতী তবু শুধান।

বিমান বলে, হ্যাঁ।

শোবার ঘরে এসে মণিকা দেখলো—ঘরের আলো নিভান, চন্দনা খোলা জানালাটার সামনে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মণিকা কোন কথা না বলে শয্যার উপরে শুয়ে পড়ল।

অসহ্য গরম পড়েছে।

চাপা একটা ভ্যাপসা গরম। দমবন্ধ করা গরম যেন।

এ বাড়িতে কোন পাখার ব্যবস্থা নেই, একমাত্র বিমানের ঘরে একটা টেবিল ফ্যান আছে। শমিতা এসে ঘরে ঢুকল, দিদি শুস নি।

চন্দনার দিক থেকে কোন সাড়া এলো না।

শমিতা আবার ডাকল, দিদি।

চন্দনার কানে যেন সে ডাকও পৌঁছাল না। সে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো।

দিদি, এবারে বেশ একটু উঁচু গলাতেই ডাকল শমিতা।

কিছু বলছিলি শমি, এতক্ষণে চন্দনা সাড়া দেয়।

তখন থেকে কি ভাবছিস? কি হয়েছে?

কি আবার হবে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, কি হয়েছে রে দিদি।

কিছু হয় নি। তুই শুয়ে পড়। চন্দনা বললে।

জানিস সন্ধ্যায় পলাশদা এসেছিল। তোর খোঁজ করছিল, শমিতা বললে।

কেন?

তা ত জানি না, বলছিল তোর সঙ্গে বিশেষ দরকার।

বাইরে ঐ সময় বিমানের গলার স্বর পাওয়া গেল। বিমান বোধহয় এতক্ষণে বাড়ি ফিরল।

পরে ব্যাপারটা অনেক ভেবেছে চন্দনা। সনৎ ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই বা সেই মুহূর্ত থেকে তার মনের মধ্যে ঐ বিচিত্র আকর্ষণটা সে অনুভব করল কেন। এখন ত নয়, সে কখনো কোন পুরুষের সঙ্গে ইতিপূর্বে মেশে নি—বা পুরুষ জাতটাকেই সে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছে। কলোনীর তার সমবয়সী ও কিছু বড় বা বয়েসে ছোট অনেকেই তার সঙ্গে কথা বলে, কারো কারো সঙ্গে অল্প-বিস্তর মেলামেশাও আছে।

পলাশের সঙ্গে এবং জয়ন্ত ও সুবিমলদার সঙ্গে যথেষ্টই সে নিয়মিত না হলেও মধ্যে মধ্যে বেশ কিছুটা মেলামেশা করেছে।

এবং ঐ তিনজন এখনো রীতিমত সচেষ্ট তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওদের কারোর প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করে নি চন্দনা। আকর্ষণটা কাজেই একতরফা।

বস্তুত একটি নারীর একজন পুরুষের প্রতি যে আকর্ষণ—তার জানা ও পরিচিত মেয়েদের বেলায় সে লক্ষ্য করেছে—তার নিজের দিক থেকে আজ পর্যন্ত কখনো কারোর প্রতিই সে অনুভব করে নি। অথচ ব্যাপারটা ত কোন অস্বাভাবিক কিছু না, বরং সেটাই স্বাভাবিক ছিল।

তবে আজ তার একি হলো।

সেই মানুষটিকে দেখা অবধি কেন চন্দনা কিছুতেই মানুষটাকে ভুলতে পারছে না। মানুষটার কি এমন বৈশিষ্ট্য তাকে এতটা বিচলিত করে তুলল।

বয়েসের দিক দিয়ে মানুষটা প্রৌঢ়।

এবং নিশ্চয়ই বিবাহিতও।

কিন্তু সব কিছু উত্তীর্ণ হয়ে কেন তার মনটাকে মানুষটা নাড়া দিল।

বিমান তার ঘরের মধ্যে গুনগুন করে গান গাইছে।

মণিকা আর শমিতা শুয়ে মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

চন্দনার মনে হয়, আহা মানুষটার গলার স্বরের মধ্যে কি কোন বৈশিষ্ট্য ছিল। হঠাৎ যেন মানুষটার গলার স্বর তাকে চমকে দিয়েছিল।

মনে হয়েছিল তার কথা নয়, যেন গান। সুরেল ভরাট গম্ভীর। মনে মনে হাসে চন্দনা। এসব পাগলের মত কি আবোল তাবোল সে ভাবছে।

সনৎ ভট্টাচার্যের মত মানুষ কি আগে সে দেখে নি। দেখেছে নিশ্চয়ই, তবে তার জবাব কিন্তু খুঁজে পায় না চন্দনা।

পরের দিনই সুবিমলদা এলেন।

বেলা তখন দশটা—কুয়োতলায় স্নান করছিল চন্দনা।

সুবিমল এ বাড়িতে যথেষ্ট পরিচিত। যখন তখন যাতায়াত তার এ বাড়িতে। শমিতাই বসতে দিল সুবিমলকে, বসুন সুবিমলদা। দিদি স্নান করছে।

বাইরের ঘরে সুবিমল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। পাশে তক্তোপোশের উপর ঐ দিনকার সংবাদপত্রটা পড়েছিল সেটা টেনে নিল।

আনন্দলোকের পৃষ্ঠায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে চন্দনা রায়ের প্রশস্তি বের হয়েছে, প্রায় দেড় কলম প্রশস্তি।

কৌতূহলে পড়তে শুরু করে সুবিমল।

আশ্চর্য এমন প্রশংসা ত আগে কখনো কেউ করে নি চন্দনার গানের। আবার প্রশংসা করেছেন সুখরঞ্জনবাবু—যার কলমে প্রশংসা কারো প্রতি কখনও বর্ষিত হয় না।

এক সময় চন্দনা ঘরে এলো।

কি ব্যাপার সুবিমলদা।

দেখেছো আজকের কাগজ।

না, ত কি হয়েছে।

দেখো পড়ে, তোমার কালকের গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, আর কে করেছে জান?

কে?

সুখরঞ্জন ব্যানার্জী।

হঠাৎ, ভদ্রলোক ত বিশ্বনিন্দুক।

তাই ত ভাবছি, পড়, পড়ে দেখো।

পড়বো'খন। কিন্তু আপনি এ সময়ে। প্রশ্নটা করে চন্দনা তাকাল সুবিমলের মুখের দিকে।

এস. এন. সকালবেলা ফোন করেছিলেন।

এস. এন.—

আহা এর মধ্যেই ভুলে গেলে, কাল রাত্রে জলসায় যাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করে দিলাম—সেই যে চোখে চশমা, হ্যাণ্ডসাম ভদ্রলোক—এই শহরের একজন শিল্পপতি।

চন্দনা চুপ করে থাকে।

সুবিমল আবার বললে, সোমবার উনি দিল্লী যাচ্ছেন না। মানে পরশু—তাই কাল সন্ধ্যায় আমাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তোমার গান শুনতে চান—

আমার গান?

হ্যাঁ। ঘরোয়া পরিবেশে তোমার গান শুনতে চান।

কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তখন ঐ সনৎ ভট্টাচার্যের নামটা শুনেই তার বুকের ভিতরটা কাঁপতে শুরু করেছে।

সুবিমল বললে, আমি কিন্তু বলে দিয়েছি।

কি বলেছেন সুবিমলদা ?

আমরা যাবো।

যাবেন বলেছেন ?

হ্যাঁ, যাবো। আমাদের সুরশ্রীর নিজস্ব একটা ছোটখাটো বাড়ি করার ইচ্ছা আমার অনেক দিনের। ওঁকে যদি পাই—মানে ওঁর সাহায্যে হয়ত সেটা হয়ে যাবে।

কি করে তা সম্ভব। আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। চন্দনা বললে।

সুবিমল হাসল। বললে, বুঝতে তোমাকে কিছু হবে না চুনী।

সুবিমল বুঝতে পেরেছিল গত রাত্রেই এস. এন.-এর হাবভাব দেখে চন্দনার প্রতি এস. এন.-এর নজর পড়েছে, নচেৎ তার গান শোনবার জন্য এত আগ্রহ হতো না তাঁর।

তাহলে আমি চলি চুনী—ঐ কথাই রইলো কেমন।

চন্দনা কোন জবাব দেয় না।

হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল বিকেলে তুমি প্রস্তুত থেকো আমি আসবো তোমাকে নিয়ে যেতে। চলি—

সুবিমল আর দাঁড়াল না বের হয়ে গেল।

সারাটা দিনই তারপর কেমন যেন অন্যমনস্ক থাকে চন্দনা। কেবলই সেই মানুষটার চেহারা তার চোখের সামনে যেন ভেসে ভেসে ওঠে।

সেই দীর্ঘকায় মানুষটি।

তার দুটো চোখের দৃষ্টি এবং বিশেষ করে তার সেই কণ্ঠস্বর।

যে কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়েছিল তার—গলা নয়—গান।

একবার মনে হয় তার সে যাবে না।

সুবিমলদাকে বিকেলে গিয়ে জানিয়ে দেবে—সে যেতে পারবে না। কিন্তু মনের কোণে দুর্বার একটা প্রলোভন যেন ডানা ঝাপটাতে থাকে কেবলই।

রাত্রেও ভাল করে ঘুম হলো না চন্দনার। ভোর রাত্রের দিকে চন্দনা তানপুরাটা নিয়ে রেওয়াজ করে প্রায় ঘণ্টাখানেক। সেদিনও ভোরে উঠে বসল তানপুরাটা নিয়ে।

গান শুনতে চাও তুমি আমার,
কি গান শোনাবো তোমায় আমি।

মনের নিভৃতে ভীরু গলায় কে যেন বার বার বলতে থাকে।

ক্রমে বেলা পড়ে এলো।

দুপুর থেকে আকাশে সামান্য মেঘ দেখা দিয়েছে। একটা গুমোট গরম। হয়ত সন্ধ্যার দিকে ঝড়বৃষ্টি হবে।

গা ধুয়ে এসে কাপড় বাছাই করতে গিয়ে যেন থমকে দাঁড়াল চন্দনা।

বাইরে বেরুবার জন্য খানতিনেক আলাদা তাঁতের শাড়ি আছে, তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরে চন্দনা। আজ কিন্তু তিনটের একটা শাড়িও পছন্দ হয় না। শাড়িগুলো সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে চন্দনা।

মণিকা এসে ঘরে ঢুকলো। কি রে দিদি? শাড়িগুলো সামনে নিয়ে বসে আছিস কেন?

মণি—

কি?

কোন্ শাড়িটা পরি বলত।

কেন রে কোন স্পেশাল ব্যাপার আছে নাকি? বিশেষ কোন জায়গায় যাবি বুঝি? কোথায় যাবি রে, একসঙ্গে কথাগুলো বলে যায় মণিকা।

কোথায় আবার, গান গাইতে যাবো।

গান গাইতে ত তুই প্রায়ই যাস, কখনো শাড়ি নিয়ে ত তোকে আগে মাথা ঘামাতে দেখি নি।

সত্যি, কথাটা মিথ্যা বলে নি মণিকা।

বস্তুতঃ বেশভূষার প্রতি কোন দিনই তেমন একটা নজর নেই চন্দনার।

বাজে কথা রাখ, কোন্ শাড়িটা পরি বল।

তুই যাই পর, তোকে তাতেই মানায়।

আবার বাজে কথা বলছিস।

বাজে কথা নয় রে সত্যি কথা। আয়নায় দেখিস ত নিজের চেহারাটা। আচ্ছা আমরা ত চারটি ভাইবোন, একমাত্র ফরসা তুইই হয়েছিস। বাবার রঙটা পেয়েছিস। আর আমরা মায়ের।

হয়েছে। যা তোকে আর বকবক করতে হবে না। বলে একটা শাড়ি তুলে নিল চন্দনা পরবার জন্য।

৩

সুবিমল এলো ঠিক সন্ধ্যার মুখে।

বললে, একটু দেরি হয়ে গেল, চল, মাকে বললে হোত ফিরতে একটু রাত হতে পারে।

বলেছি। কিন্তু বেশী রাত পর্যন্ত আমি থাকতে পারবো না, সাড়ে নয়টার মধ্যেই ফিরে আসতে চাই।

হবে—হবে—গান—তারপর খাওয়া-দাওয়া—চল।

কলোনী থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই সুবিমল বললে, না বাসে নয়—ঐ যে গাড়ি।

গাড়ি!

হ্যাঁ। এস. এন. তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চন্দনা দেখলো কালো রংয়ের ঝকঝকে মারসেডিজ গাড়িটা রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। চন্দনা আর দ্বিরুক্তি না করে সুবিমলের সঙ্গে এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে।

গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে পা দিতেই চোখে মুখে সর্বাঙ্গে একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগল। গাড়িটা এয়ারকনডিশনড্।

গাড়ির কাচ তোলা—কালো রংয়ের কাচ।

লেক টেরেসে এস. এন্.-এর বাড়িতে পৌঁছাতে বেশী সময় লাগল না।

বিরাট তিনতলা বাড়ি।

সামনে বাগান—পোর্টিকো। পোর্টিকোর নীচে এসে গাড়ি দাঁড়াল। উর্দি পরিহিত এক বেয়ারা ওদের অপেক্ষায় ছিল—তারই পিছনে পিছনে ওরা দোতলায় গিয়ে পৌঁছাল। কাচের দরজা ঠেলে পা দিল একটা বিরাট হল ঘরে।

এয়ারকনডিশন করা ঘর।

মেঝেতে ওয়াল টু ওয়াল দামী কার্পেট বিছানো। জানালা দরজায় ভারি কালো সোনালী ফুল তোলা পর্দা। কিছু সোফা কাউচ।

ঘরের মধ্যে আর কেউ ছিল না।

চন্দনা বললে, আর সব কোথায়—সুরশ্রীর ?

আর সব ?

হ্যাঁ—আর কেউ আসে নি ?

না।

কেন ?

শুধু তোমার আর আমার নিমন্ত্রণ।

তা ত কই আগে আপনি আমাকে বলেন নি সুবিমলদা ?

বলবো আবার কি ? এস. এন. তোমার গান শুনতে চান—তাই তোমাকে আর আমাকে আসতে বলেছিলেন।

বেয়ারাটা বললে, আপনারা বসুন—সাহেব গোশল করছেন—এখুনি আসবেন।

চন্দনা দেখলো মেঝেতে একটা হারমোনিয়াম, ডুগি তবলা, একটা তানপুরা আর একটা বেহালার বাক্স।

প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে এস. এন. এসে ঢুকলেন। মুখে পাইপ।

পরনে পায়জামা আর তার উপরে কিমানা। চোখে সেই চশমা—মোটা কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের। পায়ে চপ্পল।

সুবিমল উঠে দাঁড়িয়েছিল।

এস. এন. বললেন, বোস, বোস সুবিমল।

নিজে কথাগুলো বলে একটা সোফায় বসলেন। সুবিমলও আবার বসে পড়লো।

চন্দনার বুকের মধ্যে আবার কাঁপুনী শুরু হয়েছে।

এস. এন. তাকালেন এবারে চন্দনার দিকে, জান চন্দনা, জীবনে অনেক পুরুষ ও মেয়ের গান শুনেছি; কিন্তু তোমার মত গান সত্যিই কম শুনেছি।

ঐ ধরনের প্রশংসাটা চন্দনার জীবনে নতুন নয়। তার গানের

গলা ও গানের প্রশংসা অনেকবারই ইতিপূর্বে অনেকের মুখে সে শুনেছে। শুনতে যে ভাল লাগে নি, তা নয়, বরং একটা আনন্দ ও তৃপ্তিই পেয়েছে সে, কিন্তু আজ সনৎ ভট্টাচার্যের মুখের প্রশস্তি যেন তার অন্তরের মধ্যে গিয়ে সুর তুলল। প্রশংসা যে এমন হতে পারে, চন্দনা যেন প্রথম অনুভব করল।

তার দু'চোখের দৃষ্টি আপনা হতেই নত হয়ে এলো, চন্দনা দেখতে পেল না কিন্তু তার দুই গাল কেমন রাঙা হয়ে ওঠে।

বেয়ারাটা ঐ সময় এসে ঘরে প্রবেশ করল, মনে হলো যেন কোন নির্দেশের জন্য।

হ্যাঁ—ড্রিংক দে—সুবিমল, কোল্ড ড্রিংক না কোন হট ড্রিংক—বিয়ারও আছে—

সুবিমল বললে, বিয়ার দিন।

চন্দনা তুমি ?

চন্দনার গলাটা শুকিয়ে এসেছিল, বললে, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল।

এত আস্তে কথাগুলো সে বললে যে, স্পষ্ট শোনাও গেল না যেন।

নারাণ—

সার—বেয়ারা সাড়া দিল।

করিম বক্স আর যোগেশবাবু এসেছে ?

হ্যাঁ—নীচের ঘরে অপেক্ষা করছে।

ড্রিংক দিয়ে তাদের এখানে পাঠিয়ে দে।

বেয়ারা নারাণ ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

মিনিট পনের বাদে প্রৌঢ় করিম বক্স তবলচি আর বেহালাবাদক যোগেশ সাধু এসে ঘরে ঢুকে সেলাম দিল। সাধুর হাতে একটা বেহালার লম্বা বাক্স।

বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে খাঁ সাহেব—বসুন মিঃ সাধু।

উনি গান গাইবেন, আপনারা ওঁর সঙ্গে সঙ্গত করবেন—পরিষ্কার হিন্দীতে বললেন এস. এন.।

এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল প্রায় এক চুমুকেই ঢকঢক করে খেয়ে নিল চন্দনা।

ঐ ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যেও তখন তার কপাল জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

প্রথমটায় একটা আড়ষ্টতা গলায় প্রকাশ পেয়েছিল চন্দনার, কিন্তু গোটা দুই গান গাইবার পর সে আড়ষ্টতা চলে গেল চন্দনার।

এমন মন প্রাণ ঢেলে ইতিপূর্বে চন্দনা বোধ করি কখনো গান করে নি। তৃতীয় গানটি ধরলো চন্দনা :

'আমার মাথা নত করে
দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে।'

এবং সে গানটিও যখন শেষ হলো—আবার গান ধরলো চন্দনা। গানের নেশায় তাকে যেন তখন পেয়েছে,

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়॥
যে জন দেয় না দেখা, যায় সে দেখে—
ভালবাসে আড়াল থেকে
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালবাসায়॥

একটার পর একটা গান গেয়ে চলে চন্দনা। যেন কোন ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, কারো মুখে কোন কথা নেই। রাত প্রায় সোয়া এগারোটায় গান থামালো চন্দনা। বুকভরা তখন তার তৃপ্তি আর আনন্দের সুর যেন।

চোখ তুলে তাকাল চন্দনা অল্প দূরে উপবিষ্ট সনৎ ভট্টাচার্যের দিকে। তার বড় বড় দুটি চোখ থেকে যেন আনন্দধারা উপছে পড়ছে।

সে আনন্দ যেন চন্দনার সর্বাঙ্গে ঝরে পড়ছে।

এসো চন্দনা—এস. এন. ডাকলেন, আমার পাশে এই সোফাতে

এসে বোস। চন্দনা যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। আবার ডাকলেন এস. এন. এসো।

চন্দনার শেষ গানের রেশটা তখনো ঘরের মধ্যে বুঝি ভেসে বেড়াচ্ছে—

'এসো আমার ঘরে।
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে ॥'

এসো চন্দনা। এস. এন. আবার ডাকলেন।

সে ডাক চন্দনার বুকের মধ্যে যেন একটা সুরের ঝঙ্কার তোলে। চন্দনা উঠে দাঁড়ায়, পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সোফাটার দিকে।

বোস, এইখানে বোস।

চন্দনা বসে পড়ল।

এস. এন.-এর সর্বাঙ্গ থেকে একটা দামী ফরাসী সেণ্টের গন্ধ চন্দনার নাসারন্ধ্রে এসে ঝাপটা দেয়। চন্দনার মাথার মধ্যে যেন কেমন ঝিমঝিম করে।

আহারাদির পর এস. এন. স্বয়ং এলেন পোর্টিকোতে ওদের গাড়িতে তুলে দিতে। বললেন, তোমার গান শুনে কিন্তু আশ মিটল না চন্দনা, মনে হচ্ছে যেন কিছুই শুনলাম না। শোনা হলো না— অনেক বাকী থেকে গেল। আবার যদি আসতে বলি আসবে ত চন্দনা ?

চন্দনা মৃদুগলায় জবাব দিল, আসবো।

চন্দনা কোন মতে গাড়ির মধ্যে উঠে ঝুপ করে বসে পড়ে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। এত রাত কখনো হয় না চন্দনার, বিভাবতী জেগে ছিলেন।

সুবিমল পথেই নেমে গিয়েছিল, গাড়ি ওকে কলোনীর মুখে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে।

এত রাত হলো যে তোর চুনী।

কেমন এক ঘোর ঘোর দৃষ্টিতে যেন তাকালো চন্দনা মায়ের মুখের

দিকে, কেমন কোমল প্রায় নিস্তেজ গলায় বললে, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে মা তাই না ?

একটু আগে রাত সাড়ে বারটা বাজল, বিভাবতী বললেন।

তাহলে ত রাতই হয়েছে।

এত রাতে ফিরলি কি একা একা, বাস ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিভাবতীর গলার স্বরে যেন সংশয় আর আশঙ্কা।

গাড়িতে এসেছি।

গাড়ি ?

হ্যাঁ, যেখানে গিয়েছিলাম তারই গাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে।

কার গাড়ি ? কোথায় গিয়েছিলি ?

সে তুমি চিনবে না মা। তুমি এবারে শোও গিয়ে মা, আমিও এবার শোব। বড্ড ঘুম পেয়েছে।

খাবি না ?

খেয়ে এসেছি।

এসব আমার ভাল লাগছে না। বিভাবতী বললেন।

কি ভাল লাগছে না মা ?

বয়েসের মেয়ে এত রাত করে ফেরা।

ভয় নেই মা, তোমার চুনী এমন কিছু করবে না, যাতে তোমাদের মুখে কালি লাগে।

বিভাবতী আর কথা বললেন না। মেয়ের আপাদমস্তকে একবার তার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

শাড়িটা ছেড়ে চোখে মুখে জল দিয়ে চন্দনা গিয়ে তার শয্যায় শুয়ে পড়ল। মণিকা আর শমিতা তখন দু'জনেই যে যার শয্যায় ঘুমোচ্ছে।

চন্দনা একবার ঘুমন্ত বোনদের মুখের দিকে তাকাল।

মণিকাকে তার চাইতেও সুন্দরী যেন মনে হলো চন্দনার। ঘরের দেওয়ালে ঝুলান আরশিটার দিকে তাকাল চন্দনা। আরশির বুকে প্রতিফলিত তার নিজের মুখ। ঐ মুখটা যেন তার চেনা নয়। ও যেন নতুন এক চন্দনা। কতক্ষণ আরশির দিকে তাকিয়ে ছিল চন্দনা তার

খেয়াল নেই। হঠাৎ এক সময় খেয়াল হতেই ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা সম্পূর্ণ মানুষ তার মনের পাতায় ভেসে ওঠে।

সেই গলার স্বরটা যেন এখনো দু' কানে তার বাজছে: আবার যদি আসতে বলি আসবে ত চন্দনা?

মাথার বালিশটা গালে চেপে ধরে বারবার বলতে থাকে চন্দনা, আসবো, আসবো আসবো।

তুমি ডাকবে, আর আমি যাবো না। যাবো, যাবো বৈকি, যাবো।

সে রাতে, সনৎ ভট্টাচার্যর লেক টেরেসের অত বড় বাড়িতে এক ঐ ভৃত্য, নারাণ ও দারোয়ান বিষণ সিংকে ও বাবুর্চিকে ছাড়া আর কাউকে দেখে নি চন্দনা।

পরে অবশ্যি জেনেছিল, তার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাশ্মীর গিয়েছিল, সামারের ছুটিতে। প্রত্যেক গ্রীষ্মেই তারা কোন না কোন হিল স্টেশনে যেত, সনৎ ভট্টাচার্য কখনো যেতেন না। তাঁর অনেক কাজ, নানা ধরনের ব্যবসা।

মানুষটা অত্যন্ত ব্যস্ত।

এসপ্লানেডে বিরাট অফিস।

চারতলা বিল্ডিংটা, একতলায় সব দোকান, দোতলা ও তিনতলায় অফিস। কাপড়ের মিল, জুট মিল, সাবানের ফ্যাকট্রি, ইলেকট্রিক গুডসের কারখানা। সবই তার বাবা হীরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের হাতে গড়া।

শিল্পপতি এইচ. এন. ভট্টাচার্য।

কলকাতা শহরে চারখানা বাড়ি, একটাতে অফিস, একটাতে তিনি থাকতেন, বাকী দুটো সাহেব পাড়ায় ভাড়া খাটতো। রায় বাহাদুর হীরেন্দ্রনারায়ণ—এইচ. এন. ভট্টাচার্যের ঐ একটি মাত্র সন্তান হোল সনৎনারায়ণ ভট্টাচার্য। করিতকর্মা পুরুষ সনৎনারায়ণ ভট্টাচার্য—অর্থাৎ এস. এন. বাপের ব্যবসাকে দ্বিগুণ করে তুলেছিলেন।

দিন পনের বাদে আবার ডাক এলো এক সন্ধ্যায় সনৎ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে চন্দনার। সংবাদটা অবিশ্যি এবারেও দিয়েছিল সুবিমলদা।

সুবিমল বলেছিল, আবার ডাক এসেছে চুনী।

ডাক ?

হ্যাঁ।

কিসের ডাক ?

বললেন ত গানের, তা গানের না কিসের ডাক কে জানে ?

কি বলছো সুবিমলদা ?

সনৎ ভট্টাচার্য ত আবার তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন চুনী।

নামটা শোনামাত্রই যেন বুকের ভিতরে চন্দনার ধ্বক্ করে উঠলো।

এবার আর সঙ্গে আমিও নই, তুমি একা। একা তোমাকে পাঠাতে বলেছেন।

একা !

হ্যাঁ, একা, ব্যাপারটা কি বল তো ?

কিসের ব্যাপার ?

বুড়ো কি মজল নাকি।

আশ্চর্য। কোন প্রতিবাদ করল না চন্দনা।

যাবে নিশ্চয়ই ?

দেখি।

দেখি নয়, যাও। এবার তার লেক টেরেসের বাড়িতে নয়, তার বিশ্রাম কক্ষে।

বিশ্রাম কক্ষে মানে ?

এসপ্লানেডের যে বাড়িটায় ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স-এর অফিস, তার চারতলায় দিনের বেলা এবং মধ্যে মধ্যে রাত্রেও বিশ্রাম নেন, মানে বিশ্রাম কক্ষে। বলেছেন তার গাড়ি গিয়ে তোমাদের বাড়ি থেকে তোমাকে নিয়ে আসবে কাল সন্ধ্যায়।

চন্দনা কোন কথা বললো না।

ঠিক সন্ধ্যা ছ'টায় গাড়ি যাবে। শোন চন্দনা, একটা কথা বোধহয় তোমাকে আমার বলা প্রয়োজন।

কি কথা সুবিমলদা ?

কথাটা বলে চন্দনা সুবিমলের মুখের দিকে তাকাল।

লোকটা সম্পর্কে যতটুকু শুনেছি, তেমন সুবিধের নয়। রাণু মজুমদারের নাম শুনেছো নিশ্চয়ই, জগদীশ মজুমদারের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, এক সময় তার সঙ্গে শুনেছি যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। জগদীশ মজুমদারের পসার প্রতিপত্তির পিছনে ছিল ভট্টাচার্যের তার সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহ। একা একা তার বিশ্রাম কক্ষে যাওয়াটা, ভেবে দেখো।

কি ভাববো ?

বললাম ত সব। বুঝতে কষ্ট হচ্ছে নাকি ?

চন্দনা প্রত্যুত্তরে হাসলো।

সুবিমল তির্যক দৃষ্টিতে চন্দনার দিকে তাকিয়ে থাকে।

যাচ্ছো তাহলে ?

দেখি।

পরের দিন সন্ধ্যার কিছু আগেই বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লো চন্দনা। মাকে বলে গেল কেবল ফিরতে রাত হতে পারে।

বিভাবতী ভাল মন্দ কিছুই বললেন না।

বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হয় নি রাস্তায় চন্দনাকে।

ছ'টা বাজার কিছুক্ষণ পরেই সেই পরিচিত আলো পিছলে যাওয়া ঝকঝকে মার্সিডিজবেঞ্জ গাড়িটা বাস স্টপটার কিছু দূরে এসে দাঁড়াল।

দোকানে দোকানে তখন আলো জ্বলে উঠেছে।

চন্দনা এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে গাড়িটার সামনে এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে।

মহাবীর সিং চন্দনাকে চিনতে পারে। তাড়াতাড়ি নেমে গাড়ির দরজা খুলে দেয়। চন্দনা চট করে গাড়ির মধ্যে উঠে বসল, মহাবীর

সিং গাড়ির দরজা বন্ধ করে নিজের সীটে উঠে বসে গাড়িতে স্টার্ট দেয়। যাদবপুর মার্কেট ছাড়িয়ে সোজা ঢাকুরিয়া ব্রীজের দিকে গাড়ি চলেছে নিঃশব্দ গতিতে।

বাতানুকুল গাড়ি।

চন্দনা চোখ বুজে গাড়ির নরম গদিতে নিজেকে এলিয়ে দিল। এতটুকু ঝাঁকুনি নেই গাড়িতে, বোঝাই যায় না যেন গাড়ি চলেছে। তার দু' চোখে স্বপ্নের ঘোর নামে।

বাইরে আজ আরো গরম পড়েছে।

গাড়ি এসে অবশেষে বিরাট চারতলা বাড়িটার কোর্ট ইয়ার্ডে প্রবেশ করল।

মহাবীর সিং নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

মহাবীর সিং দীর্ঘ দিন বাঙলা মুলুকে থেকে বেশ বাংলা বলে। বললে, ঐ যে লিফট্ আছে। চারতলায় চলে যান।

লিফট্ ম্যান কোন প্রশ্ন করলো না। সোজা এসে চারতলার করিডোরের সামনে দাঁড়াল। লিফটের দরজা টেনে খুলে দিল। লম্বা খুব নয় একটা করিডোর, বোধকরি হাত পনেরো লম্বা। সামনের দরজাগুলো সর্বত্র বন্ধ। চন্দনা ভেবে পায় না কোন দরজার গায়ে করাঘাত হানবে।

দরজা সব বন্ধ, কিন্তু কোথায়ও দরজার গায়ে বা মাথায় কোন কলিং বেলের চিহ্নমাত্রও নেই। চন্দনা এগিয়ে চলল করিডোর দিয়ে, অবশেষে মুখোমুখি দাঁড়াল শেষ দরজাটার সামনে। পাশে কলিং বেলের সাদা ছোট্ট বোতামটা। বোতামটা টিপতেই দরজা খুলে গেল কয়েক সেকেণ্ড পরে।

সাদা ধবধবে উর্দি পরা এক বেয়ারা। সে কোন প্রশ্নই করলো না কেবল চন্দনাকে প্রবেশ করবার পথ করে দিল।

মেঝেতে দামী পুরু কার্পেট বিছানো, আকাশ নীল রঙের উজ্জ্বল আলোয় চন্দনার সেই রকমই মনে হলো। বেশ প্রশস্ত একটি হল ঘর।

সূক্ষ্ম নেটের পর্দা সব জানালায়, হাওয়ায় উড়ছে।

চন্দনা থমকে দাঁড়াল, অতঃপর কোন দিকে। বেয়ারাটা বোধ হয় বুঝতে পারে, সে এগিয়ে যায়। চন্দনা তার পিছনে পিছনে হেঁটে চলে নিঃশব্দে।

একটা খোলা দরজার সামনে এসে বেয়ারা দাঁড়াল, ভিতরে যান মেম সাহেব। সাহেব এই ঘরে আছেন। কথাগুলো বলে বেয়ারাটা আর দাঁড়ায় না। পাশের একটা দরজা পথে অন্য ঘরে চলে গেল।

চন্দনা কয়েকটা মুহূর্ত দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে ভিতরে পা দিল। একটা মৃদু নীলাভ আলো জ্বলছে ঘরের মধ্যে। ঘরে পা দিয়েই কেমন সব ঝাপসা ঝাপসা মনে হয় চন্দনার প্রথমটায়। ঘরের কোথা থেকে

যেন একটা মৃদু সেতারের বাজনা ভেসে আসছে। ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা মেসিন চলছে।

ক্রমে একটু একটু করে ঐ সূক্ষ্ম আলো আঁধারিতেও চোখে সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এসো, এসো চন্দনা।

চন্দনা মুখ তুলে তাকাল। পরনে আদ্দির পাঞ্জাবি ও সারদা মিলের পায়জামা। মুখে পাইপ।

ঠিক সময় গাড়ি পৌছে ছিল ত। আসতে কোন কষ্ট হয় নি। এস. এন. বললেন।

সনৎ ভট্টাচার্য কথাগুলো বলে আরো দু' পা ওর সামনে এগিয়ে এলেন।

সেই দামী প্যারিস সেন্টের গন্ধটা নাসারন্ধ্রে ঝাপটা দিল।

চন্দনা তুমি পিওনো বাজাতে জান?

না।

ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করবো তোমার পিওনো শেখার। আজ শুধু গলাতেই তোমার গান শুনবো। চল ঐ ডিভানের উপরে বসি। এসো।

দু'জনে গিয়ে একটা ডিভানে বসলো।

সামনে ত্রিপয়ের উপরে ওল্ড স্মাগলারের একটা বোতল, একটা গ্লাস ও সোডার বোতল।

একটা পেগ খাবে?

গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে মিশাতে মিশাতে এস. এন. বললেন।

এস. এন. অর্থে সনৎনারায়ণ ভট্টাচার্য।

চন্দনা কোন কথার জবাব দেয় না। চুপ করে ডিভানের উপরে বসে থাকে।

সেই কাঁপুনিটা অনুভব করছে আবার চন্দনা।

বড় আলোটা জ্বেলে দেবো? শুধালেন এস. এন.।

কেন?

তোমার এই আলোতে অস্বস্তি লাগছে না ত চন্দনা ?

না ত ?

তুমি কিছু খাবে না। আমি বসে বসে হুইস্কি খাবো, ভাবতেও আমার ভাল লাগছে না। অন্ততঃ কিছু কোল্ড ড্রিঙ্ক, তারপরই ডাকলেন, বঙ্কিম—

বেয়ারা বঙ্কিম বোধকরি দরজার বাইরেই আশেপাশে কোথায়ও ছিল। ঐ সময়টা সে সর্বক্ষণই প্রভুর ডাকের জন্য কান পেতে থাকে। বঙ্কিম এসে ঘরে ঢুকলো, সাব্—

ওকে কিছু কোল্ড ড্রিঙ্ক এনে দে।

জিন এণ্ড লাইম এনে দেবো ?

জিন দিবি, তাই দে, খুব কম করে জিন দিস।

চন্দনা জিনের নাম ইতিপূর্বে কখনো শোনে নি। 'জিন' পদার্থটি যে কি তার কোন জ্ঞানই নেই। সে তাই চুপ করে থাকে।

একটু পরেই একটা ছোট ট্রেতে একটা গ্লাস বসিয়ে নিয়ে এলো বঙ্কিম। ট্রেটা চন্দনার সামনে এগিয়ে ধরল। চন্দনা গ্লাসটা তুলে নিল।

এস. এন.-এর অনুরোধে গ্লাসে চুমুকও দিল তার অনুরোধটুকু যেন উপেক্ষা করতে না পেরেই। বিচিত্র একটা অনুভূতি যেন তার দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে।

ক্রমশঃ একটা ঝিমঝিম ভাব।

গান গাইবার কথা কিন্তু এস. এন. বলেন না।

এস. এন. সম্পূর্ণ অন্য কথা শুরু করেন। বললেন, তোমার মা আছেন ত ?

হ্যাঁ।

ভাই বোন ?

ক্রমশঃ একটু একটু করে চন্দনাদের গৃহ ও সংসারের সব কথা জেনে নেন এস. এন.। বুঝতে তার কষ্ট হয় না নিম্ন মধ্যবিত্তের একটি পরিবার। ছেলে কিছুই সাহায্য করে না, ওর বাবা অমলেন্দু রায় একটা স্কুলে টিচারী করেন তাঁর ও ঐ চন্দনার ইনকাম থেকেই সংসারটা চলে।

তাও অমলেন্দু রায় সামনের বছরই রিটায়ার করবেন।

এস. এন. বললেন, চন্দনা তোমাকে ঐ সব কথা জিজ্ঞাসা করলাম বলে মনে কিছু করলে না ত?

না।

এবারে একটা গান গেয়ে শোনাও, শুধু গলায় পারবে না গাইতে? কথাগুলো বলে তাকালেন এস. এন. চন্দনার মুখের দিকে।

চন্দনা গাইল। দু' তিনটে গান গাইল।

সত্যি তোমার গান মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনি, এস. এন. বললেন। হাতের কাছে সামনা সামনি যদি তুমি থাকতে, অবসর পেলেই বলতাম, চন্দনা একটা গান গাও।

যখন শোনার ইচ্ছে হবে, ডাকবেন।

আসবে?

আসবো।

সত্যি বলছো চন্দনা, কি জানো চন্দনা, সবাই বলে আমি নাকি বিরাট এক শিল্পপতি, অনেক টাকা আমার, এক এক সময় মনে হয়, ও তো সব মিথ্যা।

মিথ্যা!

নয়, জান চন্দনা, না থাক। এস. এন. থেমে গেলেন।

বলুন না।

বলবো, সব তোমাকে বলবো। কিন্তু তোমায় ত ফিরতে হবে।

এতক্ষণে যেন চন্দনার খেয়াল হলো বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। বললো, হ্যাঁ, এবারে আমায় উঠতে হবে।

হ্যাঁ, চল খাওয়া দাওয়ার পর মহাবীর সিং তোমাকে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

না, না, আজ আর খাবো না।

খাবে না?

না। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।

একটু কিছুও খাবে না?

না ।

বেশ, বঙ্কিম—

বঙ্কিম এসে ঘরে ঢুকল।

যা, মহাবীর সিংকে গাড়ি বের করতে বল, ওকে পৌঁছে দেবে।

বঙ্কিম চলে গেল।

যাবার আগে একশ' টাকার পাঁচখানা নোট এনে চন্দনার দিকে এগিয়ে ধরলেন এস. এন.।

কি!

টাকা।

না, না।

না কেন। তুমি ত টাকা নিয়েই গান গাও। মনে কর না কোন জলসায় বা রেডিওতে গান গেয়েছো।

না।

এটা তোমার গানের সম্মান দক্ষিণা চন্দনা, নাও আপত্তি করো না।

চন্দনা তথাপি টাকাটা নেবার কোন আগ্রহ বা ইচ্ছা প্রকাশ করে না। চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

নাও চন্দনা। না নিলে কিন্তু আমি দুঃখ পাবো।

চন্দনা এস. এন. এর মুখের দিকে তাকাল চোখ তুলে।

নাও—please লক্ষ্মীটি।

চন্দনা তবু কোন আগ্রহ দেখায় না। এস. এন. নোটগুলো ওর হাতের মধ্যে গুঁজে দিলেন। সেই ক্ষণিকের স্পর্শে তার সারাটা দেহ কেঁপে উঠলো।

আবার আসবে ত?

আপনি ডাকলেই আসবো।

না ডাকলে বুঝি আসবে না। কি? চুপ করে রইলে যে, বল। আসবে না?

আসবো।

চলন্ত গাড়ির মধ্যে বসে বসে চন্দনা ঐ মানুষটার কথাই ভাবছিল। মানুষটা যেন তার সমস্ত চেতনাকে তখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কেন ঐ শিহরণ, কিসের শিহরণ মানুষটার স্পর্শে। কোন পুরুষ যে আগে তাকে স্পর্শ করে নি, তাও নয়।

কিন্তু ঐ মানুষটার ক্ষণিকের স্পর্শ কেন সে ভুলতে পারছে না। কেন এত ভাল লাগে মানুষটাকে। কেন মনে হয় অনন্তকাল ধরে মানুষটার সামনে সে বসে থাকে। মানুষটার সান্নিধ্যে, তার কথা।

আরো অনেক পরে চন্দনা বুঝেছিল, সেটার নামই ভালবাসা।

নিজেকে নিজে অনেকবার প্রশ্ন করেছে চন্দনা, ঐ প্রৌঢ় মানুষটার মধ্যে এমন কি পেয়েছিল যে তার সমস্ত বুকটা বিচিত্র সুধা রসে ভরিয়ে দিয়েছিল।

তার কাছে আত্মসমর্পণে এত সুখ! এত আনন্দ! পরবর্তী কালে একটু একটু করে ঐ বেয়ারা বঙ্কিমের কাছ থেকেই শুনেছিল মানুষটার ইতিহাস

ঘরে পরীর মত সুন্দরী বৌ ছেলে মেয়ে থাকা সত্ত্বেও মানুষটার মনের মধ্যে কোন সুখ বা আনন্দ ছিল না।

লেক টেরেসের বাড়িতে দ্বিতীয়বার আর কোন দিন না গেলেও চন্দনা এস. এন.-এর স্ত্রীকে সামনা সামনি দেখেছিল, পরিচয়ও হয়েছিল। এস. এন.-এর স্ত্রী রঞ্জাবতীকে কেবল সুন্দরী বললেই বুঝি সবটা তার সম্পর্কে বলা হয় না। যেমন দেহের গঠন তেমনি বুঝি চোখ ঝলসানো রূপ।

রঞ্জাবতীর বয়স তখন প্রায় সাতচল্লিশ, কিন্তু দেখে সেটা বুঝবার উপায় ছিল না. মনে হয়েছিল চন্দনার, মাত্র ২৭।২৮ বৎসর বয়স তার, দেহ জুড়ে যৌবন যেন স্থির হয়ে আছে। দামী শাড়ি, হাতে ও গলায় হীরার গহনা যৌবনের মতই যেন ঝলমল করছিল।

রায় বাহাদুর হীরেন্দ্র নারায়ণ অনেক দেখে শুনে তার একমাত্র পুত্রের বধূ নির্বাচন করে এনেছিলেন কলকাতা শহরের বিখ্যাত এক চিকিৎসকের একমাত্র কন্যা রঞ্জাবতীকে।

রঞ্জাবতী বেথুনে পড়তেন, আই. এ. ক্লাসে। বাপের মোটরেই কলেজে যেত রঞ্জাবতী।

রায়বাহাদুরের রঞ্জাকে দেখেই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল, সংবাদটা এনেছিল এক ঘটক। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ খবর নেন, এবং রঞ্জাবতীকে দেখাবার প্রস্তাবও নিয়ে গেল ঘটকই।

ডাঃ হরিহর চক্রবর্তী।

কলকাতা শহরের স্বনামধন্য চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রচুর নাম ও ইনকাম তখন তাঁর।

ঘটকের মুখে শিল্পপতি এইচ. এন.-এর ঐশ্বর্যের ও তাঁর একমাত্র পুত্রের সংবাদ পেয়ে হরিহর চক্রবর্তী নিজেই এসে একদিন রায়-বাহাদুরকে কন্যা দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন, এবং রঞ্জাবতীকে এইচ. এন.-এর পছন্দ হয়ে গেল।

বর্তমান সমাজে যাঁদের ঐশ্বর্য আছে তাঁরা রূপ দিয়ে আভিজাত্যকে ক্রয় করেন। আর যাঁদের রূপ আছে তাঁরা ঐশ্বর্যের আভিজাত্যকে সংগ্রহ করবার জন্য লালায়িত হন।

রায়বাহাদুরের ছিল ঐশ্বর্য, তাই রূপবতী রঞ্জাবতীকে একমাত্র পুত্রের পুত্রবধূরূপে নির্বাচন করে নিজের আভিজাত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। রঞ্জাবতীর তুলনায় তাঁর পুত্রকে কুৎসিতই বলা যায়। রূপ নিয়ে এলেন ঘরে তাই ভবিষ্যতের বংশধরদের আভিজাত্যের কৌলীন্যকে বাড়াবার জন্য।

রঞ্জাবতী এইচ. এন.-এর গৃহে এলো পুত্রবধূ হয়ে।

বিবাহের দেড় বৎসরের মধ্যেই প্রথম সন্তান এলো, দীপেন্দ্রনারায়ণ, তারপর এলো ঐ একই ব্যবধানে দ্বিতীয় সন্তান, মনীন্দ্রনারায়ণ। এবং তারপর এক কন্যা শাশ্বতী তিন বৎসরের ব্যবধানে। বলাই বাহুল্য তারা মায়ের রূপই পেয়েছিল।

রায়বাহাদুর এইচ. এন. পুত্রের মতিগতি সম্পর্কে কেমন একটু যেন সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন তাই আরো বিশেষ করে রঞ্জাবতীকে ঘরে এনেছিলেন।

কিন্তু তার ভুল ভাঙতে বেশী দেরী হয় নি। দ্বিতীয় পৌত্রের জন্মের পরই তাঁর কানে আসতে লাগল নানা কথা।

বিচলিত হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে তিনি। কিন্তু বেশী দিন সে যন্ত্রণা তাঁকে

ভোগ করতে হয় নি। অল্প কিছুদিন পরেই তার মৃত্যু হলো, ব্যবসার যাবতীয় দায়িত্ব এলো সনৎনারায়ণের স্কন্ধে। তাঁর চরিত্রের মধ্যে যেটুকু লজ্জার বা সঙ্কোচের ব্যাপার ছিল, পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঘুচে গেল।

তৎসত্ত্বেও রঞ্জাবতী কিন্তু অনেকদিন ব্যাপারটা যেমন জানতে পারে নি তেমনি স্বামীকে তার সন্দেহও করে নি।

শাশ্বতী যখন স্কুলে পড়ে সেই সময় কানে এলো তার প্রথম কথাটা। তার স্বামীর এক রক্ষিতা আছে। এক জগদীশ মজুমদারের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী রাণু মজুমদার, সে নিয়মিত এসপ্ল্যানেডের অফিস বাড়ির চারতলায় যাতায়াত করে। কোন কোন সময় রাত্রিবাসও করে সেই বিশ্রাম কক্ষে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র দাপেন্দ্রনারায়ণ তখন যুবক, তার বিবাহের কথাবার্তা হচ্ছে। সংবাদটা শুনে রঞ্জাবতীর মনটা লজ্জায় ঘৃণায় একেবারে যেন স্বামীর প্রতি বিষ হয়ে গেলো।

এবং একদিন সে সম্পর্কে স্বামীকে মুখোমুখি প্রশ্নও করলেন।

প্রশ্নটা রেখে ঢেকে নয়, এককথায় সোজাসুজি স্পষ্ট, রাণু মজুমদার কে? শুধালেন রঞ্জাবতী।

এস. এন. কিন্তু চমকে উঠলেন না সঙ্কুচিত হলেন না স্ত্রীর প্রশ্নে। বললেন, কি জানতে চাও—

মেয়েটির কথা।

কি কথা?

তোমার অফিসের উপরের তলায় নাকি সে—

আসে - থাকে।

ছিঃ ছিঃ!

দেখ রঞ্জা, তোমার নিজের অধিকারের বাইরে পা দেবার চেষ্টা করো না, তাতে করে অশান্তিই হবে।

আর দু'দিন বাদে খোকনের বিয়ে হবে—

এস. এন. হাসলেন। বললেন, ছেলের বিয়ে হবে তা হয়েছে কি। আমিও ত চব্বিশে পা দিয়ে তোমাকে বিবাহ করেছিলাম।

মানুষটার নির্লজ্জতায় রঞ্জাবতী যেন মূক হয়ে গেলেন।

এস. এন. আবার বললেন। সংবাদটা যেখান থেকে পেয়েছো, তারা কি বলে নি, রাণু কতদিন আমার কাছে যাতায়াত করছে, প্রায় দুই বৎসর, আর তার আগে ছিল একটি ইহুদী মেয়ে।

জঘন্য !

এস. এন. আবার হাসলেন। অফিস থেকে তখন সবে ফিরেছেন এস. এন. ,স্ত্রীর সঙ্গে আর তর্কাতর্কি না করে পোষাক বদলে বের হয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

আর নিষ্ফল আক্রোশে নিজের মনে নিজেই গর্জাতে লাগল রঞ্জাবতী।

এস. এন.-এর ব্যবহারটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো ঐ দিনের পর থেকে। অতঃপর এসপ্লানেডের বিশ্রাম কক্ষেও মধ্যে মধ্যে তিনি রাতও কাটাতে লাগলেন।

কথাটা সন্তানদেরও অতঃপর জানতে বাকী রইলো না।

তারা জানতে পারল পিতার একটি রক্ষিতা আছে।

এস. এন.-এর মা সত্যবতী তখনো বেঁচে ছিলেন, তিনি কথাটা শুনে কিন্তু তেমন আশ্চর্য হলেন না। কেবল একদিন বলেছিলেন, এ বংশের যা রীতি তাই ত হবে। তোমার শ্বশুর মশাইটিও শুদ্ধ চরিত্রের ছিলেন না বৌমা, তারও ঐ দোষটি বলো বা গুণ বলো ছিল। তোমার ছেলে খোকনও যদি একদিন ঐ পথে যায় ত আশ্চর্য হয়ো না।

মা—

কাদা ছিটোলে সে কাদা তোমারও গায়ে লাগবে ছিটকে বৌমা। ওসব কথায় কান দিও না।

সত্যি রঞ্জাবতী আর কোন উচ্চবাচ্য বা আক্ষেপ করেন নি। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা একেবারে অতঃপর পালটে গিয়েছিল।

বাইরেই তাঁরা ছিলেন স্বামী-স্ত্রী, ভিতরে কোন সম্পর্কই আর ছিল না।

এস. এন.-এর অবশ্যই তাতে কোন কিছু এসে যায় নি।

লেক টেরেসের বাড়িতে আসতেন যেতেন এস. এন. কিন্তু ক্রমশঃ

এসপ্লানেডের অফিস বাড়ির চারতলাটা হয়ে উঠেছিল তার বসবাস ও বিশ্রাম কক্ষই কেবল নয়, শয়ন কক্ষও।

রাত্রিবাস বেশির ভাগ সেখানেই হতো।

লেক টেরেসের বাড়িতে নারাণ ছিল তার খাস ভৃত্য। এ বাসগৃহে এলো বঙ্কিম। লোকটা যেমন ধূর্ত তেমনি কর্মঠ, সে দুদিনেই বিশ্রাম কক্ষে একটা সংসার গড়ে তুলল। সেখানে সেই সর্বময় কর্তা। একজন বাবুর্চি ছিল দোলায়ার, রান্নাবান্না সেই করত, বাকী সব কাজকর্ম দেখা-শোনা করত বঙ্কিম।

ঐ সব কথা চন্দনা জেনেছিল অনেক পরে।

কিছুটা এস. এন.-এর মুখ থেকে এবং কিছুটা বঙ্কিমের মুখ থেকে।

দিন দশেক পরের কথা।

রবীন্দ্র সদনে একটা গানের জলসায় গান গাইতে গিয়েছিল চন্দনা। গান শেষ করে ডায়াস থেকে ভিতরে আসতেই সুবিমলদা বললে, চুনী, এস. এন. তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

কোথায় ?

দরজার বাইরে।

চন্দনা তাড়াতাড়ি স্টেজ থেকে বের হয়ে এলো।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এস. এন. পাইপ টানছিলেন।

আপনি কতক্ষণ।

তোমার গান শুনতে এসেছিলাম ? গান শেষ হয়েছে ত ?

হ্যাঁ।

চল।

কোথায় ?

আমার সঙ্গে।

কিন্তু বাড়িতে ত কিছু বলে আসি নি।

ভাববে ?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে, কাল তা হলে এসো, গাড়ি পাঠাবো, সন্ধ্যায়। চল আজ তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।

আসছি আমি, চন্দনা ভিতরে চলে গেল।

এস. এন. দাঁড়িয়ে রইলেন।

আগের সেই মার্সিডিজটা নয় টোয়েটা, গাড়ির ভিতরটা আগাগোড়া ডানলোপিলোতে মোড়া। ড্রাইভার সেই একই।

একটু পরে এস. এন. চন্দনাকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন।

একটু যদি গঙ্গার ধরে ঘুরে যাই তোমার আপত্তি আছে। এস. এন. বললেন।

চন্দনা হাঁ না কিছুই বললো না।

এস. এন. ড্রাইভারকে গঙ্গার ধারে যেতে বললেন।

গাড়ি চলল।

পাশাপাশি পিছনের সীটে বসে ছিল দু'জনে। গায়ে গা লাগছে পরস্পরের।

গাড়ির ভিতরটা অন্ধকার।

নিঃশব্দে এক সময় এস এন. চন্দনার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। হাত বুলোতে লাগলেন চন্দনার হাতের 'পরে।

চন্দনার সারা শরীর অবশ। কি এক অপূর্ব মাদকতা যেন তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে।

চন্দনা—

প্রায় বোজাগলায় জবাব দিল চন্দনা, কিছু বলছেন ?

কাল ক'টার সময় গাড়ি পাঠাবো ?

সন্ধ্যার পর।

বাড়িতে বলে এসো কিন্তু—

আসবো।

কি বলে আসবে ?

আপনিই বলুন কি বলে আসবো।

বলো ফিরতে হয়ত একটু দেরি হবে।

ড্রাইভার এস. এন.-কে এসপ্ল্যানেডের অফিসে নামিয়ে দিয়ে চন্দনাকে পৌঁছে দিতে গেল।

৫

তারপর কেবল পরের দিন সন্ধ্যাতেই নয়, এক দিন দু'দিন পর পরই গাড়ি আসতে লাগল চন্দনাকে নিয়ে যাবার জন্য।

একটা ঘোরলাগা মানুষের মত অনেকটা তখন চন্দনার অবস্থা। চন্দনা যায় সনৎ ভট্টাচার্যের বিশ্রাম কক্ষে, তিন চার ঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে, কখনো কখনো প্রায় মধ্য রাত্রে বাড়ি ফিরে আসে। গাড়ি যতই এসে কলোনীর অনেকটা দূরে বড় রাস্তায় দাঁড়াক না কেন, ব্যাপারট কলোনীর লোকদের দৃষ্টি বেশী দিন এড়াতে পারে না।

দু' চারজন কলোনীর লোক দেখেও ফেলে চন্দনাকে গাড়িতে উঠতে, এবং গাড়ি থেকে নামতে।

পলাশের চোখেই প্রথমে ব্যাপারটা পড়ে এক রাত্রে।

রাত তখন প্রায় এগারটা।

দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বাস ও রিকশার ভিড়ও কমে গিয়েছে। কেবল বসন্তের পান সিগারেটের দোকানটা তখনো খোলা।

পলাশ বসন্তের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছিল। গাড়ি থামার শব্দে ফিরে তাকাতেই পলাশের নজরে পড়লো। গাড়ি থেকে নামার সময় চন্দনাও অল্প দূরে বসন্তর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেয়েছিল পলাশকে। কিন্তু সে যেন পলাশকে দেখতে পায় নি, সোজা কলোনীর ভিতর ঢুকে পড়ে হাঁটতে শুরু করেছে তখন।

চন্দনা, পলাশ পশ্চাৎ থেকে অনুচ্চকণ্ঠে ডাকল।

কে?

ওটা কার গাড়ি চন্দনা? কার গাড়ি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল?

চন্দনা কোন জবাব দেয় না, হেঁটে চলে।

তা হলে বেশ উঁচু ডালেই পা রেখেছো ?

পলাশ। ফিরে দাঁড়ায় চন্দনা।

তা বাবুটি কে ?

পলাশ ভদ্রভাবে কথা বলো। চন্দনা বললে।

মনে করো না ব্যাপারটা কেবল আমার চোখেই পড়েছে, তোমার অভিসারের কথা অনেকেই জানে।

আর কি তোমার বলবার আছে ?

না। কিন্তু তোমাকে ছিঃ চন্দনা, মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে শেষ পর্যন্ত এই পথ ধরলে!

পলাশ, আমার ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামালেও তোমার চলবে।

চলবে নিশ্চয়ই, কিন্তু মনে রেখো এটা ভদ্র পল্লী।

তোমার মুখের দিকে তাকাতেও আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে পলাশ।

তাই নাকি চন্দনা দেবী, তা আয়নায় যখন নিজের মুখটা দেখো নিজেকে দেখে নিজের ঘৃণা হয় না।

চন্দনা আর দাঁড়াল না।

হনহন করে এগিয়ে চলল।

দিন চারেক পরে, রাত্রে বাড়িতে এসে ঢুকতেই চন্দনার মায়ের মুখোমুখি হতে হলো।

কয়েক দিন ধরেই চন্দনা বুঝতে পারছিল তার ব্যাপারে মারও বোধহয় কিছু বলবার আছে। তার ঐভাবে দু' একদিন পর পরই সন্ধ্যায় গিয়ে রাত্রে ফেরাটা মার দৃষ্টিতেও স্বাভাবিক ঠেকে না। কিন্তু আশ্চর্য চন্দনার মনের মধ্যে কিন্তু কোন বিকার দেখা যায় না।

ব্যাপারটা যে দৃষ্টিকটু তার মনে হয় না একটিবার। কিন্তু ঐ দিন ফিরতেই মা তার ঘরে এসে ঢুকলেন।

মণিকা আর শমিতা তখনো বাড়ি ফেরে নি। নাইট শোতে সিনেমা দেখতে গিয়েছে।

চন্দনা শাড়িটা বদলাচ্ছিল। বিভাবতী ঘরে ঢুকে বললেন, সুবিমল এসেছিল। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে চলে গেল।

কেন ?

জলসায় কি আজকাল আর গান গাস না ? রেডিওতে ত যেতে দেখি না।

না।

কেন ?

ভাল লাগে না। কিন্তু না গেলেও তুমি ত টাকা পাচ্ছো মা।

অনেক বেশীই পাচ্ছি।

তবে—

তাই ত জিজ্ঞাসা করছি ঐ টাকাটা কোথা থেকে আসছে ?

তা জেনে তোমার দরকার নেই।

দরকার আছে। আমি জানতে চাই চুনী, জলসার গান গেয়ে যদি না টাকা পাস ত কোথা থেকে পাস টাকা ?

কি জানতে চাও মা ?

প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে বের হয়ে যাস, এত রাত করে ফিরিস, কোথায় যাস ?

জানতে চাও ?

চাই বৈকি।

একজন ভদ্রলোকের কাছে যাই।

চুনী ! অস্ফুট একটা আর্তনাদের মতো শোনাল বিভাবতীর গলার স্বরটা যেন।

যতটুকু বললাম তার বেশী তুমি জানতে চেও না। বলবো না।

অমলেন্দু যে ঐ সময় দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন জানতে পারে নি চন্দনা। অমলেন্দু পরমুহূর্তেই ঘরে এসে ঢুকলেন, না বললে ত চলবে না চুনী, তোমার মার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

বাবা, আপনাকে আমি সব একদিন বলবো। হ্যাঁ, বলতে ত একদিন আমাকে হবেই।

একদিন নয় আজই বলতে হবে তোমায়। অমলেন্দুর গলার স্বর কঠিন শোনাল।

আমার নিজের কাছেই ব্যাপারটা এখনো স্পষ্ট নয়, আমাকে কটা দিন সময় দিন।

না। সারা কলোনীতে একেবারে তোমাকে নিয়ে টিটি পড়ে গিয়েছে। অমলেন্দু বললেন।

কেন?

জান না, বুঝতে পারছো না কেন? বিভাবতী বললেন।

বিশ্বাস করো তোমরা, আমি কখনো নিজেকে কোন অন্যায় বা নোংরামির মধ্যে জড়াবো না।

যে ভদ্রলোকের কাছে যাও, সে কে?

তুমি তাকে চিনবে না বাবা।

এস. এন. ভট্টাচার্য কি?

চমকে ওঠে চন্দনা। বললে, ঐ নাম তুমি কার কাছে শুনলে বাবা?

কেন সুবিমলই, আজ এসেছিল বলে গেল।

ব্যাপারটা সত্যি। কথাটা মিথ্যা নয়, সুবিমলদা ঠিকই বলেছে। চন্দনা বললে।

সন্ধ্যার কিছু পরে সুবিমল এসেছিল। চন্দনা বাড়িতে নেই শুনে সুবিমল বলেছিল, মাসীমা আপনারা কি জানেন, চুনী আজকাল রেডিও বা জলসায় গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছে?

বিভাবতী বললেন, সেকি, তবে—

কি তবে?

মধ্যে মধ্যে টাকা এনে দেয়।

আমার মনে হয় ব্যাপারটা আপনাদের জানা উচিত মাসীমা।

কি হয়েছে সুবিমল? বিভাবতীর গলার স্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

চুনীর হাবভাব, চালচলন ইদানীংকার আমার কেন যেন তেমন ভাল লাগছে না মাসীমা।

কেন—কেন—ও কথা বলছো কেন সুবিমল?

আপনি জানেন কিনা জানি না, ইদানীং চুনী কোন জলসায় বা রেডিওতে গানের কোন প্রোগ্রামই নিচ্ছে না।

কেন? প্রশ্নটা করে তাকালেন বিভাবতী সুবিমলের মুখের দিকে।

পর পর দুটো রেডিওর প্রোগ্রাম, একটা জলসার কল চুনী ক্যানসেল করে দিয়েছে জানেন?

না। আমি ত কিছুই জানি না।

ঐ সময় অমলেন্দু, এসে ঘরে ঢুকলেন, কি হয়েছে সুবিমল?

বিভাবতী বললেন, কিন্তু গত মাসে প্রায় ছ'সাতশ টাকা দিয়েছে আমায়।

কোথা হতে টাকা পেল বলেছে কিছু?

না। তা ছাড়া আমিও তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নি সুবিমল।

জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল আপনাদের, অত টাকা কোথা হতে পেল সে।

অমলেন্দু, বললেন, তুমি কিছু জান?

বিভাবতী বললেন, আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যায় বের হয়ে যায়, অনেক রাত করে ফেরে।

কোথায় যায়?

তা ত জানি না। বিভাবতী বললেন।

আমিও অবিশ্যি সব জানি না। তবে—সুবিমল যেন একটু ইতস্ততঃ করে থেমে যায়।

কি তবে? অমলেন্দু প্রশ্ন করেন।

এস. এন. ভট্টাচার্য নামে এক ধনী ভদ্রলোকের কাছে নাকি সে যায়, সংবাদটা পেয়েছি।

কিন্তু কেন? কেন যায় অমলেন্দু বললেন।

সে কথাটা আপনারাই তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন মেসোমশাই—

আমরা!

হ্যাঁ, আপনারাই ত জিজ্ঞাসা করবেন। আপনাদেরই মেয়ে যখন।

বিভাবতী বললেন, সে যদি না বলে ?

বাঃ, বলবে না কেন! আপনারা তার মা বাবা, আপনাদের নিশ্চয়ই জানবার অধিকার আছে সে কি করছে না করছে।

অমলেন্দু ও বিভাবতী পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।

অতঃপর সুবিমল বিদায় নিয়েছিল।

বিভাবতী এবারে শুধালেন, তবে কি ঐ ভদ্রলোকই মধ্যে মধ্যে তোকে টাকা দেন।

হ্যাঁ।

বিভাবতী আবার বললেন, কিন্তু কেন—কেন তিনি তোকে টাকা দেন ? তোর গান শুনে ?

আমি ত রোজ তাকে গান শোনাই না।

তবে—তবে অত টাকা কেন তিনি দেন তোকে। ছিঃ ছিঃ, তুই শেষ পর্যন্ত কিনা—কথাটা বিভাবতী যেন শেষ করতে পারলেন না। ঘৃণায়-লজ্জায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

চন্দনা যেন পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে।

শোন চুনী, অমলেন্দু বললেন, কাল থেকে আর তুমি কোথাও বেরুবে না। এমন কি গান গাইতেও তুমি, আর যাবে না কোথাও। তোমাকে দেখছি আমার স্বাধীনতা দেওয়াই অন্যায় হয়েছে। কথাগুলো বলে অমলেন্দু আর দাঁড়ালেন না, ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

তারপর দশটা দিন চন্দনা বাড়ি থেকে কোথায়ও বেরুল না। সুবিমল দু'তিন দিন এলো কিন্তু তার সঙ্গেও দেখা করল না চন্দনা।

ঘর থেকেই বেরুল না।

মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে চন্দনা যেন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। সনৎ ভট্টাচার্যকে যেন কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না চন্দনা।

দিন ও রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত যেন মানুষটাকে মনে পড়ে চন্দনার। বুঝতে পারে না চন্দনা কেন তার ঐ মনের অস্থিরতা ? কিসের

ঐ আকর্ষণ, অহোরাত্র তাকে মানুষটার দিকে টানে? এ যেন এক অদৃশ্য চুম্বক!

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে চন্দনা, ঐ আকর্ষণ তাকে অস্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা বেশীক্ষণ থাকে না।

তবে কি মানুষটাকে সে ভালবেসেছে!

সত্যিই তার ঐ আকর্ষণের মূলে আছে কি মানুষটার প্রতি তার ভালবাসা। বয়সে মানুষটা বলতে গেলে প্রৌঢ়।

তার বাপের বয়সী, সে তার মেয়ের বয়সী। তবু কেন এই আকর্ষণ তার প্রতি। তা সে যাই হোক—মানুষটাকে সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

শেষ পর্যন্ত মনের সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলল চন্দনা। সেদিন এক আত্মীয়ের বাড়িতে বাড়ির সকলের বিবাহের নিমন্ত্রণ ছিল।

মা ভাই ও বোনেরা সকলেই বলল নিমন্ত্রণ বাড়িতে যাবার জন্য, শেষ পর্যন্ত অমলেন্দুও বললেন, চল না চুনী।

না বাবা।

যাবি না?

না।

কেন মা?

আমার ভাল লাগছে না।

তবে তুই একা একা বাড়িতে থাকবি? বিভাবতী বললেন।

হ্যাঁ, একাই থাকবো।

বেশ, তবে আর কি হবে। রেখা তোকে এত করে বলে গেল তার বিয়েতে যাবার জন্য।

রেখাকে দুঃখ করতে বারণ করো।

আসলে রেখা চন্দনার সমবয়সী এবং কেবল সম্পর্কে জ্যেঠতুত বোনই নয়, দু'জনের মধ্যে একটা গাঢ় প্রীতির সম্পর্ক ছিল।

বিকেলের দিকেই সকলে বিয়ে বাড়িতে চলে গেল। চন্দনা একাই থেকে গেল বাড়িতে। ওরা যাবার পরই আকাশে মেঘ করে বৃষ্টি নামল

কেমন যেন বিশ্রী একা একা লাগছিল চন্দনার। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, অনেকক্ষণ জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো চন্দনা, তারপর একসময় অনেকদিন পরে তানপুরাটা নিয়ে বসল। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।

চন্দনা গাইছিল :

মাধব, কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরী
জীবই বাহ পুণ-ভাগ ॥

ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। জলো বাতাস হুহু করে মধ্যে মধ্যে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকছিল, আলো জ্বালায় নি চন্দনা। ঘর অন্ধকার।

হঠাৎ যেন গানের সুর থেমে এলো সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরে।

চন্দনা—

কে ?

অন্ধকারে তাকাল চন্দনা দরজার দিকে।

চন্দনা, আমি।

চন্দনার সারা শরীর শিহরি ওঠে যেন সেই কণ্ঠস্বরে। তাড়াতাড়ি উঠে চন্দনা ঘরের আলোর সুইচ টিপে দিতেই ঘরের মধ্যে আলোর বন্যা নামল।

আপনি !

হ্যাঁ চন্দনা।

তারপর কিছুক্ষণ পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কি হয়েছে চন্দনা, তুমি আসো না কেন আর ?

আমি—

বল চন্দনা বলো।

আমি আর যাব না।

তুমি আর আসবে না ? কেন—কেন চন্দনা ?

আমাকে যেতে বারণ করেছে, আপনার ওখানে।

কে ? কে বারণ করেছে ?

সবাই।

হঠাৎ সনৎ ভট্টাচার্য এসে এগিয়ে চন্দনার একটা হাত ধরলেন, আমি কি তোমাকে কোন অপমান করেছি, অসম্মান করেছি, বল চন্দনা, বলো। জবাব দাও ?

না তো।

তবে আসবে না কেন আর আমার ওখানে ?

আপনার ওখানে আর আমি যাই কারোর ইচ্ছা নয়।

তোমার! তোমার নিজেরও কি তাই ইচ্ছা চন্দনা ? বল চন্দনা জবাব দাও আমার কথার ? চন্দনার হাতটা তখনো ধরে এস. এন., তখনো তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

অমন কথা বলো না চন্দনা, সনৎ ভট্টাচার্য বললেন, তোমাকে না পেলে আমি—আমি বোধহয় পাগলই হয়ে যাবো।

কথাগুলো বলতে বলতে সনৎ ভট্টাচার্য থেমে গেলেন। তাঁর গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো, এবং ঐ দিন ঐ মুহূর্তে চন্দনা বুঝতে পেরেছিল ঐ মানুষটিকে বাদ দিয়ে তার জীবনের একটি দিনও চলতে পারে না। তার জীবনটাই মিথ্যা।

বাড়িতে আর কাউকে দেখছি না। সনৎ ভট্টাচার্য বললেন।

কেউ ত নেই।

তুমি একা ?

সবাই বিয়ে বাড়িতে গিয়েছে।

তুমি যাও নি কেন ?

গেলাম না। কিন্তু আপনি বসবেন না ?

না চন্দনা, বসবো না। আমি যাই—যেমন এসেছিলেন সনৎ ভট্টাচার্য তেমনি বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে।

চন্দনা দাঁড়িয়ে রইলো।

বৃষ্টি তখন একেবারে থেমে গিয়েছে। কেবল জলো ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকছে।

৬

সারাটা রাত ভাবলো চন্দনা।

তার সামনে একটি মাত্র পথই খোলা আছে। অতঃপর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া। মনের মধ্যে যে সংস্কার, যে দ্বিধাবোধ গত কয়েকদিন ধরে তাকে সর্বক্ষণ পীড়া দিচ্ছিল তার অবসান ঘটেছে।

আর কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা:নয়।

ভাল মন্দ কি হবে তা যেন সে আর ভাবতে চায় না।

দুর্বার এক আকর্ষণ তাকে কেবলই ঐ মানুষটার দিকে টানতে লাগল। এবং পরের দিন দুপুরে অমলেন্দু স্কুলে গিয়েছেন, বিমান অফিসে, মণিকা ও শমিতা কেউ বাড়িতে নেই, বিভাবতী ঘুমোচ্ছেন, একটা ছোট অ্যাটাচি কেসের মধ্যে খান দুই শাড়ি ব্লাউজ ভরে নিয়ে, সেটা হাতে ঝুলিয়ে পা টিপে টিপে চন্দনা বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ল। হন হন করে হেঁটে বড় রাস্তায় এসে পড়ল।

প্রচণ্ড রৌদ্র চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। এসপ্লানেড অভিমুখী একটা বাসে উঠে পড়ল চন্দনা। বাস ছেড়ে দেবার পর বাসের যাত্রীদের দিকে একবার তাকাল।

না। কেউ পরিচিত নেই বাসে।

ঐ সময়টা যাত্রীর ভিড়ও বাসে তেমন একটা ছিল না।

মেট্রো সিনেমার সামনে এসে বাস থেকে নামল চন্দনা। সেই পরিচিত বাড়িটার ইয়ার্ডে এসে ঢুকল। তার পরই লিফট্—লিফটে উঠে সোজা চারতলায়।

লিফ্‌টম্যান জিজ্ঞাসা করে নি কোথায় সে যাবে, চারতলায় এসে সে লিফট্‌টা থামিয়ে দরজাটা টেনে খুলে দিল লিফটের। ছোট করিডোরটা অতিক্রম করে সেই চেনা দরজাটার সামনে এসে কলিং বেলের বোতামটা টিপতেই বঙ্কিম এসে দরজা খুলে দিল।

বঙ্কিম দরজাটা খুলে কোন প্রশ্ন করলো না। একপাশে একটু

সরে দাঁড়াল। চন্দনা ঘরের মধ্যে পা দিল। আর যেন দাঁড়াতে বা চলতে পারছিল না চন্দনা, সামনে যে সোফাটা পেল তাঁর উপরেই বসে পড়ল। হাতের অ্যাটাচি কেসটা একপাশে নামিয়ে রাখল।

বেলা তখন তিনটে বেজে এগার মিনিট, ঘরের দেওয়ালের সুদৃশ্য জার্মান ক্লকটায় দেখা যায়। আশ্চর্য আজ কোন কাঁপুনি বোধ করে না চন্দনা।

কোন রকম অস্বোয়াস্তিও বোধ করছে না।

চোখ দু'টো বুজে সোফার উপরে গা এলিয়ে বসেছিল চন্দনা কতক্ষণ তা সে নিজেই জানে না। একসময় বঙ্কিমের কণ্ঠস্বরে চন্দনা চোখ মেলে তাকাল।

চা খাবেন ?

চা।

চন্দনার গলার ভিতরটা শুকিয়ে যেন তখন কাঠ হয়ে গিয়েছে। বঙ্কিমের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুগলায় চন্দনা বললে, দাও।

বঙ্কিম চা তৈরি করে এনে সামনের ছোট টুলটার উপরে নামিয়ে রাখল। বললে, চা—

চায়ের কাপে চন্দনা চুমুক দিচ্ছে, দরজার বেলটা বেজে উঠলো। বঙ্কিম এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। এস. এন. এসে প্রবেশ করলেন।

একি! তুমি—কতক্ষণ ? এস. এন. বলেলেন।

চন্দনা চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতেই, এস. এন. বললেন, না, না, তোমার চা শেষ কর।

আপনি চা খাবেন না ? চন্দনা বললে।

চা। হ্যাঁ, বঙ্কিম আমার চা দে।

বঙ্কিম কিচেনের দিকে চলে গেল।

চা পান করতে করতেই সনৎ ভট্টাচার্য বললেন, আজই আমি কি ভাবছিলাম জান চন্দনা। কিন্তু কই তোমার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

আমি ত একটু ঠাণ্ডা চা-ই খাই। কিন্তু কি বলছিলেন যেন—

ভাবছিলাম আজ সন্ধ্যার পর তোমাদের ওখানে যাবো।

কেন?

তোমার মা বাবার সঙ্গে আলাপ করে আসবো। তুমি আমার কাছে আসো, কথাটা তাঁদের জানা দরকার।

তাঁরা জানেন।

জানেন?

মানে জানতে পেরেছেন কয়েকদিন আগেই। সুবিমলদা কথাটা তাঁদের জানিয়ে এসেছে।

সুবিমল!

আর তাই আমাকে চলে আসতে হলো।

তুমি!

তাঁদের মতের সঙ্গে আমার মতের মিল হলো না, তাই বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি।

বল কি, তা জানিয়ে এসেছো ত?

না। তবে না জানিয়ে এলেও তাঁরা অনুমান করে নিতে পারবেন।

তুমি চিরদিনের জন্যই চলে এসেছো চন্দন?

তা ছাড়া আমি আর কি করতে পারতাম।

তুমি আসায় আমি যে কতখানি খুশী হয়েছি বলে তোমায় বোঝাতে পারব না চন্দনা। আর আমার দিক থেকে কোন প্রবলেমেরও সৃষ্টি হবে না। কিন্তু আমি ভাবছি তোমার কথা, তোমার কোন অসম্মান হোক, তোমাকে কোন গ্লানি বহন করতে হয় আমি তা চাই না। এই চলে আসাটা ত সাধারণ চলে আসা নয় চন্দনা, তাই বলছিলাম—

কি?

তুমি ভাল করে ভেবে দেখেছো ত?

ভেবেছি।

একটা কথার জবাব দেবে চন্দনা?

কি বলুন?

চিরদিন এখানেই থাকতে পারবে ত?

পারবো বলেই ত এসেছি।

সমাজ বল, সোসাইটি বলো, তোমার এখানে থাকাটা কিন্তু সহজ-ভাবে গ্রহণ করবে না।

জানি বৈকি!

জানো!

একটু আগে বললাম ত আপনাকে, সব জেনেই এসেছি আপনার এখানে।

আমার দিক থেকে এইটুকু তোমায় আশ্বাস দিতে পারি চন্দনা এখানে তোমার অমর্যাদা কখনো এতটুকু হবে না। তোমার যদি কলঙ্ক রটে, সে কলঙ্কের ভার আমিও বহন করবো, এবং আনন্দের সঙ্গেই বহন করবো। একটা কথা তোমাকে বলি চন্দনা—

চন্দনা এস. এন.-এর মুখের দিকে তাকাল।

তুমি হয়ত জানো না, আজ আমার বয়স চুয়ান্ন হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন একজনকে পাই নি, তোমাকে দেখার ও তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে যার হাতে নিজেকে আমি পুরোপুরি অর্পণ করতে পারি। মনের দিক থেকে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা যেতে পারে বিশ্বাসে ও প্রীতিতে।

চন্দনা নীরবে শুনে যায় সনৎ ভট্টাচার্যের কথা। সনৎ ভট্টাচার্য বলতে থাকল, তুমি ত জানো, ঘরে আমার স্ত্রীও আছেন, সন্তানও আছে, দীর্ঘ সাতাশ বৎসর হলো তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে, কিন্তু এত বৎসরেও আমার সহধর্মিণী হয়েও তিনি আমাকে বুঝতে পারেন নি। বুঝতে চান নি, বুঝবার চেষ্টাও করেন নি আমাকে। ফলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে অনিবার্য ভাবেই ব্যবধানটা বেড়েই গিয়েছে, নিকটতম সম্পর্কের মধ্যে বসবাস করেও আজ তিনি আমার চাইতে বেশী দূরে। এস. এন.-এর গলার স্বরে যেন কেমন একটা বিষণ্ণ হতাশা।

আমার স্ত্রী রঞ্জাবতীকে তুমি দেখ নি। অমন রূপ সচরাচর বড় একটা চোখে পড়ে না। সে রূপের একটা দুর্নিবার আকর্ষণও আছে, যে আকর্ষণ আমিও একদিন অনুভব করেছিলাম। কিন্তু কোন এক

পুরুষের কাছে কোন এক স্ত্রীলোকের রূপটাই ত শেষ কথা নয়, বিশেষতঃ তারা যদি হয় স্বামী-স্ত্রী।

চন্দনা নীরবে শুনে যায়। একটি কথাও বলে না।

এস. এন. বলতে থাকেন, অত রূপ আর স্ত্রীলোকের দেহটা নিয়েও তিনি আমার কাছ থেকে একটু একটু করে দূরে সরে গেলেন। হয়ত দোষ আমারও ছিল, একা তাঁরই সবটা দোষ নয়, কিন্তু সে যাই হোক, দোষ যার যতটুকুই থাক, আজ আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে বোধহয় একান্ত অনাবশ্যক।

একটু থেমে আবার সনৎ ভট্টাচার্য বলতে লাগলেন অবশ্যি সে কারণে বোধহয় কারোরই আমাদের কারোর প্রতি কোন ক্ষোভ নেই, নালিশও নেই। যা হলো না, যা হবার নয়, তাকে ধরে রাখবার মত বিড়ম্বনা বোধহয় আর নেই। কিন্তু একটা কি দুঃখ জানো চন্দনা, আমার সন্তানরাও আমাকে পরিত্যাগ করেছে, তাদের মধ্যে বোধহয় আমার প্রতি কোন মমতা বা দুর্বলতাই নেই। তবু আমি লেক টেরেসের বাড়িতে যাই। কিন্তু কেমন যেন কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁফ ধরে যায়, কি এক নিঃসঙ্গতা যেন আমাকে চারপাশ থেকে চেপে ধরে। তাই ত বেশী সময় কাটে আমার কাজের মধ্যে অফিস বা ফ্যাকট্রিতে। এই ঘরটিই আমার একমাত্র বিশ্রামের স্থান। জানো সব আমি মেনে নিয়েছি। এ সব কথা কাউকে কোন দিন আমি বলি নি, তোমাকে বললাম। কেন বললাম তাও জানি না।

বাইরে অন্ধকার ঘন হয়ে আসছিল।

চারতলার উপরে ঐ ঘরে বাইরের শহরের গোলমাল বড় একটা পৌঁছায়ই না।

বঙ্কিম এসে দাঁড়াল। এস. এন. শুধালেন, কিছু বলবি বঙ্কিম?

উনি খাবেন ত?

হ্যাঁ। তা ছাড়া আজ থেকে উনি এখানেই থাকবেন। আমার বেড রুমের পাশে যে রুমটা আছে, সেই রুমে আজকের মত ওর শোবার ব্যবস্থা করে দে। বিছানা পেতে বঙ্কিম চলে গেল।

চুনী—

চমকে চন্দনা যেন এস. এন.-এর মুখের দিকে তাকাল। আজ পর্যন্ত কখনো এস. এন ওকে চুনী বলে ডাকেন নি।

আমার ঘরের দেরাজে টাকা আছে, এই নাও চাবি, বলে পকেট থেকে চাবির গোছাটা বের করে এগিয়ে ধরলেন এস. এন. চন্দনার দিকে। চাবিটা আজ থেকে তোমার কাছেই থাক।

চাবি -

ধরো—নাও।

চন্দনা তবু যেন নিশ্চল। এস. এন.-ই তখন ওর হাতটা ধরে চাবির গোছাটা ওর হাতের মধ্যে তুলে দিলেন। কাল দুপুরে ড্রাইভারকে নিয়ে মার্কেটে গিয়ে যা যা তোমার প্রয়োজন জামা-কাপড়—সব কিনে নেবে—কোন লজ্জা করো না।

আমি—কিন্তু—

তোমার সমস্ত প্রয়োজনের ভার আমাকে বইতে দিও।

চাবিটা না হয় আপনার কাছেই থাক। অস্পষ্ট ক্ষীণকণ্ঠে চন্দনা বললে।

না। তোমার কাছেই থাকবে যতদিন তুমি এখানে আছো। যেদিন চলে যাবে, ঐ চাবিটা তুমি যা ব্যবস্থা করবার করে যেও।

আবার বঙ্কিম এলো। সাহেব স্নান করবেন না?

হ্যাঁ-এস. এন. উঠে দাঁড়ালেন।

বাড়ি থেকে চিরদিনের মত বের হয়ে আসার পূর্বে চন্দনার মনের মধ্যে অনেক দ্বিধা, অনেক সঙ্কোচ ছিল। এইভাবে বাড়ি থেকে চলে আসা শুধু মাত্র ত চলে আসাই নয়, চিরজীবনের মতই বুঝি চলে আসা। আজকের পর ঐ বাড়ির দরজাটা চিরদিনের মতই তার কাছে বন্ধ হয়ে যাবে। এও সে বুঝেছিল ঐভাবে চলে আসাটা তার কেউ ক্ষমার চোখে দেখবে না। কেউ বুঝবেও না তার মত এক তরুণীর এক প্রৌঢ়ের জন্য গৃহত্যাগের ব্যাপারটা।

সেও হয়ত কোন দিন কাউকে বুঝাতে পারবে না। এক প্রৌঢ়ের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণকে কেউ স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করবে না। তা না করুক ক্ষতি নেই। কেবল ভয় ছিল তার যার জন্য সে গৃহ ত্যাগ করে এলো সে মানুষটি বুঝতে পারবেন ত। প্রসন্ন মনে তাকে স্বীকার করে নিতে পারবেন ত। এতক্ষণ ধরে সনৎ ভট্টাচার্যর কথাগুলো শুনে যদিও তার মনের দ্বিধাটা অনেকটা কেটে গিয়েছিল, তা হলেও সে মনের মধ্যে পুরোপুরি স্বস্তি পাচ্ছিল না।

এতক্ষণে হয়ত বাবা ও বোনেরা ফিরেছে ঘরে, তবে এখনো হয়ত ব্যাপারটা সঠিক অনুমান করতে পারে নি কেউ। ভাবছে হয়ত কোথাও গিয়েছে সে। মা হয়ত অনুমান করছেন সে এখানেই এসেছে। কিন্তু আরো রাত বাড়বে। রাত গভীর হবে, এগারটা বারটা বেজে যাবে, তখন হয়ত মা বাবা উদ্বিগ্ন হবেন। তখনো বাবা অনুমান করতে পারবেন না, সে চিরদিনের মত গৃহ ছেড়ে এখানে চলে এসেছে।

আরো—আরো রাত হবে। একটা—দুটো তিনটে বেজে যাবে, চন্দনা যখন ফিরবে না, সকলের দুশ্চিন্তা আরো বৃদ্ধি পাবে।

তারপর হয়ত এক সময় তারা চিঠিটা পাবে।

চিঠিঠা সে শমিতার পড়ার টেবিলের সামনেই একটা বইয়ের মধ্যে লিখে ভাঁজ করে গুঁজে রেখে এসেছে।

মা,

আমি চললাম। খুঁজো না আমাকে। ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও করো না! আমি সনৎ ভট্টাচার্যর ওখানে চলে যাচ্ছি। তাকে আমি ভালবেসেছি। তুমি হয়ত কথাটা শুনে অবাক্ হচ্ছো, এও কি সম্ভব, আমার মত অল্পবয়সী একটি মেয়ে এক প্রৌঢ়কে কি করে ভালবাসল। শুধু সে প্রোঢ়ই নয়, তার সংসার আছে, সন্তানরা আছে। বিশ্বাস করো সব জেনেশুনেই তার কাছে আমি যাচ্ছি। কারণ আমি জানি তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না, মর্যাদার সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। কিন্তু যদি না গ্রহণ করেন, জানি না তখন কি করবো, তবে এটা ঠিক

এখানে আর ফিরে আসবো না। বিশ্বাস করো আমার মধ্যে কোন পাপ বা অন্যায় নেই। আমি তাকে সমস্ত অন্তর দিয়েই ভালবেসেছি। আমাকে পারো যদি ত ক্ষমা করো, প্রণাম।

ইতি তোমার চুনী।

সে রাত্রে আর উভয়ের মধ্যে কোন কথাবার্তা হলো না।

ডাইনিং টেবিলে বসে নামমাত্র আহার করলো চন্দনা।

তুমি ত কিছুই খেলে না চুনী। সনৎ বললেন।

চন্দনা বললে, ক্ষিদে নেই।

বাড়ির কথা মনে হচ্ছে, না?

হ্যাঁ—

ফিরে যদি যেতে চাও—

ফিরে যাবো বলে ত আসি নি।

সনৎ ভট্টাচার্য আর কোন কথা বললেন না।

৭

বঙ্কিম শয্যার উপরে নতুন চাদর বিছিয়ে গোটা দুই ঝালর দেওয়া বালিশ শিয়রের কাছে রেখে গিয়েছিল। চন্দনা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল। খোলা জানালা পথে দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি চলে আলোর পসরা সাজিয়েছে রাতের কলকাতা শহর।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো চন্দনা, বাইরে দৃষ্টি মেলে।

মা নিশ্চয়ই এখনো তার অপেক্ষায় জেগে বসে আছেন।

মা যদি তার চিঠিটা পেয়ে থাকে, হয়ত সেই চিঠিটার কথাই ভাবছে। এই ভাবে বাড়ি ছেড়ে চলে আসার কথা দুদিন আগেও সে ভাবে নি। কথাটা একবারও তার মনে হয় নি।

কাল রাত্রেই প্রথম কথাটা তার মনে হয়েছে। এবং তারপরই সে সঙ্কল্প নিয়েছে মনে মনে। চন্দনা বুঝতে পারছে তার এইভাবে চলে আসাটা যখন প্রকাশ পাবে, তার মা বাবার দিক থেকে অনেক জটিলতার সৃষ্টি করবে। এমন কি তাদের পক্ষে মর্মান্তিকও হবে।

গৃহত্যাগিনী মেয়ের জন্য যে লজ্জা তাকে ত তারা অস্বীকার করতে পারবে না। তার নিজের দিকটা সে একান্ত স্বার্থপরের মত ভাবলো, মা বাবা ও অন্য দুটি বোনের কথা ভাবল না একটিবারও। কিন্তু তা ছাড়া আর উপায়ই বা ছিল কি! একান্ত নিরুপায় হয়েই না শেষ পর্যন্ত সে চলে এলো।

না। আর ভাবতে পারে না চন্দনা।

কেমন যেন একটা ক্লান্তিতে শরীরটা ভেঙ্গে আসছে। চন্দনা বুঝতে পারছিল ক্লান্তিটা দেহেরই শুধু নয়, মনেরও।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চন্দনা এসে শয্যার উপর গা ঢেলে দিল। কিন্তু চোখে তার ঘুম আসে না। ঐ শয্যার সঙ্গে সে কোন দিনই অভ্যস্ত নয়, তাই কেমন একটা অস্বোয়াস্তি সারা দেহে যেন

চন্দনা অনুভব করে। ভাবছিল চন্দনা। ঐ মানুষটির আশ্রয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে ঠিকই, কিন্তু এ সংসারে ঐ মানুষটির কাছে এসে যে আশ্রয় নিল সে আশ্রয়ের মধ্যে ত একটা দাবি থাকা দরকার। সে দাবিটা সে কেমন করে প্রতিষ্ঠিত করবে। কোন্ সম্পর্কের জোরে সে তার দাবিটাকে আঁকড়ে থাকবে এখানে, এই গৃহে।

সনৎ ভট্টাচার্যের সংসার আছে, স্ত্রী আছে, সন্তানরা আছে, এবং তাদের একটা সমাজও আছে, সে সমাজ ত তাকে মেনে নেবে না। এবং সে ক্ষেত্রে ঐ মানুষটি যদি তাকে আশ্রয় দেয়ই, লোকচক্ষে সে আশ্রয়ের মর্যাদা কোথায়?

সবাই কি বলবে না সে সনৎ ভট্টাচার্যের রক্ষিতা? সে কদর্যতাকে সে অস্বীকার করবে কি করে, ভাবতে ভাবতে এক সময় চন্দনা শয্যা হতে উঠে পড়ল।

কক্ষের মধ্যে অন্ধকারে পায়চারি করতে লাগল। সে কি তবে এক রক্ষিতা হয়েই এ গৃহে সনৎ ভট্টাচার্যের সঙ্গে বাস করবে? আর যাই করুক সনৎ ভট্টাচার্য ত তাকে কোন অধিকারের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না।

চন্দনাই নয় কেবল সনৎ ভট্টাচার্যও তার কক্ষে জেগে ছিলেন। সামনে ত্রিপয়ের উপরে একটা স্কচ্ হুইস্কির বোতল ও একটা অর্ধেক ভর্তি গ্লাস। সনৎ ভট্টাচার্য একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে ছিলেন। চন্দনা যে ঐভাবে স্বেচ্ছায় কোন দিন তার ঘরে চলে আসতে পারে কখনো ভাবেন নি। মনে মনে যদিচ তাকে সর্বক্ষণ কামনা করতেন।

তাকে সহজ স্বাভাবিক রুচিবোধ যেন সেই সন্ধ্যা থেকে কেবল পীড়ন করছিল। স্ত্রী রঞ্জাবতী ছাড়া অন্য নারী তার জীবনে নতুন নয়। চন্দনার সঙ্গে পরিচয় হবার আগেও ছিল। তারা এসেছে—গিয়েছে কিন্তু চন্দনার মত ত এমন করে সব কিছু পশ্চাতে ফেলে তার গৃহে এমন করে ওঠে নি। চন্দনাকে তিনি বলেছেন তার মর্যাদার কোন

হানি হবে না, সে নির্ভয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সে মর্যাদা কেমন করে চন্দনাকে তিনি দেবেন।

সমাজকে তিনি কি বলে বোঝাবেন!

তাঁর স্ত্রী আছে, সংসার আছে, সেখানেও ত তিনি ওর স্থান দিতে পারবেন না। কেবল মাত্র তার নিজের স্বার্থের জন্য, শেষ পর্যন্ত এখানেই যদি চন্দনা থেকে যায় একদিন কি তাদের দু'জনার সম্পর্কটাকে তাদের পরস্পরের মধ্যে সত্য যাই থাক সংসারের আবিলতার মধ্যে টেনে নিয়ে কলঙ্কের কালি ছিটুবে না! মনের মধ্যে কেমন যেন একটা মায়া বোধ করেন সনৎ ভট্টাচার্য, চন্দনাকে তিনি ঐভাবে অপমান কিছুতেই করতে পারবেন না, অথচ সে অপমান থেকে ওকে বাঁচাবার কোন পথও দেখতে পাচ্ছেন না। পূর্বেকার অন্যান্য মেয়েদের পেয়েছেন তিনি, কোথায়ও কোন সঙ্কোচের বালাই-ই অনুভব করেন নি, কিন্তু আজ যেন চন্দনা সম্পর্কে কিছুতেই স্বস্তিবোধ করছেন না।

অন্যান্যদের সঙ্গে ছিল কেবল অর্থের সম্পর্ক, অর্থের ও দেহের স্থূল লেনদেন। কিন্তু চন্দনা ত তার অর্থের কোন কামনা করে না।

আর অর্থ দিয়েও তিনি চন্দনার সঙ্গে সম্পর্কটা গড়ে তুলতে যে পারবেন না সেটা অন্ততঃ তার কাছে আর অস্পষ্ট নেই। অথচ চন্দনাকে এমনি করে পেয়ে ছেড়েও দিতে পারবেন না।

সামনের গ্লাসটা নিঃশেষে চুমুক দিয়ে সনৎ ভট্টাচার্য আবার বোতল থেকে গ্লাসে ঢাললেন. এবং জল না মিশিয়েই চুমুক দিলেন।

পাশের ঘরেই রয়েছে চন্দনা।

মধ্যবর্তী দরজাটা দুই ঘরের মধ্যে অর্গলবদ্ধ নয়, কেবল মাত্র ভেজানই আছে। ইচ্ছা করলেই এই মুহূর্তে তিনি ঐ ভেজান দরজা টেনে চন্দনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে পারেন। এও জানেন তিনি ভাল করেই চন্দনার দিক থেকে কোন আপত্তি আসবে না।

চন্দনার সমস্ত শরীরটা যেন তাঁর চোখের সামনে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এই মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারছেন চন্দনার ঐ দেহটাকে ঘিরে তাঁর মনের মধ্যে একটা কামনা আছে।

মাথাটার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করছে তবু উঠে দাঁড়ালেন সনৎ, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন ভেজান দরজাটার দিকে।

নিজের অজ্ঞাতেই যেন ভেজান দরজাটা সামান্য ঠেলতেই সেটা খুলে গেল নিঃশব্দে। অন্ধকার ঘর। প্রথমটায় কিছু দেখতে পান না, তারপরই আবছা আবছা নজরে পড়ল তাঁর চন্দনা শুয়ে আছে শয্যাটার উপরে। কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে দেখে সনৎ আবার দরজাটা টেনে দিলেন।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে দু'জনে মুখোমুখি বসে।

দু'জনের সামনে দু'কাপ চা।

হঠাৎ এক সময় সনৎ ভট্টাচার্য প্রশ্ন করলেন, তারপর কি স্থির করলে চুনী?

চন্দনা সনৎ ভট্টাচার্যের মুখের দিকে তাকাল, বললে, কিছু বলছেন।

হ্যাঁ, তা হলে তুমি—

কি?

এখানেই থাকবে?

থাকবো বলেই ত এসেছি।

আর হয়তো কোন দিনই সেখানে ফিরে যেতে পারবে না।

তা জানি।

কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচই প্রকাশ পায় না চন্দনার কণ্ঠস্বরে।

শুধু থাকাই নয় চুনী, তারপরের ব্যাপারটা—

কিন্তু এখান থেকে ফিরে গেলেও ঐ বাড়িতে ত আর আমি গিয়ে ঢুকতে পারব না। চন্দনা বললে।

এখনো হয়ত কিছু জানাজানি হয় নি চন্দনা।

জানাজানি ভয় আমার নেই।

কিন্তু সংসারটা বড় নিষ্ঠুর চুনী।

চন্দনা সনৎ ভট্টাচার্যের কথার কোন জবাব দিল না। চুপ করে রইলো। সনৎ ভট্টাচার্যও অতঃপর অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর

এক সময় বললেন, জান চুনী যা যখন চেয়েছি, পেয়েছি অধিকার করেছি, অস্বীকার করবো না তোমাকে সেই প্রথম দিন ডায়াসে গান গাইতে দেখে অবধি সমস্ত মনটা আমার তোমাকে পাওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিল, তারপর যতবার তোমাকে সামনে পেয়েছি সে বাসনা আমার উত্তরোত্তর বেড়েই গিয়েছে, কিন্তু আজ তুমি নিজেই যখন এসে আমার ঘরে প্রবেশ করলে, আমি যেন কেন আর তোমার দিকে কামনার হাত বাড়াতে পারলাম না।

চন্দনা মাথা নত করলে।

সনৎ ভট্টাচার্য চেয়ার থেকে উঠে তার পশ্চাতে এসে দাঁড়ালেন, ডাকলেন, চন্দনা।

চন্দনা মুখ তুলে তাকাল।

সনৎ ভট্টাচার্য আবার বললেন, তুমি কি ভাবছো জানি না। কিন্তু সত্যটা তোমার কাছ থেকে গোপন করতে পারলাম না। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, আজ কি ভাবছি জানো। রঞ্জাবতী আমার জীবনে আসার আগে তোমার সঙ্গে দেখা যদি হতো, বলতে বলতে সনৎ ভট্টাচার্য হেসেই ফেললেন এবং আবার বললেন, সে ত অনেক বছর আগেকার কথা, তোমার যা বয়স তখনও তুমি জন্মাও নি। আমার বড় ছেলে দীপেনের বয়েসীই হয়ত হবে তুমি।

চন্দনা কোন জবাব দেয় না। পূর্বের মতই চুপ করে বসে থাকে।

সনৎ ভট্টাচার্য আবার বলতে লাগলেন, সত্যি কাল রাত থেকে কেবলই কথাটা ভাবছি। তোমাকে না পারছি গ্রহণ করতে না পারছি বলতে স্পষ্ট করে প্রত্যাখ্যান জানাতে।

আমি কি চলে যাবো ?

না, না—চুনী—চন্দনার কাঁধের উপরে একটা হাত রাখলেন সনৎ ভট্টাচার্য, তুমি যেও না। আমাকে—আমাকে কেবল একটু সময় দাও। এমনটা যে কখনো কোন দিন ঘটতে পারে এ যে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল আমার। জানো চন্দনা, আমি কেবল ভাবছি, একজন পুরুষের বয়েসের যেখানটায় আজ আমি এসে দাঁড়িয়েছি, কথাটা যেন

হ্যাঁ, এয়ার কনডিসনড মেসিন।

এ ঘরে ত বেশ হাওয়া আছে। চন্দনা বললে। তারপর একটু থেমে বললে, কলোনীর বাড়িতে ত একটা ফ্যানও ছিল না ঘরে।

গরম লাগতো না?

কই না।

সনৎ বললেন, লাগতো নিশ্চয়ই গরম, তুমি বলতে চাইছো না। চুনী একটা কথা মনে রেখো—এ বাড়ি তোমার নিজের বাড়ি—এ ঘর তোমার নিজের ঘর। আরো একটা কথা সকাল থেকে ভাবছিলাম, তোমার অবসর মুহূর্তগুলো তুমি কাটাবে কেমন করে? ভাল কথা, তুমি গান ছাড়া কোন মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট বাজাতে জান না? তুমি সেতার আর পিওনো শেখ না। সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো।

বেশ আপনার যখন ইচ্ছা শিখবো।

সনৎ সত্যি সত্যি সব ব্যবস্থা করলেন এক সপ্তাহের মধ্যেই, পিওনো ও সেতার কেনা হলো—ঐ সঙ্গে একটা হারমোনিয়াম ও বায়া তবলা এলো।

তিনজন শিক্ষক নিযুক্ত হলো, পিওনোর টিচার মিঃ গোমেশ, সেতারের জন্য পবিত্রবাবু আর মুরশেদ এলো তবলা বাজাবার জন্য।

সপ্তাহে দু' দিন সেতার, দু' দিন পিওনো বাকী দিনগুলো রইলো তার গানের জন্য।

কাজের মানুষ সনৎ ভট্টাচার্য বেশির ভাগ সময়ই কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন অফিস—সাবান ও তেলের ফ্যাকট্রি—প্রিন্টিং প্রেস—উইভিং মিল।

এক একদিন লাঞ্চ খেতেও আসতেন না সনৎ ভট্টাচার্য।

দেখা হতো সেই রাত্রে ন'টা থেকে দশটায় ডিনার টেবিলে। দু' জনের মধ্যে যা কথাবার্তা ঐ সময়েই হতো। ডিনার টেবিল থেকে সোজা সনৎ ভট্টাচার্য চলে যেতেন তাঁর ঘরে—চন্দনা চলে আসতো তার ঘরে, মধ্যে মধ্যে সেতার নিয়ে সে প্র্যাকটিস করতো।

দু'টো ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা ভেজানই থাকত।

বারান্দায় গেলে চন্দনা দেখতে পেতো সনৎ ভট্টাচার্য চুপচাপ আরাম কেদারাটার উপর বসে আছেন, সামনে হুইস্কির বোতল ও গ্লাস।

মাস খানেক প্রায় হয়ে গেল চন্দনা এখানে এসেছে। বাড়ির কথা প্রায়ই মনে হয়—বিশেষ করে মা বিভাবতী ও ছোট দুটি বোনের কথা।

মেয়ের লেখা চিঠিটা পেয়ে বিভাবতী যেন একবারে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন।

চিঠিটা শমিতাই এনে মায়ের হাতে তুলে দিয়েছিল রাত তখন সোয়া নয়টা বোধ করি হবে। সে-ই প্রথমে চিঠিটা দেখতে পায় তার বইয়ের মধ্যে গোঁজা রয়েছে, ভাঁজ করা।

বিভাবতী ভেবেছিলেন বিকেলে হয়ত কোথায়ও বের হয়েছে চন্দনা। তাই চিন্তা করেন নি কিছু। অন্য কোন রকম কিছু মনেও হয় নি তার। সনৎ ভট্টাচার্যর ওখানে যে চন্দনা যেতে পারে তাও ভাবেন নি—ভাবতে বোধহয় পারেনই নি। আলোর নীচে বসে স্বামীর একটা জামা সেলাই করছিলেন বিভাবতী।

শমিতা বললে, মা, তোমার চিঠি।

আমার চিঠি কে লিখেছে কথাটা বলতে বলতে দাঁতে সুতো কাটতে লাগলেন বিভাবতী।

দেখো না পড়ে—শমিতা হাতের চিঠিটা মার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে আবার বললে।

চিঠিটা কে লিখেছে? আবার বলে উঠলেন বিভাবতী।

দিদি।

চুনী!

হ্যাঁ, পড়ে দেখো—

শমি—

দিদি চলে গেছে মা।

চলে গেছে ? কোথায় ? কখন ? সজাগ হয়ে ওঠেন যেন বিভাবতী এতক্ষণে।

তা ত জানি না। তোমাকে একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছে। এই যে চিঠি—

ইতিমধ্যে মণিকাও ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

চুনী—চুনী চলে গিয়েছে ?

হ্যাঁ।

কেন ?

তা কেমন করে বলবো ?

আবার বললেন বিভাবতী, চুনী চলে গিয়েছে।

চিঠিটা পড়েই দেখো না। পড়লেই সব জানতে পারবে।

বিভাবতী কিন্তু চন্দনার চিঠিটা নেবার বা পড়বার কোন আগ্রহই দেখান না।

মণিকা বললে, কি হবে মা। আমি আর শমি গিয়ে কি একবার খোঁজ করে দেখে আসবো।

কোথায় যাবি তোরা ?

সেই সনৎ ভট্টাচার্যের ওখানে। মণিকা বললে, দিদি মনে হচ্ছে সেখানেই গিয়েছে।

না।

মা ?

না। কোথাও যেতে হবে না। শান্ত-কঠিন গলায় কথাগুলো বললেন বিভাবতী।

যাবো না বলছো ? মণিকা আবার প্রশ্ন করল।

বললাম ত যেতে হবে না কারো কোথায়ও।

মা !

যা এ ঘর থেকে, আমাকে বিরক্ত করিস না।

মণিকা আর শমিতা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে একবার তাকাল—এবং নিঃশব্দে ঘর থেকে দু'জনেই বের হয়ে গেল।

সেলাই হাতে ধরাই ছিল, বিভাবতী স্তব্ধ হয়ে যেমন বসেছিলেন, তেমনি বসে রইলেন মাতুরের উপরে মেঝেতে।

নিজেদের ঘরে এসে শমিতা বললে, দিদি সত্যিই চলে গেছে ছোড়দি। তা গেল কোথায়?

কোথায় আর যাবে—সেই বুড়োটার কাছেই গিয়েছে—দিদির মত একটা মেয়ে ঐ বুড়ো-হাবড়াটার কাছে কি পেয়েছে তা সেই জানে।

সেখানেই যে গিয়েছে দিদি তুই জানলি কি করে? শমিতা বললে।

আমি জানি।

পলাশদা বা সুবিমলদার সঙ্গেও ত চলে যেতে পারে?

না।

অত জোর গলায় বলছিস কি করে?

মণিকা কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

চিঠিটা দেখি।

মণিকার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়লো শমিতা। তারপর বললে, কিন্তু চিঠিতে ত কোথায় যাচ্ছে কিছু লেখে নি।

শমি।

কি?

কথাটা যেন কেউ না জানতে পারে।

কিন্তু গোপন করবিই বা কি করে—একদিন না একদিন সব কিছু ত জানাজানি হয়েই যাবে। এসব কথা কি বেশীদিন চাপা থাকে—ভাবছি, জানাজানি হবার পর মুখ দেখাবো কি করে। দাদার অফিসে গিয়ে দাদাকে একটা খবর দিয়ে আসবো?

না।

কেন?

কেন কি—দাদা ত মজা দেখবে খবরটা জানতে পারলে।

রাত প্রায় সোয়া দশটায় অমলেন্দু ফিরে এলেন। এবং অমলেন্দু ঘরে পা দিতেই হাউমাউ করে বিভাবতী কেঁদে উঠলেন।

কি হলো—বিভা ?

চুনী—

কি হয়েছে চুনীর—কোথায় সে ?

সে আমাদের মুখে চুনকালি দিয়ে গেছে।

কি বলছো পাগলের মত যা তা—

সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে—কাঁদতে কাঁদতে বিভাবতী বললেন।

বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে, কোথায় ?

মণিকাকে জিজ্ঞাসা করো।

মণিকাকে ডাকতে হলো না, সে নিজেই এসে চিঠিটা হাতে করে ঘরে ঢুকল।

মণি—

মণিকা বললে, দিদি একটা চিঠি লিখে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে।

কোথায় গিয়েছে সে ?

চিঠিতে সে সব কিছু লেখা নেই। এই নিন চিঠি।

অমলেন্দু চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়লেন, পড়ার পর চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে বললেন, এ আমি জানতাম বিভা, এমনি যে একটা কিছু ঘটবে আমি বুঝতেই পেরেছিলাম।

কিন্তু এখন কি করবে ? বিভাবতী কান্না-ঝরা গলায় শুধালেন। তখনো বিভাবতী কাঁদছেন।

কি আবার করবো ?

মেয়েটা কোথায় গেল একটা খোঁজ নেবে না ? বয়েসের মেয়ে—

অমলেন্দু বললেন, না।

খোঁজ নেবে না ?

না।

ছেলেমানুষ ঝোঁকের মাথায় একটা ভুল যদি করেই থাকে—

ভুল করে থাকলে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে সে।

কতবার বলেছি মেয়েটার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করো। বিয়ের কথা যখনই বলেছি, তুমি বলেছো, যার-তার হাতে ত মেয়েটাকে কিছু আর তুলে দিতে পারি না।

ঐ পলাশ বা সুবিমলের হাতে—সেটা এর থেকে কি ভাল হতো না।

না। ভাল হতো না। ও দুটোও মাস্তান, পেটে বোমা মারলেও ত একটা অক্ষর বেরুবে না।

আর লেখাপড়ার কথা বলো না। তোমার মেয়ে দু'দুটো পাস করে—

দেখ বিভা, সব ভাল করে না জেনেশুনে সব কিছুর একটা কদর্থ করো না।

বয়েসের মেয়ে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল—কার সঙ্গে না কার সঙ্গে কে জানে—খুব ভাল কাজ করেছে তাই না ?

আমার মেয়েকে আমি জানি, অমলেন্দু শান্ত গলায় বললেন, যতক্ষণ না তার মুখ থেকে সব কথা আমি শুনছি—

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এর পর মুখ দেখাবে কেমন করে ?

অমলেন্দু শান্ত গলায় বললেন, মুখ দেখাবো না। দরকার হলে এ বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে অন্যত্র চলে যাবো।

চলে যাবে ?

দরকার হলে যাবো।

মণিকা বলছিল, সেই সনৎ ভট্টাচার্যের ওখানে—

না।

খোঁজ করবে না তাহলে ?

তোমাদের ধারণা তাহলে সে সেখানেই গিয়েছে ?

মণিকা বললে, আমার তাই মনে হয় বাবা।

তাই যদি সে গিয়ে থাকে ত যাক। সেখানে যাবার কোন প্রয়োজন নেই।

সত্যি চন্দনার কোন খোঁজই আর করা হলো না। এবং বিমান সে রাত্রে বাড়ি ফিরে মার মুখে সংবাদটা পেয়ে কিন্তু জ্বলে উঠলো।

বললে, বাবা বললেই ত হবে না। আমি যাবো, আগাপাশতলা চাবকে আসবো ঐ বুড়ো শয়তানটাকে।

পাশের ঘরেই ছিলেন অমলেন্দু, তাঁর কানে ছেলের সব কথাই গিয়েছিল। তিনি ওদের ঘরে এসে বললেন, তুমি সেখানে যাবে না খোকা।

যাবো না? কি বলছেন আপনি বাবা?

বোনদের উপরে ভাই হয়ে এত কাল কোন্ কর্তব্যটা তুমি করেছো জানতে পারি কি?

তাই বলে এত বড় একটা ব্যাপার—

সেখানে তুমি যাবে না—এই আমার শেষ কথা।

কথাগুলো বলে অমলেন্দু আর দাঁড়ালেন না। যেমন এসেছিলেন তেমনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

বিমান বললে, বাবার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে মা। বেশ—তোমাদের মেয়ে তোমরাই যখন এর একটা বিহিত চাও না আমার আর কি—

কথাটা সনৎই বললেন একদিন চন্দনাকে।

চুনী, এই যে আমার এখানে এসে তুমি আছো, সেজন্য তোমার মনের মধ্যে কোথায়ও কোন গ্লানি বোধ করছো না তো?

আহারাদির পর সে রাত্রে ডিনার টেবিল থেকে উঠে এসে চন্দনা সেতারটা নিয়ে বসেছিল, সনৎ এসে ঘরে ঢুকলেন।

গ্লানি? চন্দনা সনতের মুখের দিকে তাকাল। সে দৃষ্টির মধ্যে কোন দ্বিধা বা সংকোচ ছিল না।

ছ্যাঁ—গ্লানি ।

তা নেই, তবে—

কি তবে বল ?

মধ্যে মধ্যে নিজের মধ্যে যেন কেমন একটা পীড়া অনুভব করি ।

কিসের পীড়া ? বল চুনী ?

অধিকারের পীড়া—কেবলই মনে হচ্ছে কোন্ অধিকারে বা কোন্ দাবিতে আমি এখানে আছি ।

কোন দাবি নেই—কোন অধিকার নেই তোমার ?

চন্দনা প্রশ্নটার কোন জবাব দেয় না । মাথাটা নীচু করে নিজের পরিধেয় শাড়ির আঁচলটা টানতে থাকে ।

সনৎ বললেন, বুঝেছি চুনী । কিন্তু আমি ভেবেছিলাম—তোমার ভালবাসার অধিকার আমার 'পরে—

তা যদি না থাকত, আমি কি আপনার এখানে সেদিন অমন করে একবস্ত্রে চলে আসতে পারতাম । আপনাকে হয়ত আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না যা আমি বলতে চাই ।

তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো চুনী, তোমার অসম্মান আমারও অসম্মান —তোমার গ্লানি—আমারও গ্লানি । তারপর একটু থেমে সনৎ বললেন, তোমার এইভাবে এখানে থাকার ব্যাপারে সামাজিক বা নৈতিক যে প্রশ্নটা স্বভাবতঃই উঠবে আজ না হলে কাল বা পরশু সেটা উভয়েরই কলঙ্ক ।

চন্দনা কোন জবাব দেয় না । চুপ করে থাকে ।

সনৎ বলতে লাগলেন, তোমার কথা আমি জানি না, কিন্তু এই এক মাসে এটা আমি বুঝতে পেরেছি তোমাকে না হলে আমার চলবে না । এবং সেজন্য যত বড় মূল্যই আমাকে দিতে হোক না কেন, আমি দিতে প্রস্তুত । তুমিই বল চুনী, আমি কি করতে পারি ?

আমি ?

হ্যাঁ তুমিই বল ?

কি জানি । আমি জানি না ।

চন্দনা বুঝতে পারে কার সে দুটি বাহু, চন্দনা নিজেকে এলিয়ে দিল সে দুই বাহুর মধ্যে। ·····তারপর এক সময় বৃষ্টি যখন থামল—ভোর হতে আর বেশী বাকী নেই।

মেঘলা আকাশে ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ভোরের আলোর ইশারা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এবং তারই দু'দিন পরে এক দ্বিপ্রহরে—

সনৎ ব্যবসার কি একটা লাইসেন্সের ব্যাপারে গতকাল দিল্লী গিয়েছেন সকালের ফ্লাইটে—চন্দনা একাই ছিল।

সদর দরজার বেলটা বেজে উঠলো।

বঙ্কিমও নেই—ঘণ্টা দু'য়েকের জন্য ছুটি নিয়ে গিয়েছে। চন্দনাকেই গিয়ে দরজা খুলে দিতে হলো। চন্দনা ভেবেছিল বোধ হয় বঙ্কিমই কিন্তু তা নয়—দরজার সামনে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রমহিলাকে ইতিপূর্বে না দেখলেও চন্দনার অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না, সনতের স্ত্রী রঞ্জাবতী। অনেক সুন্দরী মহিলাকে ইতিপূর্বে দেখেছে চন্দনা—কিন্তু রঞ্জাবতীর রূপের কাছে তারা যেন দাঁড়াতেই পারে না, রঞ্জাবতী যেন তুলনাহীনা।

একটা দামী শাড়ি পরনে।

আপনি—

তুমিই বোধ হয় চন্দনা ?

হ্যাঁ—কিন্তু আপনাকে—তা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ভিতরে আসুন।

রঞ্জাবতী ইতিপূর্বে কখনো ঐখানে আসেন নি, ঘরে প্রবেশ করে চারিদিকে একবার তাকালেন।

বসুন—চন্দনা আবার বললে।

না, বসতে আসি নি আমি। তা দেখে তো ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে—ভদ্রঘরের মেয়ে হয়ে এ রকম বেশ্যার জীবন যাপন করছো কেন ?

চন্দনার মুখের উপরে যেন কেউ একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে, সে একেবারে বোবা—

সনৎ কত টাকা করে মাসে মাসে তোমাকে দেয় ?

টাকা ?

হ্যাঁ—কত টাকা করে দেয় সে ? সনৎ তোমাকে মাসে মাসে যে টাকা দেয়, তার অনেক বেশী তোমাকে আমি দেবো।

কেন ?

অবশ্যই এখান থেকে এই মুহূর্তে তুমি যদি চলে যাও।

কোথায় যাবো ?

যে চুলোয় খুশী তোমার যাও। এখানে তোমার থাকা চলবে না, হয় তুমি চলে যাবে নিজে থেকেই নচেৎ জেনো আমি তোমাকে এখান থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবো।

ভুলে যাচ্ছ রঞ্জা, এ বাড়িটা আমার। এখান থেকে কাউকে বের করে দেবার অধিকার একমাত্র যদি কারো থাকে ত সে আমার। আর কারো সে অধিকার নেই।

কথাগুলো বলতে বলতে শান্ত গলায় সনৎ এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন। ওরা দু'জনের একজনও টের পায় নি কখন এক সময় সনৎ এসে ওদের পশ্চাতে দাঁড়িয়েছেন খোলা দরজা পথে।

চরিত্রহীন লম্পট—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন রঞ্জাবতী স্বামীর দিকে তাকিয়ে।

কথাটা বহুবার তুমি বলেছো—কিন্তু জবাব আমি দিই নি। আজও জবাব দিতাম না—কিন্তু চন্দনার মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য তোমাকে আজ আমার জবাব দেওয়া প্রয়োজন।

তাই বুঝি ?

হাঁ—শোন চরিত্রহীন লম্পট যদি কেউ আমাকে করে থাকে ত সে তুমি।

কি বললে ?

শুনতে ত পেয়েছো যা বলেছি, কথাটার পুনরাবৃত্তির কি আর প্রয়োজন আছে। তবু বলছি—চন্দনা আমার স্ত্রী—

বাঃ চমৎকার ! এক লম্পট তার রক্ষিতাকে বলছে স্ত্রী।

তুমি কি মনে করো একমাত্র আইনের জোরেই আমার স্ত্রীর অধিকারটা সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করতে পারো—আর ও বেচারা কোন আইনের প্রশ্রয় পাবে না বলে ওর অধিকারটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। যাও এখান থেকে আর যাবার আগে দুটো কথা শুনে যাও, এখানে আর ভবিষ্যতে কখনো তুমি আসবে না—আর—

আর—

যে অধিকার আমার 'পরে তোমার আছে—জেনো সে অধিকার চন্দনারও আমার 'পরে আছে।

তাহলে তুমিও শুনে রাখ—ঐ বাড়িতে তুমিও আর কখনো যাবে না।

বেশ—তাই যদি তোমার ইচ্ছা—যাবো না।

রঞ্জাবতী আর দাঁড়ালেন না। একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ওদের দু'জনের প্রতি নিক্ষেপ করে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

চন্দনা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। এবারে বললে, এ আপনি কি করলেন?

ঠিকই করেছি চুনী।

না, না—আপনি ও'কে ফিরিয়ে আনুন, আমি চলে যাচ্ছি—

চলে যাবে বলে ত তোমাকে আমি স্ত্রী বলে গ্রহণ করি নি চুনী।

না। এ হয় না। হতে পারে না।

সব কিছু বিচারের ভারটা আমার 'পরেই তুমি ছেড়ে দাও চুনা। যাক, একদিক দিয়ে এ ভালই হলো—রঞ্জার সঙ্গে একদিন না একদিন একটা বোঝাপড়া আমার করতে হতো—সেটা আজই হয়ে গেল।

কিন্তু এ যে আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না। চন্দনার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

জানি চুনী তোমার সংশয়টা কোথায়। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো—আমার মধ্যে কোন সংশয়ই নেই। তোমাকে গ্রহণ করার মধ্যে আমার দিক থেকে কোন ফাঁকিই নেই। কেবল একটা কথা আমার মধ্যে মধ্যে আজকাল মনে হয়—আমাকে তোমার গ্রহণ করার

মধ্যে যে ফাঁকিটা আছে—এবং ক্রমশঃ সেটা হয়ত আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে—

ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলবেন না।

আমি যে আমার বয়সটাকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছি না চুনী।

কিন্তু আমার ত সে জন্য কোন ক্ষোভ নেই।

সেখানেই ত আমার বিস্ময়!

চন্দনা এগিয়ে এসে সনতের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললে, চলুন ঘরে চলুন—আমি চা করে আনি।

৯

চার মাস হয়ে গিয়েছে চন্দনা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে।

কথাটা কিছুদিন চাপা থাকলেও শেষ পর্যন্ত চাপা থাকে নি। কলোনীতে জানাজানি হয়ে গিয়েছে। কেমন করে হলো বাড়ির কেউ জানে না, কিন্তু জানাজানি হয়ে গিয়েছে।

প্রথম প্রথম কলোনীর সকলেই মণিকা ও শমিতা বাড়ির বাইরে গেলেই এবং কলোনীর কারো সামনাসামনি পড়ে গেলেই যেন কেমন করে ওদের দিকে তাকাত।

একদিন পলাশই মণিকার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হতে বললে, কিরে মণিকা, তোর দিদি নাকি কার সঙ্গে ভেগেছে।

মণিকা পলাশের কথাটার জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পলাশ পাশ কাটাতে তাকে দেয় নি।

কিরে—জবাব দিচ্ছিস না যে? কার সঙ্গে ভাগলো রে শেষ পর্যন্ত—

কেন—তুমি জান না? মণিকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে।

আরে জানলে কি আর জিজ্ঞাসা করি। এটুকু জানি আমাদের

কলোনীর কারো সঙ্গে নয়—সেই মটরওয়ালা লোকটার সঙ্গে তাই না ? তাহলে, বেশ শাঁসালো মাল পাকড়েছে বল ?

তবে কি তুমি মনে করেছিলে পলাশদা, তোমার সঙ্গে পালাবে দিদি ?

আমার সঙ্গে পালালে অন্ততঃ রক্ষিতা হয়ে থাকতে হতো না—বিয়ে করে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলতাম।

তাই নাকি ? তা খাওয়াতে কি ? কত টাকা পাও স্টুডিওতে সেট সাজিয়ে ? দিদির একজোড়া স্যাণ্ডেলের দামও ত যোগাড় করতে পারতে না।

মুখ সামলে কথা বলবি মণিকা।

কেন, তোমার ভয়ে নাকি ?

হ্যাঁ ভয়ে—এ ভদ্র কলোনীতে থেকে বেশ্যাবৃত্তি করা চলবে না। তোর বাপকে বলিস, ভালয় ভালয় এ কলোনী ছেড়ে চলে যায় ত যাক—নচেৎ—

কি করবে ?

পলাশ কি একটা যেন বলতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু বলা হলো না। একটি যুবক ঐদিকেই আসছিল, পরনে প্যাণ্ট ও হাওয়াই শার্ট—চোখে কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমে চশমা। মণিকার দিকে যুবকটি এগিয়ে এলো। পলাশের শেষ কথাগুলো দূর থেকে তার কানে গিয়েছিল।

মণিকা—যুবক ডাকল।

কঙ্কণদা—

কঙ্কণ মণিকার দিকে তাকিয়ে বললে, এ ভদ্রলোক কে ? কি যেন বলছিলেন উনি তোমাকে ?

পলাশ কঙ্কণের বলিষ্ঠ ব্যায়ামপুষ্ট শরীরটার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিল—আর বেশী কথা বলা ঠিক হবে না। সরে পড়াই ভাল।

তা ছাড়া কঙ্কণ দত্ত তার অপরিচিত নয় ঠিক, বছর তিনেক আগে ঐ ছেলেটিকে বারকয়েক দেখেছে—মণিকাদের বাড়িতে আসতে-যেতে। পলাশ আর কালক্ষেপ করে না—আস্তে আস্তে সরে পড়ে।

কি বলছিল ছেলেটি মণিকা ? কঙ্কণ আবার শুধাল।

কিছু না। তা তুমি এতদিন কোথায় ছিলে কঙ্কণদা, তোমাকে দেখি না।

কেন—চন্দনা তোমার দিদি, তোমাদের কিছু বলে নি ?

না ত।

আমি ত বি. এ. পাস করার পরই নেভিতে ভর্তি হয়েছি।

নেভিতে ?

হ্যাঁ—চন্দনাকে আমি ত জানিয়েছিলাম একটা চিঠি দিয়ে—চল, তোমাদের বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। চন্দনা বাড়িতে আছে ?

না।

নেই। কোথায় গিয়েছে ? কখন ফিরবে ?

মণিকা কঙ্কণের কথার কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

কি ব্যাপার মণিকা ?

আপনি আমাদের বাড়িতে গেলেও দিদির দেখা পাবেন না।

দেখা পাবো না ?

না। দিদি ত আজকাল—কথাটা শেষ করে না মণিকা, থেমে যায়।

কঙ্কণ বুঝতে পারে—গত তিন বৎসরে তার অনুপস্থিতিতে একটা কিছু ঘটে গিয়েছে। তার সন্দেহ হয় হয়ত চন্দনার ইতিমধ্যে বিবাহ হয়ে গিয়েছে—তাই হয়ত কয়েকটা চিঠি লিখেও তার কোন জবাব পায় নি।

চন্দনার বিয়ে হয়ে গিয়েছে বুঝি ?

না।

তবে ?

সে অনেক কথা কঙ্কণদা।

কি হয়েছে আমাকে বল মণিকা।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তো সব কথা বলতে পারবো না—মণিকা বললে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা বড় রাস্তায় এলো। বড় রাস্তার উপরেই একটা রেস্টুরেন্ট ছিল—কঙ্কণ সেই রেস্টুরেন্টেই বসতে চেয়েছিল কিন্তু মণিকা বললে, না, এখানে নয়—

হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে দু'জনে ঢাকুরিয়ার রেললাইন ক্রশ করে লেকের দিকে চলল বাঁয়ে মোড় নিয়ে।

বেলা তখন সাড়ে দশটা এগারটা হবে।

দু'জনেই এসে লেকের মধ্যে একটা বেঞ্চে বসলো। ঐ সময়টা লেকটা প্রায় নির্জন থাকে। লোকজন বড় একটা দেখা যায় না।

লেকের জলে এদিকে-ওদিকে কিছু লোক স্নান করছে। ঝিরঝির করে হাওয়া বইছিল।

মণিকা বললে, অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হলো।

হ্যাঁ—তা তিন বছরের মত হবে। আমাদের চাকরিতে ছুটি অবশ্যি মেলে—কিন্তু আমি ছুটি নিইনি—

কেন ?

আমি চাকরিতে জয়েন করবার পর যখন কোচিনে ট্রেনিং-এ আছি—মা মারা গেলেন—

আপনার মা মারা গেছেন ?

হ্যাঁ প্রায় তিন বছর হলো।

মণিকা কোন কথা বললো না।

তুমি ত জান, কঙ্কণ বলতে লাগলো, মা ছাড়া আর ত কেউ আপনার জন ছিল না। বারাসাতে মামাদের ওখানেই থাকতাম—মা মারা যাওয়ায় বাড়ির টানও আমার চলে গেল। কিন্তু আমার কথা থাক। তুমি চন্দনার কথা বলো।

কি বলবো, দিদির কথা জানি না।

কেন ? ওকথা বলছো কেন ?

দিদি বাড়ি ছেড়ে প্রায় মাস দুই হলো চলে গিয়েছে।

কোথায় ?

তা ঠিক বলতে পারবো না !

কেন ? জান না ?

জানি, তবে—

কি তবে ?

সঠিকভাবে জানি না—তবে আমাদের দৃঢ় ধারণা—দিদি এক ভদ্রলোকের কাছে আছে।

কে সে ?

শুনেছি একজন বড় মানে ধনী লোক। আপনি শুনলে হয়ত অবাক হবেন—দিদির চাইতে বয়েসে তিনি অন্ততঃ চব্বিশ-পঁচিশ বছরের বড় ত হবেনই।

তার সঙ্গে—

আমি ওর বেশী কিছু জানি না কঙ্কণদা।

কোথায় থাকেন ভদ্রলোক ? কি নাম ?

আপনি শিল্পপতি সনৎ ভট্টাচার্যের নাম শুনেছেন ? এস. এন. বলেই লোকে তাঁকে জানে।

নামটা আমার অপরিচিত নয়—অনেক ব্যবসার মালিক ভদ্রলোক। কিন্তু তাঁর সঙ্গে চন্দনার আলাপ হলো কি করে ?

সুবিমলদার কাছে শুনেছি কোন এক গানের জলসায়।

কঙ্কণ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো, তারপর বললে, সে আসে না ?

না। সেও আসে না—আমরাও যাই না। তার সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই।

আরো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকে কঙ্কণ উঠে দাঁড়াল, চলি মণিকা—

মণিকাও ঐ সঙ্গে উঠে পড়ে। তারপর কঙ্কণদার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, চলে যাচ্ছেন কঙ্কণদা। দিদির সঙ্গে দেখা করবেন না। খুব সম্ভবতঃ দিদি এস. এন.-এর অফিসের চারতলায় থাকে।

কঙ্কণ প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে বললে, না। আমি যদি জানতাম এর মধ্যে ঐ রকম একটা কিছু ঘটে গিয়েছে, বোম্বাই থেকে এত দূর ছুটে এসে মিথ্যে হয়রানি হতে হতো না।

আমার কিন্তু মনে হয় কঙ্কণদা—

কি মণিকা ?

আপনার সঙ্গে দিদির একটিবার দেখা হলে—

না মণিকা, দেখা বোধহয় আমাদের আর না হওয়াই ভাল। আমি ত চিনি তাকে। হুট্ করে একটা কিছু করবার মেয়ে সে নয়।

কিন্তু—

না মণিকা এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই। আমার কেবল মনে হচ্ছে এমন একটা ঘটনা ঘটলো কি করে ? যাক, চলি।

আপনি কি আবার আজই বোম্বাইয়ে ফিরে যাবেন ?

হ্যাঁ, যদি ইভনিং ফ্লাইটে একটা সিট পাই, কথাগুলো বলে কঙ্কণ আর দাঁড়াল না, এগিয়ে গেল।

যতক্ষণ কঙ্কণকে দেখা গেল মণিকা তার গমনপথের দিকেই তাকিয়ে রইলো এবং এক সময় কঙ্কণ অদৃশ্য হয়ে গেল তার দৃষ্টি থেকে।

আর কেউ না জানুক মণিকা জানত ঐ কঙ্কণদা তার দিদি চন্দনাকে ভালবাসতো। একই কলেজে দু'জনে একত্রে আই. এ. পর্যন্ত পড়েছে। আই. এ. পাস করবার পর চন্দনা আর পড়াশুনা করলো না, গান-বাজনা নিয়ে মেতে উঠলো। কঙ্কণ দত্ত বি. এ. পাস করে পড়া শেষ করে। কঙ্কণ প্রায়ই আসতো তাদের বাড়িতে। দু'জনে বসে বসে গল্প করত, মণিকা বুঝতে পারত চন্দনার উপরে তার একটা দুর্বলতা আছে। চন্দনার সে রকম কোন দুর্বলতা কঙ্কণের প্রতি না থাকলেও তার প্রতি যে একটা প্রশ্রয় আছে সেটা কিন্তু অস্পষ্ট ছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন কঙ্কণ বি. এ. পাস করার পর আর এলো না। কেন এলো না তা অবশ্যি জানে না মণিকা। দিদির সঙ্গে কোন দিন সে সম্পর্কে তার কখনো কোন কথা হয় নি। কঙ্কণদা যে তার দিদিকে চিঠি লিখেছে তাও এতদিন জানত না মণিকা, আজই প্রথম শুনলো সে কথাটা। দিদিও কখনো কোন চিঠির কথা বলে নি, বা দিদিকে কখনো কোন চিঠি লিখতে সে দেখে নি।

দিদি ত কখনো কোন কথা তার কাছে গোপন করত না। চিঠি

লিখলে কি সে জানতে পারত না। কঙ্কণদা যে ইণ্ডিয়ান নেভিতে ঢুকেছে তাও সে আজই প্রথম জানতে পারল। মণিকা যেখানে যাবে বলে বের হয়েছিল সেখানে আর গেল না, বাড়িমুখো আবার হাঁটতে লাগল।

খুব ইচ্ছা করে একবার দিদির সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু বাবা-মা হয়ত ব্যাপারটা পছন্দ করবেন না ভেবে মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রেখেছে।

মণিকা জানে না, চন্দনা কিন্তু কঙ্কণের দ্বিতীয় চিঠিটার জবাব দিয়েছিল। কঙ্কণ হাঁটতে হাঁটতে সেই চিঠিটার কথাই ভাবছিল।

চন্দনা লিখেছিল, তোমার চিঠির কি জবাব দেবো জানি না। কারণ তুমি যে প্রস্তাব করেছো, সে রকম কোন তাগিদ আজ পর্যন্ত আমার দিক থেকে কখনো কিছু অনুভব করি নি। এ কথা অস্বীকার করবো না, তোমাকে আমার ভাল লাগে। কিন্তু সে ভাল লাগাটা এমন কিছু নয় যে তোমার প্রয়োজন আমার কাছে বিশেষ হয়ে উঠবে। দুঃখ করো না কঙ্কণ, তোমাকে আঘাত দেবার এতটুকু ইচ্ছাও ছিল না, আমার দিক থেকে অকপট সত্যটাই কেবল প্রকাশ করলাম। তবে একটা কথা বলতে পারি, যদি এমন কোন দিন মনে হয়, তোমাকে দেবার মত আমার কিছু আছে, নিশ্চয়ই সেদিন তুমি জানতে পারবে।

—ইতি চন্দনা।

চিঠিটা কঙ্কণ আজো সযত্নে রেখে দিয়েছে। এখনো মধ্যে মধ্যে চিঠিটা পড়ে। ঐ চিঠি পাবার পর আরো একটা চিঠি কঙ্কণ চন্দনাকে লিখেছিল কিন্তু তার কোন জবাব পায় নি।

সেও ত আজ প্রায় তিন বৎসর হয়ে গেল।

তবু কেন আজ সে চন্দনার সঙ্গে একটিবার দেখা করবার জন্য সুদূর বোম্বাই থেকে ছুটে এসেছিল। কঙ্কণ একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা গেল ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের অফিসে।

পেয়ে গেল একটা সীট।

এয়ার লাইন্সের অফিস থেকে কঙ্কণ ফিরে এলো হোটেলে। এখনো

কয়েক ঘণ্টা হাতে সময় আছে। চন্দনার চিঠি পাবার পর যে চিঠিটা কঙ্কণ তাকে লিখেছিল তাতে সে কেবল একটি কথাই জানিয়েছিল।

চন্দনা,

আমি কিন্তু তথাপি অপেক্ষা করবো।

অপেক্ষা করেই থাকবো। আমার ভালবাসা যদি মিথ্যা না হয়, একদিন তোমাকে আমার ডাকে সাড়া দিতেই হবে। সাড়া তুমি দেবে।

—ইতি কঙ্কণ।

সে চিঠির জবাব কঙ্কণ পায় নি।

তবু যেন তার মন বলেছে, আজ চন্দনা সাড়া দিক না দিক, একদিন না একদিন সে সাড়া দেবেই।

তার পরের দিন সপ্তাহ মাসগুলো সেই সাড়া পাবার প্রতীক্ষাতেই কেটেছে তার। কিন্তু আজ যে সংবাদ একটু আগে মণিকার মুখ থেকে সে শুনে এলো তার পরও কি তার প্রতীক্ষা চলবে! এস. এন.-এর অফিস বিল্ডিংটা ত এই হোটেল থেকে বেশী দূর নয়, পায়ে হেঁটেই সে অনায়াসে সেখানে চলে যেতে পারে।

যদি একটিবার সে যায়ই সেখানে। গিয়ে যদি বলে, চন্দনা, আবার আমি এসেছি, তুমি ফিরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও এসেছি।

মনে মনে হাসল কঙ্কণ, এ কি সে পাগলের মত আবোল-তাবোল ভাবছে। চন্দনা ত তার জীবন থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে আজ।

কিন্তু কেন এমনটা করল চন্দনা।

লোকটা ত যতদূর জানে সে প্রৌঢ়—

না—কোন জবাবই যেন সে পায় না। সেদিন সত্যিই খুঁজে পায় নি কোন জবাব—কিন্তু আরো পাঁচ বৎসর বাদে সে যখন কলকাতায় আবার এসেছিল এবং ঘটনাচক্রে চন্দনার দেখা পেয়েছিল—কিন্তু সে ত আরো অনেক পরের কথা।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে মণিকা বিভাবতীকে বললে, জান মা—কঙ্কণদার সঙ্গে দেখা হলো আজ হঠাৎ—

কঙ্কণ—

মনে নেই তোমার সেই যে কঙ্কণ দত্ত—এক সময় দিদির ক্লাসমেট ছিল, এখানে মধ্যে মধ্যে আসতো—

বিভাবতী কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না।

মণিকাই আবার বললে, কঙ্কণদা দিদিকে ভালবাসতো, কঙ্কণদা ইণ্ডিয়ান নেভিতে ঢুকেছে—দিদির সঙ্গে দেখা করবার জন্যই এখানে আসছিল।

বিভাবতী চমকে যেন মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

মণিকা বললে আমার মুখে দিদির কথা শুনে ফিরে গেলেন।

অকস্মাৎ বিভাবতীর দু'চোখের পাতা জলে ভরে আসে। কি করল হতভাগীটা। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারল। এর চেয়ে যদি এই কলোনীরই একটা ছেলেকে বিয়ে করত। সত্যি কিছুতেই যেন কোন সান্ত্বনা খুঁজে পান না বিভাবতী। ভুলতে যেন কিছুতেই পারেন না কথাটা।

মা—

কি ?

দিদির চিঠির একটা জবাব দেবে না ?

বিভাবতী বললেন, না।

মাত্র দিন চারেক আগে চন্দনা একটা চিঠি দিয়েছে।

চিঠিটা খুলে পড়েনও নি বিভাবতী।

কেবল নিঃশব্দে স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন চিঠিটা। অমলেন্দু হাতে করে বলেছিলেন কার চিঠি ?

কেন খামের উপরে হাতের লেখা দেখে বুঝতে পারছো না কার চিঠি।

বুঝতে ঠিকই পেরেছিলেন অমলেন্দু—হাতের লেখা ঠিকানা দেখেই বুঝেছিলেন কে লিখেছে চিঠিটা। তবু প্রশ্নটা করলেন। চিঠিটা স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিলেন বিভাবতী—পশ্চাৎ থেকে অমলেন্দু ডাকলেন চিঠিটা পড়েছো ?

না।

পড়বে না চিঠিটা ?

না।

বিভাবতী—অন্যায় যদি সে একটা করেই থাকে—সে তোমারই সন্তান।

না। তাকে আমি কোন দিনই ক্ষমা করতে পারবো না। আমার সন্তান বলেই তাকে ক্ষমা করা আমার পক্ষে আরো বেশী করে অসম্ভব।

পারবে না ?

না।

বিভাবতী, অমলেন্দু বললেন, একতরফা বিচারটা করা কি ভাল ?

একতরফা বিচার আমি করি নি। আমি যখনই ভাবি, সে আমারই মেয়ে—আমিই তাকে একদিন পেটে ধরেছিলাম, আমার সমস্ত দেহটা যেন ঘিন-ঘিন করে ওঠে। তুমি বুঝবে না—কেবল কতকগুলো টাকার জন্য যে মায়ের মেয়ে অসংকোচে বেশ্যাবৃত্তি করতে পারে—

বিভা, মেয়ে তোমার বেশ্যাবৃত্তি করছে এমন কথাটা মা হয়ে তুমি উচ্চারণ করতে পারলে কি করে—কেমন করে তুমি বলতে পারলে চুনী বেশ্যাবৃত্তি করছে—

তাই ত সে করছে—

হয়ত তা নাও হতে পারে বিভা।

তবে কি তুমি বলতে চাও—প্রেম-ভালবাসা। একটা বুড়োর জন্য সে ঘর ছেড়ে গিয়েছে ?

বলতে আমি কিছুই চাই না, আমি কেমন করে ভুলবো—বাপ হয়ে বয়েসের বিবাহ-যুগ্যি মেয়েকে একটা সৎপাত্রের হাতে দিতে পারি নি।

তাই বলে সে বেশ্যা হয়ে যাবে। এর চাইতে সে যদি একটা অল্প বয়েসের ভিক্ষুকের হাত ধরেও ঘর থেকে বের হয়ে যেতো এতটা আঘাত আমার লাগত না। না তার নাম আমার কাছে তুমি উচ্চারণও করো না।

কথাগুলো বলে বিভাবতী আর দাঁড়ান নি, কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

অতঃপর অনেকক্ষণ অমলেন্দু মুখ আঁটা খামের চিঠিটা হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেয়েটাকে সত্যিই অমলেন্দু যেন ভুলতে পারছিলেন না।

যে অপবাদ দিয়ে এই মাত্র তাঁর স্ত্রী বিভাবতী ঘর ছেড়ে চলে গেলেন সেই অপবাদ নিয়ে মেয়েটাকে তিনি যেন কোন মতেই মন থেকে বর্জন করতে পারছিলেন না।

কিন্তু মুখ ফুটে কিছু যেন বলতেও পারছিলেন না।

এক সময়ে খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলেন।

চুনীই লিখেছে, এবং চিঠিটা লিখেছে তাকেই—তার মাকে নয়।

বাবা,

জানি—তোমরা আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না, কিন্তু বিশ্বাস করো আমি কোন অন্যায় বা পাপের পথ গ্রহণ করি নি। সনৎকে আমি ভালবেসেই ঘর ছেড়ে চলে এসেছি, সে আমার নারী জীবনের প্রথম পুরুষ। তাকে প্রথম দেখেই সেটা আমি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। সেই উপলব্ধির কাছে তার বয়সটা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

সে আমাকে স্ত্রী বলেই গ্রহণ করেছে।

আমিও আমার স্বামী বলেই তাকে গ্রহণ করেছি সব কিছু জেনে শুনেই। কি মন্ত্র পড়া হলো বা আদৌ কোন মন্ত্র পড়া হলো কি না সে নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি. মায়ের মন্দিরে মায়ের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে সে আমার গলায় মালা দিয়েছে—সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে।

মা কালীকে সামনে রেখে আমরা পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করেছি, কোন সঙ্কোচ, কোন দ্বিধা বা কোন গ্লানি নেই আমাদের মধ্যে।

কথাটা তোমাদের জানানো প্রয়োজন বলেই জানালাম।

যদি ক্ষমা করতে পারো ত গিয়ে প্রণাম করে আসবো আমরা।

—ইতি চন্দনা।

চন্দনার চিঠিটা বার তিনেক পড়লেন অমলেন্দু। আর মনে মনে বার বার বলতে লাগলেন, ক্ষমা করেছি মা আমি তোকে, আর কেউ ক্ষমা না করলেও আমি তোকে ক্ষমা করেছি মা।

চিঠিটা তাঁর নিত্য যে বইটি তিনি পড়েন শ্রীমদ্‌ভাগবৎ গীতা তাঁরই মধ্যে গুঁজে রেখে দিলেন।

ইচ্ছা হয়েছিল চন্দনার চিঠিটার জবাব দেন, কিন্তু বিভাবতীর কথা ভেবে সে লোভ তিনি সংবরণ করলেন।

দিন সপ্তাহ মাস কেটে বৎসরও ঘুরতে চলল।

বাড়িতে চন্দনার কথা আর কেউ বলে না।

পাড়ার সকলেও বুঝি চন্দনা নামের মেয়েটাকে ক্রমশ একটু একটু করে ভুলে যায়। এদিকে সংসারের স্বচ্ছলতা যেন একটু একটু করে কমে আসছিল।

বিমান কোন দিনই সংসারে কিছু দেয় না।

নিজে যা আয় করতেন—তাতেও সংসার চালান দুষ্কর। চন্দনা গান গেয়ে মোটামুটি যা উপার্জন করতো তার সবটাই প্রায় সামান্য কিছু হাতখরচা রেখে চন্দনা মায়ের হাতে তুলে দিত—তাতে করে খুব স্বচ্ছল ভাবে না হলেও সংসারটা চালিয়ে নিতেন বিভাবতী।

চন্দনা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর সেই আয়ের পথটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চারিদিক থেকে অভাবটা যেন কেমন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

অনোন্যোপায় বিভাবতী ছেলে বিমানকে কথাটা বললেন—কিন্তু বিমানের স্পষ্ট জবাব, আমি যা পাই তাতে আমারই চলে না, সংসারে কোথা থেকে দেবো।

এত দিন না দিলেও চালিয়ে নিয়েছি, বিভাবতী বললেন, কিন্তু আর পারা যাচ্ছে না বলেই তোকে বলতে হচ্ছে খোকা।

বিমান বললে, না।

কি না।

কোন সাহায্যে করতে পারবো না।

বিভাবতী যা কোন দিন বলেন নি, আজ তাই বললেন, কেন? দিবিই বা না কেন, তোর জন্য এ সংসারে কি টাকা লাগে না? রোজগার করিস অথচ একটা পয়সা দিবি না।

খাই ত একবেলা—তাও যা খাওয়াও গরু ছাগলেও তা খায় না। খানিকটা ভাত, একটা তরিতরকারির ঘ্যাট—জলের মত পাতলা ডাল।

তাতেও খরচ লাগে, সেও বিনি পয়সায় আসে না মনে রাখিস।

ঠিক আছে—তাও আমি খাবো না, আমি আলাদা হয়ে যাবো।

তাই গেলেই পারিস।

যাবো, যাবো। শিগ্‌গিরী যাবো।

বিমান সেদিন কিছু না খেয়েই বের হয়ে গেল কাজে।

মণিকা আড়াল থেকে মা ও দাদার কথা সব শুনেছিল, সে বললে, দাদা যে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করছে মা—

বিয়ে করছে কাকে!

হ্যাঁ—মা—তুমি জান না! সেই যে মিল্ক ডিপোর মেয়েটা—মাধুরী মণ্ডল।

কি বলছিস মণিকা, বড়্যির ছেলে একটা ছোট জাতের মেয়েকে বিয়ে করবে?

তুমি থাম ত মা, ছোট জাত, আজকাল আবার ওসব কেউ কিছু মানে নাকি। ও জাত-টাত আজকাল আর কেউ মানে না।

এবং মণিকার কথাটা যে মিথ্যা নয় দিন-কয়েক পরেই তা প্রমাণিত হলো, দিন-চারেক বাদে এক সকালে বের হয়ে পরের দিন সকালে বিমান মাধুরীর হাত ধরে বাড়িতে এসে ঢুকল।

বললে, মাধুরীকে আমি বিয়ে করেছি মা—কাল রেজিস্ট্রি করে, আমার বৌ! মাধুরী মাকে প্রণাম করো।

মাধুরী প্রণাম করবার জন্য এগুচ্ছিল, বিভাবতী বাধা দিলেন থাক-থাক।

বিমান বললে, আমি যাদবপুরে ঘর নিয়েছি সেখানেই চলে যাচ্ছি।

মণিকা আর শমিতা দু'জনেই সেখানে দাঁড়িয়েছিল, মণিকা কোন কথা না বললেও শমিতা বললে, সত্যি, তোমাকে একটা ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না, দাদা—বৌকে নিয়ে যে এ-সংসারে শেষ পর্যন্ত ফ্রি লজিং ও ফ্রি ফুডিংয়ের ব্যবস্থা করো নি—একত্রে দুজনার—

মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস না শমি, এক চড়ে মাথাটা ঘুরিয়ে দেবো।

কেন বল ত? দাদার অধিকারটা এসটাব্লিস্ করবার জন্য।

যেমন চুনী—তেমনিই ত হবি, একজন যখন বেশ্যাবৃত্তি করছে—

খোকা—চিৎকার করে উঠলেন বিভাবতী হঠাৎ।

বিমান বললে, সত্যি কথা বলতে বিমান রায় ভয় পায় না। লজ্জায় ঘেন্নায় কারো সামনে পর্যন্ত যেতে পারি না।

শমিতা বললে, তাই বুঝি রাত থাকতে উঠে দুধের বোতল হাতে মিল্ক ডিপোতে ছুটতে—যার সামনে বেরুতে পারতে একমাত্র তাঁর সামনে।

শমি!

চোখ রাঙাতে হয় অন্যত্র রাঙিয়ো—এখানে নয়।

হারামজাদী জুতিয়ে মুখ থেঁতলে দেবো—চেঁচিয়ে উঠলো বিমান।

ক' জোড়া জুতো দিয়েছে তোমার বৌ! মনে রেখো এটা মিল্ক ডিপো নয়—ভদ্র গৃহস্থবাড়ি।

উঃ কি আমার ভদ্র গৃহস্থ রে, যে বাড়ির মেয়ে—

বিভাবতী আর চুপ করে থাকতে পারল না, বললেন—বের হয়ে যা এখান থেকে।

যাচ্ছি, যাচ্ছি। দাঁড়াও মাধুরী—আমার সুটকেশটা নিয়ে আসি। কথাগুলো বলে বিমান ঘরের মধ্যে চলে গেল।

বিভাবতী আর মণিকা শমিতাও সেখানে দাঁড়াল না, একা মাধুরী দাঁড়িয়ে রইলো।

ঠিক সেই সময় অমলেন্দু বাজারের থলিটা হাতে এনে বাড়িতে প্রবেশ করলেন, মাধুরীকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন—কে তুমি ?

আমি মানে—মাধুরী আমতা আমতা করে, ঐ সময় বিমান সুটকেশটা হাতে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

সে-ই জবাবটা দিল -- ও আমার স্ত্রী, মাধুরী।

তোমার স্ত্রী ?

হ্যাঁ—এসো মাধুরী।

দুজনে দরজার দিকে এগুচ্ছিল অমলেন্দু বললেন, দাঁড়াও একটা কথা শুনে যাও, ভবিষ্যতে এ বাড়ির চৌকাঠ আর কখনো মাড়াবার চেষ্টা করবে না।

সে আপনি কথাটা কষ্ট করে না বললেও আমি আর আসতাম না। চল মাধুরী—বিমান মাধুরীর একটা হাত এক হাতে ধরে অন্য হাতে সুটকেশটা ঝুলিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

অমলেন্দুর মাথাটা যেন সহসা কেমন ঘুরে ওঠে। তিনি টলে পড়ে যাচ্ছিলেন বিভাবতী এসে তাড়াতাড়ি দুহাতে স্বামীকে জাপটে ধরলেন, কিন্তু সামলাতে পারলেন না। দুজনেই পড়ে গেলেন, বিভাবতী চিৎকার করে উঠলেন, মণি—শমি—ওরে শীগ্‌গিরি আয়।

বিমান আর মাধুরী তখনো বেশী দূর যায় নি—বিভাবতীর চিৎকারটা তাদের কানে গিয়েছিল, মাধুরী থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, কি হলো ?

ও কিছু না—চল।

কিন্তু মা যেন চিৎকার করে উঠলেন,—মাধুরী বললে।

করুক তুমি এসো।

বিমান হন হন করে মাধুরীর একটা হাত ধরে এগিয়ে গেল।

মণিকা আর শমিতা অচৈতন্য অমলেন্দুকে কোনমতে ধরাধরি করতে করতে শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

মণিকা বললে, শমি তুই ছুটে যা ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।

শমিতা বের হয়ে গেল যেমন ছিল তেমনি।

বিভাবতী কাঁদছিলেন।

বড় রাস্তার মোড় থেকে সাধনা ডিসপেনসারির ভবতোষ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলো।

ভবতোষ ঐ কলোনীতেই থাকেন। বয়স হয়েছে। কিন্তু বিচক্ষণ চিকিৎসক। এসে অমলেন্দুকে পরীক্ষা করে বললেন, এটা স্ট্রোক বলেই মনে হচ্ছে।

একটা ইনজেক্‌শন দিয়ে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা দিয়ে বললেন, মনে হয় ও'কে হাসপাতালে রিমুভ করাই ভাল—

মণিকা বললে, হাসপাতালে!

হ্যাঁ মণিকা, হাসপাতালে ছাড়া চিকিৎসা ঠিক হবে না।—ভবতোষ বললেন।

ঠিক সেই সময় চন্দনা এসে ঘরে ঢুকল।

মণিকা চন্দনাকে দেখে চিৎকার করে ওঠে, দিদি—বাবা—

চন্দনা ঘরে ঢুকেই একবার বিভাবতীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু বিভাবতী মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন বটে কিন্তু কেন জানি না দু'চোখের দৃষ্টি সহসা জলে ঝাপসা হয়ে যায়।

মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দনা বললে, কি হয়েছে রে মণি।

চন্দনা যেন এত দিন ঐ বাড়িতেই ছিল, মাঝখানে যে প্রায় একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে সেরকম কিছুই বোঝা গেল না। চন্দনার ব্যবহার ও কাথাবার্তার মধ্যে যেন কোন সংকোচই ছিল না।

বাবা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

ডাঃ ভবতোষ চন্দনার মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। চন্দনা যে ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে তা তিনি জানতেন কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা জানতেন না।

এবার ভবতোষই চন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে তোমার বাবার চন্দনা।

স্ট্রোক !

হ্যাঁ, কোন হাসপাতালে এখুনি রিমুভ করতে পারলে ভাল হতো।

চন্দনা বললে, আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করুন ডাক্তারবাবু, হাসপাতাল বা নার্সিংহোম যেখানে বাবাকে রিমুভ করলে ভাল হয় সেই ব্যবস্থাই করুন।

নার্সিংহোম—সে ত অনেক টাকার ব্যাপার চন্দনা !

টাকার কথা চিন্তা করবেন না। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দেখি তাহলে অ্যামবুলেন্সকে খবর দিই।

হ্যাঁ, যা করবার তাড়াতাড়ি করুন ডাক্তারবাবু।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে অ্যামবুলেন্স এসে গেল—স্ট্রেচারে ধরাধরি করে অমলেন্দুকে অ্যামবুলেন্সে তোলা হলো।

ডাক্তারবাবু—

কিছু বলছো চন্দনা ?

আমার সঙ্গে গাড়ি আছে—চলুন আপনি আমার গাড়িতে। তার পরই মণিকার দিকে তাকিয়ে চন্দনা বললে, মণি, শোন—

কি বলছো ?

দাদার কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না—

দাদা ত কিছুক্ষণ আগেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে তার বৌ নিয়ে।

বৌ !

হ্যাঁ—সেই মিল্ক ডিপোর মাধুরী মণ্ডলকে দাদা বিয়ে করেছে।

টাকা পয়সা মার কাছে কি আছে জানি না—তুই এই হাজার টাকা রাখ—বলতে বলতে ব্যাগ থেকে একশ টাকার দশখানা নোট বের করে মণিকার হাতে গুঁজে দিল এবং বললে বাবার চিকিৎসার জন্য ভাবিস না আমি সব ব্যবস্থা করবো। এই নে এই কার্ডে যে ফোন নাম্বারটা আছে, দরকার হলে ঐ ফোন নাম্বারে আমাকে ডাকিস। চলি—

মার সঙ্গে কথা বলবি না ?

বিভাবতী তখন ঐ ঘরে ছিলেন না।

চন্দনা বললে, না! মার মনে তাতে কষ্টই হবে।

কিন্তু দিদি—

চলি রে, দুপুরের দিকে ফোন করিস—জানতে পারবি বাবার কি ব্যবস্থা হলো।

চন্দনা আর দাঁড়ালো না ঘর ছেড়ে চলে গেল।

পাশের ঘরে বিভাবতী চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন খোলা জানালাটার সামনে। আশ্চর্য যে মেয়ের মুখ দেখা দূরের কথা সহ্য করতে পারেন নি এতদিন, সেই মেয়ে যখন হঠাৎ আজ সামনে এসে দাঁড়াল, সমস্ত বুক জুড়ে যেন একটা হাহাকার জেগে উঠলো। কোনমতেই চোখের জল যেন রোধ করতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে এলেন।

মেয়ের সিঁথিতে ও কপালে ডগডগে সিন্দুর। পরনের দামী চওড়া পাড় শাড়ি, সিঁথেয় সিন্দুর, দু' হাতে ঝকঝকে সোনার চুড়ি ও শাঁখা—এ যেন তার পরিচিত চুনী নয়—এ যেন তাঁর সেই গর্ভের সন্তান-আদরের চুনী নয়—অন্য কেউ।

কই, মুখের দিকে তাকিয়ে ত কোন ঘৃণা জাগল না মনে!

একটিবারও ত মনে হলো না, ঐ চুনী কোন অন্যায় বা পাপ করেছে।

মা—

মণিকার ডাকে বিভাবতী ফিরে তাকালেন। তারপর ধীরকণ্ঠে বললেন, চলে গিয়েছে?

কার কথা বলছো?

ঐ যে—

হ্যাঁ। দিদি চলে গেল।

ঐ কালা মুখ দেখাতে লজ্জা করলো না?—বিভাবতী বললেন।

কিন্তু আজ ঐ সময় হঠাৎ দিদি না এলে কি করতাম আমরা বলতে পারো? ভাগ্যে এই সময় দিদি এসে পড়েছিল বলেই তো বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো একটা।

কোথায় নিয়ে গেল ওকে ?

জানি না। দিদিও তো গেল। ডাক্তারবাবুও সঙ্গে গিয়েছেন যেখানে ভাল ব্যবস্থা, সেখানেই বাবাকে ভর্তি করা হবে।

তোর শচীন কাকাকে একটা খবর দিলে হতো না ?—বিভাবতী বললেন।

শচীন রায়, অমলেন্দুরই ছোট ভাই।

হাইকোর্টের একজন নামকরা অ্যাডভোকেট। একদা অমলেন্দুই ঐ ভাইটাকে কলকাতায় রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে বিবাহও দিয়েছিলেন এবং সেই বিবাহের পরই শচীন পর হয়ে গেলেন। দাদার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আর রাখলেন না।

কিন্তু অমলেন্দু মধ্যে মধ্যে যেতেন ভাইয়ের কাছে। হাজার হোক, মায়ের পেটের ভাই তো। বলতেন অমলেন্দু, ও সম্পর্ক না রাখে না রাখুক, আমি তাই বলে কি ওকে ভুলতে পারি ?

কদাচিৎ কখনো আসতেন শচীন রায় দাদার বাড়িতে।

ছেলেমেয়েরা শচীন রায় এলে বিরক্ত হতো।

তারা কেউ ওদের কাকাকে দেখতে পারত না।

কেন ? শচীন কাকাকে খবর দিয়ে কি হবে ?—মণিকা বললে।

খবর একটা দিবি না ?

না। কোন প্রয়োজন নেই। ভাববে, বিপদে পড়ে তাকে সংবাদ দিতে গিয়েছি।

তা কেন ভাবতে যাবে রে ?—বিভাবতী বললেন।

তাই ভাববে, বড়লোক মানুষ। তা ছাড়া দিদিই যখন সব ব্যবস্থা করছে।

তা হলেও মায়ের আপন পেটের ভাই।

না। মায়ের পেটের ভাই—রেখেছে কোন সম্পর্ক আমাদের সঙ্গে ?

নিজের ছেলেই সমস্ত সম্পর্ক তুলে দিয়ে গেল, তা ও তো ভাই—বিভাবতী বললেন।

কাউকেই কোন খবর দেবার দরকার নেই আর—মণিকা বললে।

কিন্তু হাতে যে কিছুই নেই রে—মাসের শেষ।

এই নাও, দিদি হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছে—নোটগুলো এগিয়ে ধরল মণিকা।

বিভাবতীর দিক থেকে কিন্তু কোন আগ্রহই প্রকাশ পেল না।

কি হলো—নাও টাকাগুলো রাখো।

না।

নেবে না টাকা ?

না।

কেন দিদি দিয়েছে বলে ? কিন্তু কেন বল তো মা, আমাদের মত দুঃখী গরীবদের আবার ঐ আত্মসম্মানের বিড়ম্বনা কেন বলতে পারো ?

মণি !—অস্পষ্ট কণ্ঠে যেন একটা আর্তনাদ করে উঠলেন বিভাবতী।

এই টাকা না নেওয়া বা ফিরিয়ে দেবার অধিকারের কথা না হয় বাদই দিলাম—সামর্থ্যই কি আমাদের আছে বাবার চিকিৎসার যৎসামান্য একটা সুব্যবস্থা করার।

আমি তো তোকে ফিরিয়ে দিতে বলছি না—আমি—আমি ও ছুঁতে পারবো না—

কেন পারবে না শুনি ?

ও যে চুনীর শরীর বেচা টাকা। মা হয়ে আমাকে ও টাকা ছুঁতে বলিস না।

মা—চাপা কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো মণিকা।

বিভাবতী একেবারে কান্নায় যেন ভেঙ্গে পড়লেন। দীর্ঘ এক বৎসরের যে রুদ্ধ বেদনা তার বুকের মধ্যে অহরহ তাকে পীড়ন করেছে—আজ সহসা যেন সেই বেদনাটাই তার বুকটাকে ভেঙ্গে বাইরে বের হয়ে এলো।

মণিকা মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে না, কেবল বললে, কাঁদো কেন মা?

চুনী যে আমার বুকে কত বড়ঃশেল হেনেছে—কথাটা শেষ করতে পারলেন না বিভাবতী, কেবল অবিরল ধারায় চোখের জল তাঁর গণ্ড ও চিবুক ভাসিয়ে দিতে লাগল।

পোড়ারমুখী এ যে কি করে বসল!

দিদিকে ত তুমি জান না মা—মণিকা বললে, ছোট—নোংরা কাজ কখনো দিদি করে নি। তাই মনে হয় যা সে করেছে, তা সে ভালই করুক বা মন্দই করুক, বাবার চিকিৎসার জন্য যা সে করছে—আমাদের সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি বল?

মণি, তোদের যা খুশী কর, আমাকে তোরা অনুরোধ করিস না ঐ টাকায় ভাত খেতে।

বেশ। তাই হবে—আমি টিউশনী করে যা সামান্য পাই, তোমার দু'বেলা দু'মুঠো ভাত তাতেই হয়ে যাবে।

বিভাবতীর মনের দুঃখটা বুঝেই কথাগুলো বললে মণিকা।

শমিতা এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি, সে এবারে বললে, মা আমরা যেমন তোমার মেয়ে, সেও ত তেমনি তোমারই গর্ভের সন্তান—তুমি কি কিছুতেই তাকে ক্ষমা করতে পারো না?

বিভাবতী ছোট মেয়ের কথার কোন জবাব দিলেন না। ছোট মেয়ের মুখের দিকেও তাকালেন না—ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেলেন।

* * কোন হাসপাতালে কেবিন পাওয়া যায় নি—অবশেষে ভবতোষ ডাক্তারই চেষ্টা করে একটা নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিলেন অমলেন্দুকে এবং শহরের নামকরা চিকিৎসক ডাঃ যোগেশ ব্যানার্জীকে কল দিয়ে আনলেন। এবং ডাক্তার ব্যানার্জী এসে চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবার পর চন্দনাকে বললেন, এবার আমি তাহলে চলি চন্দনা।

চন্দনা কয়েকটা নোট তার হাতব্যাগ থেকে বের করে ভবতোষ ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তারবাবু আপনার ফীস ত আমি জানি না, এটা আপনি রাখুন—অন্ততঃ একবার করে আপনি এসে বাবাকে দেখে যাবেন কিন্তু—

আসবো চন্দনা, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

চন্দনা আধ ঘণ্টার জন্য বাড়ি গিয়ে আবার নার্সিং হোমে ফিরে এলো। সনৎ কলকাতায় নেই—কাজে দিল্লী গিয়েছেন। আসার সময় চন্দনা বঙ্কিমকে বলে এলো, তাকে যদি তার বোনেরা কেউ ফোন করে বঙ্কিম যেন নার্সিং হোমের কথা বলে দেয়।

বঙ্কিম বললে, গাড়ি ছেড়ো না মা—মহাবীর সিংকে গাড়ি নিয়ে থাকতে বলো। বঙ্কিম অনেকদিন হলো চন্দনাকে মা বলে ডাকে—'দিদিমণি' বলে ডাকে না আর, চন্দনা তাকে 'দিদিমণি' বলে ডাকতে বলা সত্ত্বেও।

বঙ্কিম বলেছিল, না—আমি তোমাকে মা বলেই ডাকবো মা—আমাকে তুমি বাধা দিও না।

চন্দনা বলেছিল, কেন বঙ্কিম ?

কেন তা জানি না মা। তবে তোমাকে 'মা' বলে ডেকে যতটা আনন্দ পাই —দিদিমণি বলে ডাকলে সে আনন্দ পাই না মা। তুমি আমায় মানা করো না মা।

চন্দনা বঙ্কিমের মুখের দিকে তাকিয়ে কি জানি কেন আর বাধা দিতে পারে নি।

রাগ করলে না ত মা ?

না বঙ্কিম।

সত্যি বলছো ত মা ?

সত্যিই বলছি।

বঙ্কিমকে সব কথা জানিয়েই চন্দনা আবার নার্সিং হোমে ফিরে গেল।

বঙ্কিম চারটি মুখে দিয়ে যাবার জন্য বলেছিল কিন্তু চন্দনা তার কথায় কর্ণপাত করে নি। সমস্ত মনটা তার পড়েছিল নার্সিং হোমেই।

অমলেন্দুর জ্ঞান এখনো ফেরে নি।

বঙ্কিম শুধিয়েছিল, কখন ফিরবে মা ?

তা তা জানি না—ঠিক বলতে পারছি না। আমাদের বাড়ি থেকে যদি কেউ ফোন করে ত নার্সিং হোমের কথা বলে দিও—৮৪নং ঘর, চারতালায়। আমিও রিসেপসন কাউণ্টারে বলে রাখব।

লিফট্ করে চারতলায় উঠে চন্দনা সোজা ৮৪নং ঘরে গেল। জ্ঞান তখনো ফেরে নি অমলেন্দুর। ডাঃ যোগেশ ব্যানার্জী বলে গিয়েছেন আবার রাত আটটা নাগাদ আসবেন রোগীকে দেখতে।

রাত্রে ও দিনে স্পেশাল নার্সের ব্যবস্থা করেছিল চন্দনা, একজন তরুণ ডাক্তার—ওখানকারই হাউস স্টাফ সর্বক্ষণ দেখছিল অমলেন্দুকে।

অসাড়ের মত পড়ে আছেন অমলেন্দু। অক্সিজেন ও ড্রিপ চলেছে।

হাউস স্টাফটির নাম বারীন দত্ত।

কেমন আছেন উনি ডাঃ দত্ত ?

ফারদার ডিটোরিয়েট করে নি।—ডাঃ দত্ত বললে।

বাবা আমার ভাল হয়ে উঠবেন ত আবার ডাঃ দত্ত ?

মনে ত হয়।—ডাঃ দত্ত বললে।

বিকেল পাঁচটায় মণিকা ও শমিতা অমলেন্দুকে দেখতে এলো। বিভাবতী আসেন নি। বাইরের একটা বেঞ্চেই বসেছিল চন্দনা। মণিকা দিদিকে দেখে এগিয়ে এলো। দিদি, বাবা কেমন আছে ?

এখনো জ্ঞান ফেরে নি মণি। মা এলো না ?

না। মা এলো না।

চন্দনা বললে, আমি থাকলে এখানে বোধ হয় মা আসবে না, তাই না মণি ?—চন্দনা বললে।

তা কেন ?

আমি জানি—তুমি—শমিতার দিকে তাকিয়ে ডাকলো চন্দনা বোনকে।

কিছু বলছো দিদি ?

তুই যা একটা ট্যাকসি করে মাকে নিয়ে আয় - বলে ব্যাগ খুলে কুড়িটা টাকা বের করে চন্দনা শমিতার হাতে দিল—তুই মাকে নিয়ে আসবার আগেই আমি চলে যাবো। তারপর রাত আটটার পর আমি আবার আসবো।

বাবা কেমন আছেন দিদি ? বাবা ভাল হবেন তো ?

নিশ্চয়ই হবেন।—চন্দনা বললে।

নার্সিং হোমে আসার আগে মণিকা বিভাবতীকেও সঙ্গে আসতে বলেছিল কিন্তু সম্মত হন নি বিভাবতী।

সে কি মা ? তুমি একটিবার বাবাকে দেখতে যাবে না ?—মণিকাই বলেছিল মাকে তার।

তোরাই ত যাচ্ছিস।

আমরা যাচ্ছি বলে তুমি যাবে না ?

তোদের কাছেই ত সংবাদ পাবো তোরা ফিরে এলে।

মা, এখনো তুমি দিদিকে ক্ষমার চোখে দেখতে পারছো না।

বিভাবতী জবাবে কোন কথা বলেন নি। চুপ করে ছিলেন। মনের মধ্যে যে তাঁর কি হচ্ছিল তা তিনিই জানেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল চন্দনার মুখটা, বিভাবতীর মনটা যেন শক্ত, কঠিন হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল তাঁর মেয়েটা কত বড় নির্লজ্জ কেমন করে সে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করল না।

বিভাবতী অনেক কষ্টে মনকে শক্ত করেছিলেন। মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, যা তোরা যা। আর দেরী করিস না।

শমিতা চন্দনার নির্দেশে বিভাবতীকে যখন নিতে এলো বিভাবতী ঘরের মধ্যে চৌকিটার পরে চুপচাপ বসেছিলেন।

মা।

একি? এরই মধ্যে ফিরে এলি? কেমন আছেন তোদের বাবা? —বিভাবতীর গলার স্বরে উৎকণ্ঠা।

বাবার জ্ঞান এখনো ফেরে নি।

ফেরে নি জ্ঞান?

না। তাই দিদি বললে তোমাকে নিয়ে যেতে।

কি বলেছে সে?

তুমি যখন সেখানে যাবে তখন সে সেখানে থাকবে না। সে বুঝতে পেরেছে মা তুমি তার সামনে যেতে চাও না। চল মা, বাবাকে একবার দেখে আসবে চল। মা—

একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস রোধ করে বিভাবতী বললেন, চল।

শমিতা বিভাবতীকে নিয়ে যখন নার্সিং হোমে পৌছাল, চন্দনাকে কোথায়ও দেখা গেল না। সারাটা দিন চন্দনার স্নান আহার কিছুই হয় নি। সে ভাবলো স্নান করে আবার রাত আটটা নাগাদ আসবে। চন্দনা তাই চলে গিয়েছিল। মণিকাকে কেবল বলে গিয়েছিল, রাত্রি আটটার পর আবার সে আসবে।

ডাঃ দত্ত কিন্তু বিভাবতীকে একবারে রোগীর সামনে যেতে দিল না। দূর থেকে স্বামীকে একটিবার দেখে বিভাবতী ফিরে এলেন। তাঁর মাথাটা কেমন যেন ঘুরে ওঠে।

মণিকা পাশেই ছিল। মাকে ধরাধরি করে ইনটেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট থেকে বাইরে নিয়ে এলো। বেঞ্চিটার উপর বসিয়ে দিয়ে বললে, এখানে বোস মা।

বিভাবতীর দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

কাঁদছো কেন মা? বাবা নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে। কলকাতা শহরের সব চাইতে বড় ডাক্তার দেখছেন। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হচ্ছে না।

বিভাবতী মেয়ের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরেন।

মণিকা আবার বললে, দিদি হঠাৎ না এসে পড়লে কী যে হতো

ঐ সময় ডাঃ দত্ত বাইরে এলো। মিসেস ভট্টাচার্য কোথায়?

মণিকা বললে কেন? দিদি একটু বাইরে গিয়েছে।

রোগীর একটু একটু করে সেন্স ফিরে আসছে।—ডাঃ দত্ত বললে।

একবার গিয়ে দেখতে পারি?

না। এখন কেউ সামনে যাবেন না। কাল সকালে আসবেন। কথাগুলো বলে ডাঃ দত্ত ভিতরে চলে গেল।

মণিকা বললে, শমি, যা। মাকে বাড়িতে রেখে আয়।

বিভাবতী কোন কথা বললেন না।

চল মা—শমিতা ডাকল।

কেন, এখানে থাকতে দেবে না?

তুমি এখানে এখন থেকেই বা কী করবে?

থাকি না।—কেমন যেন করুণভাবে কথাটা বললেন বিভাবতী।

ঐ সময় ডাঃ দত্ত আবার বের, হয়ে এলো। মিস রায়, আপনারা ইচ্ছা করলে ঐ ওদিককার ঘরটা খালি আছে, ওখানে থাকতে পারেন।

বস্তুতঃ একটু আগে চন্দনা ফোন করেছিল, সেই ডাঃ দত্তকে অনুরোধ করেছিল ওদের থাকবার একটা ব্যবস্থা করতে।

মণিকা শমিতাকে একটু আড়ালে ডেকে যেন কি পরামর্শ করলে দুই বোনে। শমিতা বিভাবতীকে এসে বললে, মেজদি এখানে থাক মা। চল আমরা বাড়িতে ফিরে যাই। বাড়িতেও কেউ নেই। খালি পড়ে আছে।

মেয়ের কথায় বিভাবতী এবারে আর কোন আপত্তি করলেন না।

ঐ দিনই মাঝ রাতের দিকে অমলেন্দুর জ্ঞানটা ফিরে এলো বটে, তবে তখনো কথা স্পষ্ট নয়। কেমন যেন জড়ানো জড়ানো কথা।

বাঁ দিকটা, হাত পা পড়ে গিয়েছে। হেমিপ্লেজিয়া।

চন্দনা দুবেলা যায় নার্সিং হোমে। ফোনেও সর্বদা সংবাদ নেয়। দিন পাঁচেক কেটে গেল। অবস্থার অনেকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

কখনো মণিকা, কখনো শমিতা আসে নার্সিং হোমে। বিভাবতীও দিন দুই এলেন। সেদিন বিভাবতী এসে মাথার সামনে দাঁড়াতেই অমলেন্দু জড়িয়ে জড়িয়ে শুধালেন, এখানে এনেছো কেন? আমাকে—

বিভাবতী বললেন, বেশী কথা বলো না।

টাকা পয়সা—

ও সব কথা ভেবো না।

ভাববো না?

না।

বিভা—

বল।

তুমি ত সব জানো। সংসারই বা চলছে কেমন করে?

ওসব চিন্তা তোমাকে করতে হবে না।—বিভাবতী বললেন।

বিমান?

সে যে সেই চলে গিয়েছে, আর ত আসে নি।

আসে নি?

না।

আরো দিন দশেক বাদে। এখন মধ্যে মধ্যে শয্যার উপর ব্যাকরেস্টে হেলান দিয়ে বসতে পারেন অমলেন্দু।

কথা আরো স্পষ্ট হয়েছে।

নার্স ফলের রস খাওয়াচ্ছিল অমলেন্দুকে। পাশে বসে বিভাবতী। বেলা দশটা বাজে।

বিভা—

কি বলছো?

এবারে এখান থেকে আমাকে নিয়ে চলো।

কিন্তু ডাক্তার ব্যানার্জী বলেছেন, আরো মাস খানেক এখানে তোমাকে থাকতে হবে।

কি বলছো পাগলের মত বিভা। এখানকার খরচ—

খরচ ত তোমাকে করতে হচ্ছে না।

সে আমি কি জানি না? কিন্তু খরচাটা করছে কে? কোথা থেকে এ খরচ আসছে তাই ত জানতে চাই।

মণিকা এসে ঐ সময় ঘরে ঢুকলো।

বললে, কি হয়েছে?

তোর বাবা বলছে—এত খরচ—

সে জন্য তুমি ভেবো না বাবা।

ভাববো না? কিন্তু মা—

দিদি তোমার চিকিৎসা করাচ্ছে।

চুনী?

হ্যাঁ, দিদি। ভাগ্যে সে সেদিন এসে পড়েছিল।—সংক্ষেপে সকল ঘটনা বলে গেল অমলেন্দুকে মণিকা।

অমলেন্দুর দু' চোখ জলে ভরে ওঠে। বললেন, কোথায় সে? একদিনও ত তাকে দেখলাম না।

সত্যিই অমলেন্দুর জ্ঞান হবার পর আর চন্দনা তার বাপের সামনে আসে নি। দু'বেলা এসে বাইরে থেকেই সংবাদ নিয়ে চলে যেত।

দিদিকে তুমি দেখবে বাবা?

কোথায় সে? ডাক।

এখনো ত আসে নি। বেলা এগারোটা নাগাদ আসবে। ডাক্তার ব্যানার্জীও ত তখনি আসবেন।

বিভা, এত দিন তুমি সব কথা আমাকে বল নি কেন?—অমলেন্দু বললেন।

বিভাবতী কোন জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। এখন ত তোমার বিশ্বাস হয়েছে বিভা, আমার চুনী কোন অন্যায় করতে পারে না। আমার চুনী কোন ছোট কাজ করতে পারে না।

কি জানি কেন, আজ আর কোন প্রতিবাদ জানাতে পারলেন না বিভাবতী।

মণিকা বললে, দিদি হঠাৎ ঐ সময় না এসে পড়লে আপনাকে আমরা বাঁচিয়ে তুলতেই বোধহয় পারতাম না।

অমলেন্দুর চোখের কোণ দুটো আবার জলে ভরে ওঠে।

দিল্লীর কাজ সেরে ফিরতে সনতের এবার বেশ দেরি হয়ে গেল। অবিশ্যি ট্রাঙ্ককল করে সনৎ জানিয়েছিলেন চন্দনাকে, ফিরতে তাঁর ক'টা দিন দেরি হবে।

সেদিন পৌনে এগারটা নাগাদ চন্দনা যখন নার্সিং হোমে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে সনৎ এসে পৌঁছালেন।

সকালের প্লেনে এলে বুঝি?—চন্দনা শুধালো।

হ্যাঁ। চলে এলাম। তোমার জন্য মনটা কেমন করছিল।

কিসে এলে এয়ারপোর্ট থেকে? ট্যাকসিতে?

হ্যাঁ।

কাল রাত্রে ট্রাঙ্ককল করে বলে দিলেই ত এয়ারপোর্টে গাড়ি যেত।

কাল রাত্রে তোমাকে ফোন করার পর মনে হলো, আজই আসি। সিট পেয়ে গেলাম। চলে এলাম। তা তোমার বাবা কেমন আছেন?

এখন অনেকটা সুস্থ। ভাবছিলাম—

কি?

আরো কিছুদিন বাবাকে নার্সিং হোমে রাখি।

নিশ্চয়ই রাখবে। তারপর একটু থেমে সনৎ বললেন, তোমার বাবা তাহলে তোমাকে ক্ষমা করেছেন।

বাবার সামনে ত এখনো পর্যন্ত আমি যাই নি।

যাও নি?

না!

খুব অন্যায় করেছো চুনী, যাওয়া উচিত ছিল তোমার।

কিন্তু বাবা।

আজই একবার যাও।

যাবো?

নিশ্চয়ই, যাবে বৈকি।

কিন্তু বাবা যদি—

ক্ষমা না করেন? কেন করবেন না। তুমি ত কোন অন্যায় বা পাপ করো নি। তুমি সোজা গিয়ে বলবে আমি তোমায় বিয়ে করেছি। তুমি আমার স্ত্রী। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কোন নোংরামি নেই। কি পারবে না বাবাকে বলতে?

পারবো। তোমাকে আমি বলি নি। কয়েক মাস আগে একটা চিঠি দিয়েছিলাম বাবাকে, কিন্তু কোন জবাব দেন নি তিনি সে চিঠির

নাই বা দিলেন জবাব। তোমার চিঠির জবাব না দেওয়ার জন্য তাঁকে কোন দোষ দিও না, তুমি ত জান চুনী, আমাদের এই সম্পর্কটা মেনে নিতে আমারই অনেক দিন লেগেছিল, তোমাকে বুঝতেও আমার সময় লেগেছিল। তাঁরও ত লাগবারই কথা।

এখন আর তোমার মনের মধ্যে কোন দ্বিধা বা সংশয় নেই ত?

না।

সত্যি বলছো!

যা বললাম তার চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই জেনো। চুনী মানুষের জীবনের মহৎ সত্য যে কখন কি ভাবে প্রকাশ পায় কেউ বলতে পারে না, এবং সে সত্য যখন এসে সামনে দাঁড়ায় তাকে আর অস্বীকার করা যায় না।

চন্দনা এগিয়ে গিয়ে সনতের পায়ের ধুলো নিল।

তোমাকে আশীর্বাদ করবার মত স্পর্ধা আমার নেই চুনী। তবে এও স্বীকার করবো অকপটেই তুমি যেমন করে আমাকে গ্রহণ করেছো, আমি হয়তো ঠিক তেমনি করে তোমাকে গ্রহণ করতে পারি নি। তোমার সত্যের কাছে আমি পরাজিত।

চন্দনা সনতের কথাগুলো ঠিক যেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাই মৃদু কণ্ঠে বললে, আমার মনের মধ্যে ত কোন দ্বন্দ্ব বা দ্বিধা নেই।

জানি আমি চুনী, আর জানি বলেই যে প্রশ্নটা আমাকে মাঝে

মাঝে পীড়া দেয় সেটা হচ্ছে তোমার কাছে যদি কোনদিন আমি ফুরিয়ে যাই।

না, না—ওকথা বলো না? বরং ভয় আমারই।

ভয়! কিসের ভয়?

আমাকে যদি কোন দিন তোমার ভার বলে মনে হয়।

না চুনী, কোন দিন তা হবে না জেনো। কথাগুলো বলতে বলতে সনৎ দু'হাত বাড়িয়ে চন্দনাকে বুকের মাঝখানে টেনে নিলেন।

চুনী—

বল।

তোমার মা-বাবার জন্য—তোমার বোনদের জন্য খুব চিন্তা, তাই না?

আর কিছু না, চিরটাকাল দেখে আসলাম বাবা যুদ্ধ করেই গেলেন।

একটা কথা তোমাকে আমি বলি নি চুনী।

কি কথা?

বরাহনগরের দিকে একটা জায়গা কিনে মাস দুই হলো একটা বাড়ি শুরু করেছি, তোমার নামে। আর মাস তিনেকের মধ্যে মনে হয় বাড়িটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তোমার মা-বাবা ও বোনদের সেখানে এনে যদি রাখ। অবশ্যি তোমার মা-বাবাকে যদি রাজী করাতে পারো।

বাবা মা কি আসবেন?

তুমি না হয় বাড়িটা তাদের নামে লিখে দিও।

তাঁরা কি সম্মত হবেন তাতে!

চেষ্টা করে দেখ না।

বেশ, বলছো যখন দেখবো।

তুমি বেরুচ্ছিলে না?

হ্যাঁ, একবার নার্সিং হোমে যাবো ভাবছিলাম।

যাও।

কিন্তু তুমি এই এলে।

তাতে কি? তুমি যাও।

চন্দনা যখন নার্সিং হোমে এসে পৌছাল বেলা তখন সাড়ে বারটা,

যে ঘরটায় ওদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল মণিকা একা সেই ঘরে বসেছিল।

চন্দনাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মণিকা বললে, তোর আজ আসতে এত দেরি হলো যে দিদি।

একটু দেরি হয়ে গেল। বাবা কেমন আছেন?

ভালই। বাবাকে আজ সব কথা বলেছি।

কি বলেছিস?

সব কথা, বাবা তোর পথ চেয়ে আছেন।

সত্যি বলছিস মণি?

হ্যাঁ, তুই যা বাবার কাছে।

যাবো বলছিস?

হ্যাঁ, যা।

কিন্তু মণি।

যা তুই, মা-ও সেখানে আছে।

১২

এগুতে গিয়েও যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়াল চন্দনা। মনে হলো, হঠাৎ যেন তার গতি রোধ হলো।

মণিকা বললে, কি হলো দাঁড়ালি কেন?

না, মা সেখানে আছে, মা যদি—চন্দনা ইতস্ততঃ করে থেমে যায়।

মা আছে ত হয়েছে কি? যা তুই—

হ্যাঁরে মণি, ডাঃ ব্যানার্জী এসে আজ বাবাকে দেখে গিয়েছেন? —চন্দনা প্রশ্ন করলো।

না। এখনো আসেন নি ডাঃ ব্যানার্জি।

চন্দনা ধীরে ধীরে বাবার ঘরের দিকে অগ্রসর হলো। সেদিনও সে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে,

মনে স্থির করেছিল একবার সে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। বাবা যদি তাড়িয়েই দেন ত চলেই না হয় আসবে। আর যদি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি যা করেছো তার পরেও এখানে আসবার সাহস হলো কেমন করে। মনে মনে বাবার কথার কি জবাব দেবে তার জন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিল।

বলত বাবা আপনিই বলুন আমি কি কোনো অন্যায় বা পাপ করেছি। তাকে আমি আমার স্বামী বলে গ্রহণ করেছি, আর তিনিও আমাকে তার স্ত্রী বলেই গ্রহণ করেছেন, আপনি বিশ্বাস করুন তার মধ্যে কোন মিথ্যা বা ফাঁকি নেই।

কিন্তু সে রকম কোন প্রশ্নেরই সম্মুখীন সেদিন তাকে হতে হয় নি। আজ যদি হতে হয়। বেশ ত হয়েই যাক বাবা তার কি বিচার করেন তাও ত সে জানতে পারবে।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল চন্দনা। ব্যাকরেস্টে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন অমলেন্দু, পাশের একটা ছোট টুলের পরে বসেছিলেন বিভাবতী। বসে স্বামীর যে দিকটা অবশ সেই পায়ে হাত বুলচ্ছিলেন।

চন্দনা ঘরে ঢুকতেই যুগপৎ ওদের দু'জনার দৃষ্টি চন্দনার উপরে পড়ল। বিভাবতী সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন। অমলেন্দু কিন্তু মেয়ের মুখের দিকে চেয়েই থাকেন।

সন্তানদের মধ্যে ঐ চন্দনাই ছিল তাঁর বেশী আদরের। এক বছরেরও অধিক সময় পরে মেয়েকে দেখছেন অমলেন্দু। কিন্তু এ যেন তাঁর চিরদিনের সেই আদরিণী কন্যা চন্দনা—চুনী নয়, এ যেন অন্য কেউ।

কপালে সিন্দুরের টিপ—সিঁথিতে সিন্দুর, দু'হাতে দশ গাছা করে সোনার চুড়ি, সাদা শাঁখা আর লোহা—পরনে একটা চওড়া পাড় দামী জামদানী শাড়ি, কপাল ছুঁয়ে আছে মাথার গুণ্ঠন। বাড়িতে কোনো এককালে তাদের জগদ্ধাত্রী পুজো হতো প্রতিমা গড়িয়ে, অমলেন্দুর মনে হলো ঠিক তেমনটি যেন।

বাবা—

অমলেন্দুর দু' চোখে জল। গাঢ়স্বরে ডাকলেন, আয় মা—আয়।

চন্দনা এসে অমলেন্দুর পায়ের কাছে দাঁড়াতেই বিভাবতী উঠে পড়লেন টুল থেকে। এবং আর কোন দিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

অমলেন্দুর পায়ে হাত রাখল চন্দনা।

অমলেন্দু বাঁ হাতটা বাড়িয়ে ডাকলেন, আয় মা—আমার কাছে আয়।

আপনি আমার 'পরে রাগ করেছেন বাবা।

কেন রাগ করবো না।

বাবা—

যাবার আগে একটিবার কি আমার কাছে সব কথা খুলে বলতে পারতিস না?

পারতাম বাবা।

তবে?

সাহস পাই নি।

কেন। সাহস পাস নি কেন?

জানি না বাবা, তাছাড়া মা—

মাকে তোর ভুল বুঝিস না চুনী। সেকেলে মানুষ ত!

মার ক্ষমা বোধহয় কোন দিনই পাবো না?

পাবি রে পাবি, আমি ত জানি তার মনটা। তোকে না ক্ষমা করে কি থাকতে পারে। করবে বৈকি। নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে।

আপনার মনে আর কোন দুঃখ বা গ্লানি নেই ত?

আমাদের চেনা পথের বাইরে পা ফেলতে গেলেই হোঁচট খেতে হয় মা। সে জন্য দুঃখ করিস না মা। তুই সুখী হয়েছিস ত?

হ্যাঁ বাবা—

অনেক মূল্য তোকে দিতে হবে মা। চিরদিনের সমাজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধই তোকে করতে হবে মা। আমি জানি—আর সেই দিনকার

কথা ভেবেই চিন্তার আমার অবধি ছিল না। নচেৎ তোকে আমি ভুল বুঝি নি মা।

আশীর্বাদ করো বাবা, সেই দুঃখের অভিশাপের অগ্নি শুদ্ধিতেই যেন আমার সব কিছু সার্থক হয়ে ওঠে।

করবো বৈকি মা। নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করবো। যিনি সকল কিছুর বিচার করেন—যাঁর চোখ সব কিছু দেখতে পায় তিনিই যেন তোকে সার্থকতার মঙ্গল আশিস দেন।

অমলেন্দুর পায়ের উপর হাতখানি রেখে চন্দনা বললে, সঙ্কোচ আর দ্বিধা এখনো যে মধ্যে মধ্যে আমার মনকে বিচলিত করে আজ তোমার আশীর্বাদ পেয়ে মনে হচ্ছে হয়ত তা আর আমাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

এত কালের প্রচলিত যে প্রথাটা তাকে কি এত সহজেই অস্বীকার করা যায় মা। সেটা ত পিছন থেকে টানবেই। তাই বলে থেমে পড়লে ত চলবে না চুনী। যা, একবার তোর মার কাছে যা।

আপনি বলছেন যেতে ?

হাঁ মা। যা—

চন্দনা ঘর থেকে বের হয়ে এলো, কিন্তু বিভাবতীকে কোথায়ও দেখতে পেল না। মণিকা একা ঘরের মধ্যে বসেছিল, সে বললে, মা ত চলে গেছে দিদি।

চলে গেছে ?

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ, শমি এসেছিল মা তাকে নিয়েই বাড়ি চলে গেল।

চন্দনা আর কিছু বললো না।

প্রায় দু'মাস পরে অমলেন্দু নার্সিংহোম থেকে গৃহে ফিরে গেলেন। সুস্থ হলেও অমলেন্দুর কর্মক্ষমতা আর ছিল না। আর চাকরি করতে পারলেন না।

এত দিন নার্সিংহোমে থাকাকালীন সময়ে চন্দনাই সংসারটা চালিয়ে

দিয়েছে। চন্দনাই আবার মাসের প্রথমে মণিকার কাছে টাকা পাঠিয়ে দিল।

টাকা দিয়ে এসেছিল বঙ্কিম।

তুমি কে, কোথা থেকে আসছো?—মণিকা শুধাল।

আজ্ঞে আমার নাম বঙ্কিম বাগ। ভট্টাচার্যি সাহেবের ওখানে চাকরি করি। মা এই খামটা আপনাকে দেবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।

ভারী খামটা হাতে মণিকা বললে, চিঠি?

আজ্ঞে জানি না ত।

মণিকা খামের মুখটা খুলতেই দেখলো তার মধ্যে এক গোছা একশো টাকার নোট।

আমি তাহলে চলি দিদিমণি?

এসো।

মণিকার হাতের টাকা প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। সে ভাবছিল এবারে চলবে কি করে, দিদি ভোলে নি—তাই টাকা পাঠিয়েছে।

সংসারের খরচের ব্যাপারটা গত দু'মাস ধরেই মণিকার হাত দিয়ে চলছিল। বিভাবতী কোন সন্ধানই কিছুর রাখেন নি, কোন কথা জিজ্ঞাসাও করেন নি। তা হলেও বিভাবতী কি জানতেন না, খরচ কোথা হতে আসছে!

বিমান সেই যে স্ত্রীর হাত ধরে বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছে আর এমুখো হয় নি। কোন সংবাদও নেয় নি।

মণিকাও তার সঙ্গে কোন যোগাযোগ করে নি।

বিভাবতী স্পষ্টই বুঝেছিলেন. ঐভাবে হাত পেতে টাকা না নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। মণিকা সামান্য যা আয় করে তাতে করে চার-চারটি প্রাণীর এ বাজারে পাঁচটা দিনও চলতে পারে না। তা ছাড়া অমলেন্দু সুস্থ হয়ে উঠলেও তাঁর এখনও ঔষধ ও পথ্য রয়েছে।

বিভাবতীর ঐ ব্যাপারে কোন মন্তব্য, ইচ্ছা বা অনিচ্ছা প্রকাশ না করার আরো একটি কারণ ছিল। তাঁর স্বামীই যখন চন্দনার টাকা

গ্রহণ করছেন, তখন তাঁরই বা আর বলবার কি থাকতে পারে? একমাত্র ছেলে, যাই রোজগার করুক তবু ত রোজগার কিছু করে, তা সেও ত ডেকে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে না একটিবার।

বিভাবতী স্বামীর জন্য সুপ তৈরী করছিলেন রান্নাঘরে মণিকা এসে ঢুকলো, মা—

কি?

দিদি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে।

ভাগ্যক্রমে যখন ভিক্ষুকের অধম হয়েছি—

মা—বাধা দিল মণিকা।

যা। আমার সামনে থেকে যা—বলে মুখ ফিরিয়ে নিলেন বিভাবতী।

আরো চারটি মাস ঐভাবেই চলে গেল। তারপরই অকস্মাৎ একদিন বজ্রপাত হলো। এক উকিলের চিঠি এলো অমলেন্দুর নামে।

অমলেন্দু যে বছর চারেক আগে বসতবাটিটুকু এক ভদ্রলোকের কাছে বন্ধক রেখে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিলেন সুদে আসলে তা আজ দশ হাজার হয়েছে।

অমলেন্দু বললেন, আমি ত কিছুই এর মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না বিভা। বাড়ির দলিল আমার বাক্সে রইলো, আর বাড়ি বন্ধক দেওয়া হলো—বের কর তো বিভা বাক্স থেকে দলিলটা।

বাক্স হাতড়ে কোন দলিল পাওয়া গেল না।

বুঝতে আর এখন ব্যাপারটা বাকী রইলো না—বিমান বাক্স থেকে কোন এক সময় দলিলটা হাতিয়ে সর্বনাশ করেছে।

বিভাবতী বললেন, তোমার ধারণা এ খোকার কাজ?

সে ছাড়া আর কে বাক্স থেকে দলিল নিতে পারে বিভা? কিন্তু আমি ভাবছি এত বড় দুঃসাহস তার হলো কি করে—আর কখনই বা দলিল বাক্স থেকে চুরি করল সে!

এক বাড়িতে থাকত দাদা—মণিকা বললে, তাছাড়া তুমি আর বাবা ত সব সময় ঘরে থাকতে না। কিন্তু আমি ছাড়বো না দাদাকে, যাবো তার কাছে।

গিয়ে কি করবি—বিভাবতী বললেন।

কি করবো মানে ? দেখো না কি করি।

সত্যি সত্যিই মণিকা সেই দিনই সন্ধ্যায় বিমানের যাদবপুরের ফ্ল্যাটে গেল। সে জানত কোথায় বিমান থাকে। বিমান তখন সবে অফিস থেকে ফিরেছে, বসে চা পান করছিল তার স্ত্রীর সঙ্গে পাশাপাশি দু'টো চেয়ারে !

দাদা—

কে ? মণিকা—যাক দাদাকে তাহলে এত দিনে মনে পড়ল।

মনে পড়িয়েছো তুমি—আমি কখনো মনে করতাম না।

আমি মনে করিয়েছি !—বিমান তাকাল মণিকার মুখের দিকে।

তুমি এত ছোট, এত নীচ জানতাম না !

বের হয়ে যা এখান থেকে।

বেরিয়ে এখুনি যাবো। তোমার সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। তুমি বাবার বাড়ির দলিলটা তার বাক্স থেকে চুরি করে এনেছো ?

Shut up—মুখ সামলে কথা বলবি।

চোর ! জোচ্চোর—

মণিকা—চিৎকার করে ওঠে বিমান।

ভাল চাও ত বাবার দলিল বন্ধক ছাড়িয়ে বাবাকে দিয়ে এসো—নচেৎ জেনো—

কি জানবো ?

সহজে তোমাকে আমি নিষ্কৃতি দেবো না। থানায় যাবো—দলিল চুরি করে এনেছো—জেল খাটিয়ে ছাড়বো।

যা—যা—যা করতে পারিস কর গে।

তা হলে দলিল তুমি ফিরিয়ে দেবে না ?

থানায় যা।

তাহলে তাই হবে। প্রস্তুত থেকো।—মণিকা বের হয়ে গেল।

ক'টা দিন তারপর উকিলের কাছে ছুটাছুটি করলো মণিকা—সবই জানতে পারল। অমলেন্দুর নামে সই জাল করে বিমান ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়েছে বছর দুই আগে এবং সেই টাকা দিয়েই নিজে একটা ব্যবসা শুরু করেছে।

উকিল নিখিল ঘোষ বললেন, মামলা করা ছাড়া উপায় নেই মিস রায়।

কিন্তু অমলেন্দু বললেন, না।

কি বলছো বাবা তুমি!—মণিকা আর শমিতা বললে।

ঠিকই বলছি। ছেলের সঙ্গে মামলা করবো—ছেলেকে চোর প্রতিপন্ন করতে আদালতে যাবো। না—তা আমি পারবো না।

বিভাবতী কাঁদতে লাগলেন।

শমিতা বললে, দিদিকে সব কথা বল মেজদি।

ঠিক বলেছিস। তুই তা হলে একবার যা দিদির কাছে, মণিকা বললে।

* * * চন্দনা শমিতার মুখে সব শুনে একবারে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

বললে, কত টাকা?

সুদে আসলে দশ হাজার হয়েছে।

চন্দনা কি যেন ভাবল তারপর বললে, ও সব মামলাটামলা করে কোন লাভ নেই। তাতে করে কেবল কেলেঙ্কারিই বাড়বে। আমি ওঁকে বলে দেখি হয়ত উনি একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

দশ হাজার টাকা যে অনেক টাকা দিদি। অত টাকার কথা ওঁকে বলা কি ভাল হবে?

চন্দনা বললে, তা ওঁকে ছাড়া আর কাকে বলবো রে! উনি নিশ্চয়ই একটা যা হোক ব্যবস্থা করবেন। বাবাকে তুই ভাবতে বারণ করিস—কাল বরং একবার আসিস বিকেলের দিকে।

তোমার কাছে যে এসেছি বাবা জানেন না। তোমার কাছে আসবো বাবাকে বললে হয়ত আসতে দিতেন না—তাই কিছু বলি নি।

বেশ করেছিস। এখন কিছু বলার প্রয়োজন নেই। দেখা যাক কি ব্যবস্থা করা যায়।

একটা কিছু ব্যবস্থা যা হোক না করতে পারলে মাথা গুঁজবার ঠাঁই-টুকুও আমাদের যাবে, বাবার আর ঋণশোধ করবার ক্ষমতা নেই। সত্যি জানি না কি হবে!

বললাম ত চিন্তা করিস না। যা হোক একটা ব্যবস্থা কিছু হবেই।

শমিতা আর কিছু বললো না। দিদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলো।

* * * সন্ধ্যার পর স্নান করে সনৎ যখন ড্রিংক নিয়ে বসেছেন, চন্দনা একটু একটু করে সব কথা খুলে বলল।

সনৎ সব শুনে বললেন, ছোকরা ত দেখছি দারুণ ফেরেববাজ। দলিল হাতিয়ে আবার বাবার সই নকল করে দলিল বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছে। আদালতে মামলা হলে যে জেল হয়ে যাবে জালিয়াতী!

তা তো হবেই। কিন্তু বাবা মামলা করবেন না।

করবেন না?

না।

তাহলে এক কাজ কর চুনী। টাকাটা তুমি দিয়ে দলিলটা না হয় ছাড়িয়ে নিয়ে এসো।

আমিও তাই ভাবছিলাম।

তবে টাকাটা দিয়ে দিলে না কেন?

কি যে তুমি বলো। তা ছাড়া তোমাকে না জিজ্ঞাসা করে—

সনৎ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, তারপর বললেন, আমি একটা কথা ভাবছি চুনী।

কি?

বরাহনগরের বাড়িটা ত কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে—কলোনীর বাড়িটা বেনামায় কিনে তুমি তোমার মা-বাবা-বোনদের ঐ বরাহনগরের বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করো। এমনিতে ত তিনি রাজি হবেন না। ঐ ভাবে যদি তাঁদের নিয়ে যাওয়া যায়।

বাড়িটা বেনামায় কিনবে?

হ্যাঁ, ঐ ছোকরাকে আমি একটু শিক্ষা দিতে চাই। বাড়ি কিনে আমি মামলা করবো। কি সম্মত আছো ?

তা আমি কি বলবো।

বাঃ, তুমি বলবে না ত বলবে কে ?

চন্দনা মৃদু কণ্ঠে বললে, আমি কিছু জানি না। মা-বাবাকে রাস্তায় না দাঁড়াতে হলেই হলো।

মুশকিল কি হয়েছে জান চুনী ?

কি ?

তোমার মা-বাবা ত আমার মুখদর্শন করবেন না। নচেৎ দেখা করতাম তাঁদের সঙ্গে একবার।

কি হবে দেখা করে। তা ছাড়া যেখানে তোমার অপমান, সেখানে-তোমাকে আমি কোন মতেই যেতে দিতে পারি না। —চন্দনা খুব শান্ত গলায় কথাগুলো বললে।

আমার মধ্যে মধ্যে কি মনে হয় জান চুনী !

কি ?

তাঁদের মেয়েটিকে আমি ত কোন অমর্যাদা করি নি—তবে তাঁদের আমার প্রতি এত বিদ্বেষ কেন ?

থাকলেই বা বিদ্বেষ—তোমার তাতে করে কি এসে গেল ?

না, কিছুই এসে যাচ্ছে না—তবু, মনে হয় আমার প্রতি তাঁরা অবিচার করছেন।

চন্দনা জানত সনতের মনের মধ্যে তার মা-বাবাকে কেন্দ্র করে একটা ব্যথা ও অভিমান আছে তাই সে বরাবর ঐ দিকটা এড়িয়েই চলে। মা-বাবার কোন প্রসঙ্গই বড় একটা তোলে না। আজো প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে দিল। বললে, তা হলে মণি আসলে কাল কি বলবো ?

ঐ ত যা বললাম, তাই বলো। বলো, দলিলটা ছাড়াবার ব্যবস্থা করা হবে। ঐ ব্যাপার নিয়ে তাঁরা যেন চিন্তা না করেন।

সনৎ ভট্টাচার্যই তাঁর সলিসিটারকে বলে সব ব্যবস্থা করলেন।

বাড়িটা টাকা শোধ করে বেনামে কেনা হয়ে গেল। তারপর একটা ডিড করে সেটা আবার বেনামদার অমলেন্দু রায়কেই দেওয়া হলো—কিন্তু অমলেন্দু, কিছুই জানতে পারলেন না। কেবল তাঁর নামে একটা বেনামাদারের নোটিশ গেল, বাড়ি বিক্রী হয়ে গিয়েছে—বিশ হাজার টাকায়। ধার শোধের পর বাকী দশ হাজার টাকা তিনি যে কোন দিন সলিসিটারের অফিসে গেলে পেয়ে যাবেন এবং যত দিন তাঁর খুশী ঐ বাড়িতে থাকতে পারেন একশত টাকা ভাড়া দিয়ে।

কিন্তু কেন জানি না বিভাবতী একেবারে বেঁকে বসলেন।

বললেন, না এ বাড়িতে আর থাকবো না। নিজের এত কষ্টের বাড়ি যদি বিক্রীই হয়ে গেল ত এ বাড়িতে ভাড়া গুনে একদিনও থাকবো না।

মণিকা চন্দনাকে গিয়ে সব কথা জানাল।

১৩

চন্দনা বোনকে শুধালো, কেন রে, মা থাকতে সম্মত হচ্ছেন না কেন?

মণিকা বললে, জানি না। মা বলছে অন্য বাড়ি দেখতে। তা এখন বাড়ি পাওয়া যে কি শক্ত জানে না, তাছাড়া বাড়ি ভাড়া আছে ঐ কলোনীতেই দুটো ঘর—তার ভাড়া দেড়শ টাকা। অত ভাড়া কোথা থেকে মাসে মাসে আসবে?

তা বাবা কি বলছেন?

বাবা একেবারে চুপ করে আছেন। হ্যাঁ না কিছুই বলছেন না। আসলে দাদার ব্যাপারে বাবা প্রচণ্ড একটা 'শক' পেয়েছেন।

মণি—

কি বল, মণিকা দিদির মুখের দিকে তাকাল।

বরাহনগরে একটা বাড়ি আছে—সেখানে মা-বাবাকে তোরা বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিয়ে যেতে পারবি?

বরাহনগরে কোথায় ?

গঙ্গার খুব কাছে। বাজার, বাসস্ট্যাণ্ড সব কাছে।

ভাড়া কত ?

ভাড়া এক পয়সাও দিতে হবে না।

সে কি !

তা তুই পারবি কিনা বল ?

মণিকা ব্যাপারটা কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। বললে, সনৎবাবুর তাই না ?

বাড়িটা আমার।

তোর বাড়ি ?

হ্যাঁ, আমাকে করে দিয়েছে বাড়িটা, মা-বাবা যদি ঐ বাড়িতে গিয়ে থাকেন ত আমার স্বর্গবাস হবে।

বাবাকে হয় ত রাজী করাতে পারবো। কিন্তু ভাবছি মার কথা।

মাকে পারবি না রাজী করাতে ?

ভাবছি, মাকে ত জানিস। মা ঠিক ধরে ফেলবে, বাড়িটা তোর।

মণি, ভাই, এ কাজটা তোকে করতেই হবে ?

তুই জানিস না। তোকে এত দিন একটা কথা বলি নি দিদি—যেদিন থেকে তোর টাকায় সংসার চলছে মা সব খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বলতে গেলে এক প্রকার।

সে কি !

এক বেলা ডাল ভাত খায় আর এয়োস্ত্রী মানুষ মাছ একবার দাঁতে স্পর্শ করে মাত্র—তাও আমার টিউশনীর টাকায়।

আচ্ছা মণি, তোর মনে হয়, আমি কোন পাপ বা অন্যায় করেছি ?

আগে তাই মনে হয়েছে কিন্তু পরে তোকে আর সনৎবাবুকে দেখে বুঝেছি তোকে কোন পাপ বা অন্যায় স্পর্শ করতে পারে না।

ঐ সময় সনৎ এলেন।

মণিকা দেবী যে, কি খবর ?

ভাল।

বাবার শরীর কেমন আছে ?

ভাল।

মা ?

মাও ভাল।

চন্দনা ঐ সময় বললে, আমি মণিকে বলছিলাম বরাহনগরের বাড়ির কথা। সেখানে গিয়ে থাকবার জন্য।

সে ত খুব ভাল প্রস্তাব।

আমি আজ তা হলে আসি সনৎবাবু।

এসো—মধ্যে মধ্যে এসে দিদিকে খবরটা দিও। তোমার দিদি সত্যিই ব্যস্ত হয়ে থাকে।

মণিকা চলে গেল।

চন্দনা সনতের দিকে তাকিয়ে বলল, মা ঐ কলোনীর বাড়িতে একদিনও থাকতে চায় না।

কেন ?

তুমি যতই বলো, যতই গোপন কর, আমার মনে হয় মা ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে, যদি বাড়িটা বাবার নামেই করে দেওয়া হতো—

ব্যাপারটা তাতে করে আরো জটিল হয়ে উঠত চুনী।

কেন ?

তোমার মা-বাবা ভাবতেন এ তোমারই দয়া, তুমিই তাদের দেনাটা শোধ করে দয়া দেখাচ্ছো।

দয়া কেন হবে। দয়ার কথা আসছে কোথা থেকে !

তোমার দিক থেকে কোন সংশয় না থাকলেও তাঁরা খোলা মন নিয়ে ব্যাপারটা দেখতেন না। অনেক ভেবেই তাই ঐ ব্যবস্থা আমি নিয়েছি—সনৎ বললেন।

চিরদিনই তাদের কাছে আমাকে তা হলে অপরাধী হয়ে থাকতে হবে।—চন্দনা বললে।

ভবিষ্যতের কথা জানি না, তবে এখনো বোধকরি তার সময় আসে

নি। যাক গিয়ে সে সব কথা, আজকে তোমার ভাই আমাদের ফ্যাকট্রিতে কাজের জন্য এসেছিল।

কাজের জন্য, কেন, যে কাজ সে করছিল ?

সে কাজ করছে, তবে আমাদের ফ্যাকট্রিতে মাইনে বেশী তাই হয়ত—

তা তুমি জানলে কি করে ? তুমি ত তাকে চেনও না ?

চিনতাম না ঠিকই, আমার ফ্যাকট্রি ম্যানেজার দেবতোষ বাবুর কাছে সে তার পরিচয়টা দিতেই দেবতোষ বাবু জানতে পারেন। কি পরিচয় দিয়েছে জান ? তোমার পরিচয়।

আমার পরিচয়! অবাক্ হয় চন্দনা রীতিমত, বলে, আমার পরিচয় দিয়েছে দাদা!

তাই তো দিয়েছে, বলেছে সে তোমার ভাই হয়। দেবতোষ বাবু তখন ফোনে কথাটা আমাকে জানান। আমার কেমন কৌতূহল হলো, আমার ঘরে ডেকে পাঠালাম বিমানকে।

কি বললে তখন ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি চন্দনা ভট্টাচার্যের ভাই! কি রকম ভাই ?

কেন, জানেন না, আমি তার আপন মায়ের পেটের ভাই।

আপনি কি সেই পরিচয়ের দাবীতেই এখানে এসেছেন চাকরির জন্য ?

কতকটা তাই।

তবে ত আপনার তার কাছেই যাওয়া উচিত ছিল।

কেন ?

কারণ সে আপনার ভগিনী!

সে হয়ত গেলে আমার সঙ্গে দেখা করতো না, তাই যাই নি।

আমি তখন বললাম, কিন্তু আমি ত তার দেওয়া ক্যারেকটার সার্টিফিকেট না পেলে আপনাকে চাকরি দিতে পারি না।

পারেন না ?

না।

সে কি আমার সঙ্গে দেখা করবে ?

মনে হয় করবে না, কারণ আপনি যা করেছেন তারপর তার দেখা না করাটাই স্বাভাবিক।

আমি—আমি কি করেছি ?

জানেন না আপনি কি করেছেন ? দলিল চুরি করে বন্ধক দিয়ে—শুনুন—আপনাকে আমি নিতে পারি একটি শর্তে।

কি সর্ত ?

আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করে তিনি আপনাকে ক্ষমা করেছেন এবং তিনি আপনার গ্যারাণ্টার হবেন এই মর্মে লিখিয়ে আনতে পারলে আপনার চাকরি হবে। ঐ কথা শুনে আর দাঁড়াল না। চলে গেল। অবিশ্যি ফাইন্যাল নির্ভর করছে তোমার উপরে চুনী।

আমার উপরে !

হ্যাঁ, তুমি না বললে চাকরি দেবো না তোমার ভাইকে।

তোমার কি মনে হয় ও বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে ?

যেতেই হবে।

কি করে জানলে ?—চন্দনা বললে।

ও যেখানে কাজ করে সেখানকার ম্যানেজারকে আমি বলে দিয়েছি দলিল চুরির ব্যাপারটা। রণজয় ঘোষ আমার বিশেষ বন্ধু, রণজয় শীগগির ওকে ডিসমিস করে দেবে তাও সে বলেছে।

চাকরি যাবে দাদার !

যে অন্যায় সে করেছে তার কিছুটা শাস্তি না হলে, চলবে কেন ! আমার কি ধারণা জান, ব্যাপারটা তোমার ভাই অনুমান করতে পেরেছে, তাই চাকরির চেষ্টা করছে।

তা হলে কি হবে !

কিছু একটা হবেই। দেখ না কি হয়। Wait and see !

মা বাবাকে বরা নগরের বাড়িতে যাবার জন্য, তাদের মত করাতে যতটা কঠিন হবে মণিকা ভেবেছিল তা কিন্তু হলো না।

বিভাবতী সরাসরি ব্যাপারটা নাকচ করে দিলেও প্রথমটায় অমলেন্দু অন্যকথা বললেন, কেন তুমি অমত করছো বিভা ?

তুমি তোমার মেয়ের প্রতি অন্ধ। তুমি, বুঝবে না কেন অমত করছি।

শোন বিভা, আমার কথাটা শোন—

স্বামীকে বাধা দিয়ে বিভাবতী বললেন, কেন বুঝতে পারছো না, এইভাবে একটু একটু করে সে আমাদের দিয়ে তার অন্যায় আর কলঙ্কটা মেনে নিতে বাধ্য করছে।

না, না। তা কেন হবে।

হ্যাঁ, তাই! আমি তার পেটে হই নি, সেই আমার পেটে হয়েছে। যেতে হয় তুমি যাও, আমি যাবো না।

কিন্তু একটা কথা কেন বুঝছো না, এ বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছে—এখন ভাড়াটে হিসেবে এখানে আমাদের থাকতে হবে, থাকলে—মাসে মাসে একশো টাকা ভাড়া গুণতে হবে—

কেন, তোমার মেয়েই ত মাসে মাসে টাকা দিচ্ছে—

তাই ত বলছি, সে টাকা যদি নিতে পারি ত তার দেওয়া বাড়িতে যেতে বাধাটা কি ?

তোমার কি লজ্জা ঘেন্না পিত্তি বলে কিছু নেই ?

আমার মত অসমর্থ গরীবের তাও নেই! তা ছাড়া একটা কথা তোমাকে বলি নি—মণিকা, যার ভরসায় তুমি এখানে থাকতে চাইছো, সে সামনের মাসে বিয়ে করছে।

বিয়ে করছে মণি ? কে—কে বললে তোমায় ?

হ্যাঁ, নিখিলেশকে সে বিয়ে করছে, আমি মত দিয়েছি, তুমি মত দেবে না জেনেই সে কোন কথা তোমাকে বলে নি।

নিখিলেশ—কার কথা বলছো ?

তুমি তাকে চেনো না। ছেলেটির নাম নিখিলেশ দাস, জাতে কৈবর্ত্য।

কৈবর্ত্য, সে ত ছোট জাত।

তা জানি। ছেলেটি যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে একটা ফার্মে ভাল চাকুরিতে ঢুকেছে, আমি জানতাম না ওদের দুজনের অনেক দিনকার আলাপ-পরিচয়।

মণি শেষ পর্যন্ত একটি কৈবর্ত্যের ছেলেকে বিয়ে করবে! আর তুমি মত দিয়েছো?

ছেলেটি সত্যিই ভাল, যা শুনেছি—

চুলোয় যাক ভাল, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেবো না।

বাধা দেবে কি করে, সে যদি চুনীর মত বাড়ি ছেড়ে চলে যায় কিম্বা তোমার ছেলের মত ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করে এসে একদিন হাজির হয়?

দাঁড়াও, এখুনি আমি ডাকছি ওকে—

না।

মণি, চিৎকার করে ওঠেন বিভাবতী।

মণি একটু বের হয়েছে, শোন বিভা, তুমি বাধা দিতে যেও না, তাতে করে কেবল কেলেঙ্কারীই বাড়বে। নিজে যখন সময়মত মেয়ের বিয়ে দিতে পারি নি, এ বিয়ে আমাদের মেনে নিতেই হবে।

আর কত — কত অপমান আর লজ্জা আমাকে স্বীকার করে নিতে হবে বলতে পারো? কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন বিভাবতী।

অমলেন্দু বললেন, কেঁদো না বিভা, কেঁদো না। আমাদের এতকালের সমাজব্যবস্থা, তার রীতিনীতি বুঝতে পারছো না সব বদলে যাচ্ছে।

ওগো, আমায় তুমি একটু বিষ এনে দাও—

নতুন করে আর কি বিষ পান করবে? দেশ-বিভাগের পর যখন এখানে এসে নতুন করে বাঁচবার চেষ্টা করলাম, সেই দিনই ত সবাই আমরা বিষ পান করেছি, সেই বিষের ক্রিয়া আজ চলেছে আমাদের সন্তানদের দেহে। দেখতে পাও না, আজকের দিনের কলোনীর ছেলে-মেয়েগুলো কিভাবে আজ তারা বাঁচবার চেষ্টা করছে, ওরা একটা নতুন

জাত। এখনই হয়েছে কি! এই ত সবে প্রথম পর্ব! আরো অনেক কিছুই আমাদের মেনে নিতে হবে!

অমলেন্দু মিথ্যা বলেন নি।

বিভাবতী যেমন জানতেন না, অমলেন্দুও জানতেন না নিখিলেশ দাসের কথা।

মণিকা সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনে রেখেছিল। ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু জানতে দেয় নি, এমন কি চন্দনা বা শমিতাকেও না।

যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্র নিখিলেশ দাস, কলকাতার নয়, মেদিনীপুরের ছেলে। তার বাবা পরিতোষ দাস গড়বেতায় একজন বর্ধিষ্ণু কৃষক এবং সেই সঙ্গে তার বিরাট ধান-চালের কারবার মেদিনীপুর সদরে। নিখিলেশ তার ছোট ছেলে।

বড় দুই ছেলে বাপের ব্যবসায় ঢুকলেও নিখিলেশ ঢোকে নি। বরাবর সে লেখাপড়ায় ভাল ছেলে ছিল, হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেই সে যাদবপুরে ঢোকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার জন্য।

ওদের আলাপও বিচিত্র ভাবে। ভবানীপুরের একটা মেসে থাকত নিখিলেশ, তখন ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। একদিন সন্ধ্যার দিকে সে হাঁটতে হাঁটতে কলেজ থেকে মেসে ফিরছিল, ঐ সময় মণিকাও টিউশনী সেরে লেক রোডের একটা বাড়িতে যাচ্ছিল, কয়েকটি ছেলে মণিকাকে উত্ত্যক্ত করছিল, নিখিলেশকে দেখতে পেয়ে মণিকা তাকে ডাকে।

নিখিলেশ এগিয়ে আসে, কি হয়েছে?

দেখুন না ওই তিনটি ছেলে আমাকে পথে দেখলেই উত্যক্ত করে, আজ আমাকে যেতেই দিচ্ছে না—

নিখিলেশ তখন রুখে দাঁড়ায়। একজনের চোয়ালে একটা ঘুষি বসাতেই বাকী দু'জন পালায়।

নিজেকে যদি রাস্তায় না রক্ষাই করতে পারেন ত একা একা রাস্তায় বের হন কেন?

মণিকা কেঁদে ফেলে।

কাঁদছেন কেন ?

আমাকে যে এই পথে সপ্তাহে তিন দিন এক জায়গায় টিউশনী করতে যেতে হয়।

কোথায় থাকেন আপনি ? নিখিলেশ শুধাল।

যাদবপুরে একটা কলোনীতে।

চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই। ওরা হয়ত এখনো আশেপাশেই আছে—

আপনি কি ওই দিকেই যাবেন ?

না। ও-দিক থেকে ফিরছি ইউনিভার্সিটি থেকে।

আবার আপনি যাবেন আমার জন্য—

যাবো। চলুন—

সেই আলাপ ওদের। তারপর পথেই মধ্যে মধ্যে দেখা হতো দু'জনার এবং ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয় দিনের পর দিন।

পাশ করলো তারপর নিখিলেশ। কয়েক মাস বাদে চাকরিও পেল।

যাদবপুরের দিকে আর যাবার প্রয়োজন নেই, তাহলেও দু'জনার দেখা হতো। কোন দিন লেকে, কোন দিন সিনেমায়।

কথাটা নিখিলেশই মণিকাকে বলেছিল, তুমি ত আমার সব পরিচয়ই জানো মণিকা, আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে ?

মণিকা চুপ করে থাকে।

কি ? কথা বলছো না যে ?

সেই সময় চন্দনা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে।

মণিকা বললে, কিছুদিন অপেক্ষা করতে পার যদি নিখিলেশ—

বেশ ত করবো। যতদিন বলবে—

তারপর অনেকদিন নিখিলেশ চুপ করে ছিল। অমলেন্দু নার্সিং হোম থেকে ফিরে আসবার পর একদিন আবার দু'জনার দেখা। নিখিলেশ বললে, আমাকে বোধ হয় পাটনায় বদলি করছে মণিকা।

কবে ?

মাসখানেকের মধ্যেই হয়ত অর্ডার পাবো। তাই বলছিলাম, এবার যদি আমাদের বিয়েটা—মানে বল তো আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারি।

না, আগে আমি বাবাকে সব কথা বলি।

তুমি বলবে তোমার বাবাকে, পারবে বলতে?

কেন পারবো না।

বেশ তবে বলো, তারপর না হয় আমি যাবো তোমার বাবার কাছে।

মণিকা কিন্তু ভেবে পায় না কিভাবে কথাটা বাবার কাছে উত্থাপন করবে। একে দিদির ঐ ব্যাপার, তার উপরে দাদা যা করলো, বাবাও ত এখনো অসুস্থ। ক'টা দিন কেবল ভাবে মণিকা, দশবার মনে মনে বলার জন্য প্রস্তুত হয় ত দশবারই আবার পিছিয়ে আসে।

নিখিলেশ আবার তাগাদা দেয়, বলে কি হলো?

কাল বলবো।

এখনো বলো নি বাবাকে কিছু?

না।

১৪

অমলেন্দু বিকেলের দিকে ঘরে শুয়ে ঐ দিনকার সংবাদপত্রটা পড়বার চেষ্টা করছিলেন। মণিকা বাইরে থেকে সোজা এসে ঘরে ঢুকল। ডাকল বাবা—

কে রে, মণি?

বাবা।

কিছু বলবি মা? কাগজটা পাশে নামিয়ে রাখলেন অমলেন্দু।

মণিকা জানত বিভাবতী ঐ সময় ঐ ঘরে আসবেন না। রান্নাঘরে

ব্যস্ত অমলেন্দুর সুপ তৈরী করছেন। তা সত্ত্বেও মণিকা ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

কি হয়েছে মণি? অমলেন্দু কেমন যেন একটু শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

আবার নতুন কিছু ঘটলো না ত। বিমানের দলিল চুরি করে বন্ধক রেখে টাকা কর্জের ব্যাপারটা তখনো জানতে পারে নি অমলেন্দু জেনেছিলেন তার পরের দিনই।

বাবা, একটা কথা আগেই তোমাকে আমার জানান উচিত ছিল কিন্তু—

কি হয়েছে মা? অমলেন্দুর গলার স্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

মণিকা ধীরে ধীরে নিখিলের সঙ্গে তার বছর তিনেক আগের পরিচয়ের ব্যাপারটা খুলে বলল।

অমলেন্দু নিঃশব্দে শুনে গেলেন, মণিকার কথার মাঝখানে একটি কথাও বললেন না। মণিকা বললে, নিখিলেশ আমাকে বিবাহ করতে চায়, কিন্তু তোমার অনুমতি ছাড়া ত তাকে আমি কথা দিতে পারি না।

বেশ ত তুমি যদি চাও ত তাকে বিবাহ করতে পার—অমলেন্দু বললেন।

বাবা!

হ্যাঁ মা, তোমার দিদির গৃহত্যাগের ব্যাপার ও তোমার দাদার বিবাহের ব্যাপারটা যখন মেনে নিতে পেরেছি, তোমাদের ও বিয়েটাও তেমনি মেনে নিতে পারবো। অমলেন্দু শান্ত গলায় কথাগুলো বললেন, তবুও ত তুমি বললে, কিন্তু তারা তাও বলে নি।

আপনি কি অসন্তুষ্ট হলেন বাবা? আপনার এ বিবাহে কি সত্যিকারের কোন মত নেই?

দু'বছর আগে হলে হয়ত তোমার কথায় সায় দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকরই হতো, কিন্তু আজ কোন কষ্ট বোধ করছি না। তা ছাড়া এ ত বুঝতে পারছি, আজ তোমার বিবাহটা আমাকে মেনে নিতে হবেই, নচেৎ নতুন এক সমস্যার মুখোমুখি আমাকে দাঁড়াতে হবে।

তা ছাড়া তুমি বড় হয়েছো, লেখাপড়াও কিছু শিখেছো। তোমার নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনাকে অস্বীকারই বা করি কি করে আমি ?

মণিকার বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে যায়। সে বললে, মা—

না মণি, তাকে এসব কথা বলো না। তোমার দিদির ব্যাপার ও তোমার দাদার ব্যাপার দুটোর কোনটাই তিনি মেনে নিতে যেমন পারেন নি তেমনি আজো সে ক্ষত তার শুকায় নি।

কিন্তু মাকে না জানিয়ে—

একদিন ত জানবেনই। যেদিন জানতে পারবেন সে দিনটির জন্য আমাদের অপেক্ষা করাই ভাল।

মণিকা অতঃপর বাপের পদধূলি নিয়ে উঠে গিয়েছিল ঘর থেকে আর অমলেন্দু স্তব্ধ হয়ে যেমন বসেছিলেন, তেমনি বসে রইলেন।

ভাবছিলেন তিনি, চুনী চলে গিয়েছে, বিমানও চলে গিয়েছে, এবারে মণিকার যাবার পালা। সেও যাবে—

সবটাই তাঁর ব্যর্থতা। সংসারের অবশ্যকরণীয় যা, তিনি করতে পারেন নি।

অতীতের দিকে তাকালেন অমলেন্দু। সন্তানদের নিয়ে তা'র কত আশা ছিল। নিজে শিক্ষকতা করে এসেছেন বরাবর, দশজনকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর নিজের সন্তানদেরও তেমনি শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু চেষ্টাই মাত্র বোধ হয় করেছেন, তার বেশী কিছু নয়। সবই ব্যর্থ। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় অমলেন্দুর, তাই বা কেন, ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে সব তাই বা ভাবছেন কেন ? আজকের মানুষের মনের ধারাটাই যে পালটে গিয়েছে। অতীতের নীতি-বোধের সঙ্গে আজকের নীতিবোধেরও পরিবর্তন ঘটেছে। অতীতে যা ছিল সমস্যা, আজকে সে সব কিছু সমস্যাই নয়। এই বয়েসে তাঁরা সেদিন যে কথাটা ভাবতেও পারেন নি, আজ এরা অনায়াসেই তা ভাবতে পারছে। চুনীর জন্য কি তাঁর দুঃখ কম। তাঁর চিরদিনের সামাজিক মূল্যবোধকে কত সহজেই না নস্যাৎ করে দিয়ে গেল।

যে চুনীকে ভেবেছিলেন কোন দিনই বুঝি ক্ষমা করতে পারবেন না, আজ ত তাকে পেরেছেন ক্ষমা করতে। তা ছাড়া বিমান যখন অসবর্ণ বিবাহ করে তার মনোমত পাত্রীকে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, তাও ত তাকে মেনে নিতেই হলো। তবে মণিকার বিবাহ-টাই বা মেনে নিতে পারবেন না কেন?

মানতে হবে। মেনে নিতে তাকে হবেই।

অমলেন্দু আবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার মনের অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি বিভা, কি করবো বলো, চুনীকে যখন ত্যাগ করতে পারি নি, মণিকাকেও ত্যাগ করতে পারবো না। এ রোধ করা যাবে না, তা ছাড়া আমরা আর ক'টা দিনই বা? আমাদের বুড়ো স্থবির মনটাকে আর প্রশ্রয় নাই বা দিলাম।

বিভাবতী স্থির অপলক দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তাই বলছিলাম বিভা, যে সংসার দেশ গাঁ থেকে এসে নতুন করে আবার গড়ে তুলেছিলাম, সে সংসারে যখন ভাঙ্গনই ধরেছে, এ বাড়িতে আর আমাদের থেকে লাভ কি? এখানকার প্রাণ শেষ হয়ে গিয়েছে। চল, আর অমত করো না, বরাহনগরেই চল।

কিন্তু সে বাড়ি—

জানি, চুনীরই বাড়ি। তাতেই বা ক্ষতি কি?

ক্ষতি নেই বলছো?

হাঁ, তাই বলছি। তারপর মণিও চলে যাবে দু'দিন পরে। চুনি চলে গিয়েছে, বিমান চলে গিয়েছে, এই বাড়িতে টিকতে পারবে আর?

বেশ।

দুঃখ বড় নিষ্ঠুর বিভা, একবার তাকে একটু ঠাঁই দিলে মনের কোথাও, সে সবটাই মনে জুড়ে বসে! তা ছাড়া একটা কথা কি জান বিভা, চুনীর কথা যখনই ভাবি, আমার কষ্টের যেন অবধি থাকে

না। এখনো যে প্রায় সব জীবনটাই পড়ে আছে তার সামনে—ও তো জানে না, অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তাকে। মন তার যাই বলুক, সমাজ সেটা সত্য বলে মেনে নেবে না। এত দিনকার সমাজ তার চেতনায় আঘাত হানতে হলে, আরো আরো অনেক সময়ের যে প্রয়োজন। আর সেদিন হয়ত তুমি আমি কেউ তার সত্যিকারের আপনার জন তার পাশে থাকবো না। তা ছাড়া আমরা তাকে না ক্ষমা করলে আর কে তাকে ক্ষমা করবে বল ?

দিন সাতেকের মধ্যেই কলোনীর বাড়ির দরজায় তালা দিয়ে, সেক্রেটারির হাতে তালার চাবিটা দিয়ে অমলেন্দু, মণিকা, শমিতা ও স্ত্রী বিভাবতীকে নিয়ে ট্যাক্সিতে এসে উঠে বসলেন, ট্যাক্সী ছেড়ে দিল, বেলা দ্বিপ্রহর তখন। অনেকগুলো বছরের অনেক ইতিহাস ঐ কলোনীর নিজ হাতে গড়া বাড়িটার মধ্যে থেকে গেল।

ট্যাক্সী এসে বরাহনগরের নতুন বাড়ির গেট দিয়ে যখন প্রবেশ করল বেলা তখন পৌনে চারটে, চন্দনার পূর্ব পরামর্শ মতো সামান্য জিনিসপত্রই ঐদিন সকালে একটা ট্রাকে করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বাড়ির সদরে শ্বেত পাথরের প্লেটে লেখা 'অলকানন্দা'। ট্যাক্সি সদরে এসে থামল। সকালবেলাই মণিকা এসে সদরের চাবিটা নিয়ে গিয়েছিল।

তা সত্ত্বেও বঙ্কিম সদরে দাঁড়িয়েছিল সঙ্গে তার একজন বর্ষীয়সী বিধবা মেয়েমানুষ। মণিকা বঙ্কিমকে ত চেনে। সেই বললে, বঙ্কিম তুমি ?

আজ্ঞে মা এই মেয়েলোকটিকে পাঠিয়ে দিলেন আর আমাকেও পাঠালেন যদি কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন হয়।

মণিকা চাবি খুলে প্রবেশ করল। দোতলা বাড়ি, প্রায় চার কাঠা জায়গার উপরে, উপরে নীচে আটখানা ঘর, রান্নাঘর বাথরুম আলাদা।

একতালায় ও দোতলায় দু'খানি ঘর আসবাবপত্রে সাজিয়ে রেখেছিল চন্দনা। রান্নাঘরে যাবতীয় তরিকরকারি বাসনপত্র ও মশলাপাতি সব সাজান ছিল কয়েকদিনের মত।

অমলেন্দু দোতলার সিঁড়ি ভাঙ্গতে পারবেন না। একতলার একটা ঘরেই ঢুকে একটা আরাম কেদারার উপরে বসলেন। দক্ষিণের খোলা জানালাপথে হু-হু করে হাওয়া আসছে।

মণিকা বললে, বাবা, চা করে আনবো ?

চা—

বঙ্কিম বললে, আপনি বসুন দিদিমণি, সুধার মাকে দিয়ে চা তৈরি করে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অমলেন্দু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধালেন, এ লোকটা কে মণি ?

দিদির বেয়ারা।

বিভাবতী জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সমস্ত মনটার মধ্যে যেন তাঁর হু-হু করছিল। দেশের পরিচিত ঘরবাড়ি ছেড়ে একদিন ছেলেমেয়েদের হাত ধরে স্বামীর পিছনে পিছনে এই শহরে এসে একদিন হাজির হয়েছিলেন বিভাবতী, দেশের ঘরবাড়ি বিক্রি করে কিছু সম্বল নিয়ে এসেছিলেন।

তারপর চার-পাঁচটা বছর অমলেন্দু কি পরিশ্রমই না করেছেন, যাদবপুরে কলোনীর ঐ মাথা গোঁজার ঠাঁইটা তৈরি করেছিলেন অমলেন্দু। নতুন করে জীবন শুরু হয়েছিল—আবার বলতে গেলে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সে সব পিছনে ফেলে চলে আসতে হলো। আর এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে হবে। কে জানে এ অধ্যায়ের শেষ কোথায় ?

সুধার মা মেয়েটি বেশ পরিচ্ছন্ন ও করিৎকর্মা। একটা ট্রের ওপর চায়ের পেয়ালাগুলো বসিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। সকলকে চা দিল।

বিভাবতী কিন্তু চা পান করলেন না।

সুধার মা বললে, রাত্রে কি রান্না হবে যদি বলে দেন মা।

তুমি ব্যস্ত হয়ো না বাছা। যা করবার আমিই করবো।—বিভাবতী বললেন।

আমি থাকতে আপনি কেন করবেন মা। আমাকে বলে দিন, আমিই সব করতে পারবো।

বঙ্কিম বললে, হ্যাঁ মা সুধার মাকে বলে দিয়েছেন, সব কাজ ও করবে। আর ভাঁড়ারটা একবার দেখে নিন যদি কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন হয় ত কিনে দিয়ে যাবো।

না, কিছুর আর দরকার হবে না।

মণিকা বললে, বঙ্কিম, তুমি যাও এবারে, যদি কিছুর প্রয়োজন হয়ত আমিই আনতে পারবো।

আপনি বাজারে যাবেন দিদিমণি?

কেন সেখানে ত আমিই যেতাম।

বঙ্কিম আর কোন কথা বললে না, চলে গেল।

* * বিভাবতী বুঝেছিলেন বর্তমান অবস্থাটাকে মেনে নিতেই হবে। স্বামী তার ঠিকই বলেছেন, তাদের আজ সবকিছু মেনে নিতেই হবে, নচেৎ কেবল জটিলতা আর দুঃখই কেবল সৃষ্টি হবে। আর কারোর কোন কাজে বাধা দেবেন না।

দিন তিনেক বাদে ওখানে আবার হঠাৎ এক সন্ধ্যায় বিমান এসে হাজির হলো বরাহনগরের বাড়িতে। মণিকা আর শমিতা বাড়িতে নেই, একটা আরাম কেদারায় বসে, অমলেন্দু চশমা চোখে ঐদিনকার সংবাদপত্রটা পড়ছিলেন, পাশে একটা সেলাই হাতে বসে ছিলেন বিভাবতী। ঘরের কোণে রেডিওতে গান হচ্ছে।

সুধার মা রান্নাঘরে রাতের রান্না নিয়ে ব্যস্ত।

বাবা—

কে? চমকে মুখ তুললেন অমলেন্দু পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে।

বিমান ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়ায়ে বললে, আমি। ভিতরে আসবো বাবা?

অমলেন্দু আর সাড়া দিলেন না, সাড়া দিলেন বিভাবতী। বললেন, আয়—

বিমান এসে ঘরে ঢুকল।

বিভাবতী ছেলের দিকে তাকালেন, পরনে একটা টেরিলিনের প্যাণ্ট ও শার্ট, পায়ে চপ্পল। মাথায় ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। বিভাবতীর মনে হলো ছেলে যেন এই কয়মাসে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে।

বাবা, আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে, আমাকে ক্ষমা করুন।

অমলেন্দু চুপ করে রইলেন। বিভাবতী বললেন, হ্যাঁরে খোকা, সত্যিই তুই দলিলটা চুরি করেছিলি ?

হ্যাঁ মা, ভেবেছিলাম দলিলটা বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা নিয়ে সেই টাকায় ব্যবসা করবো।

তা তোর বাবাকে সে কথা বললেই ত পারতিস।

যাক সে-যা হয়ে গিয়েছে, তোমরা আমায় ক্ষমা করো।

অমলেন্দু এতক্ষণে কথা বললেন, তা কেন এসেছো ?

বললাম ত. ক্ষমা চাইতে।

না। আমি বিশ্বাস করি না, অমলেন্দু বললেন, কোন ক্ষমা চাইবার জন্য তুমি আসো নি, বল কি জন্য এসেছো ?

আমার চাকুরিতে নোটিশ হয়ে গিয়েছে।

আজকাল কারো চাকরি যাওয়া ত এত সহজ নয়, তোমাদের ত ইউনিয়ান আছে।

আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করে একটা চিঠি দেন তা হলে একটা ভাল চাকরি এখনি পেতে পারি, অনেক বেশি মাহিনা।

চিঠি !

হ্যাঁ, ক্ষমা করে একটা চিঠি যদি দেন আপনি।

আমি চিঠি লিখে দিলেই হবে ?

হ্যাঁ, সনৎ ভট্টাচার্য—মানে এস. এন. তাই বলেছেন।

নামটা শুনে যেন চমকে উঠলেন অমলেন্দু। বললেন, কে, কে বলেছে ?

এস. এন.—মানে সনৎ ভট্টাচার্য! অবিশ্যি চুনীর কাছে যেতে পারলে তাকে দিয়েই তার বাবুকে বলাতে পারতাম।

হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন অমলেন্দু, ইউ সাট্ আপ। বেরও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

তা আপনি এত চটছেন কেন, এস. এন. ত চুনীর বাবুই, কথাটা কি মিথ্যে ?

যাও, যাও এখান থেকে চলে যাও—অমলেন্দু আবার বললেন।

আপনারা যতই মেনে নিন ব্যাপারটা, আমি মানতে পারি না। কেবল আমি কেন বাইরের জগতের কেউই মেনে নেবে না ব্যাপারটা। চুনী এস. এন.-এর মেয়েমানুষ ছাড়া আর কি !

বিভা, বিভা ওকে বের হয়ে যেতে বল এখান থেকে। যে নিজের মায়ের পেটের বোনের সম্মান দিতে জানে না, সে যেন এ বাড়িতে কখনো আর না আসে, বলে দাও ওকে।

আপনি চিঠিটা দিন আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। আপনাদের ঘেন্না-পিত্তি মান-অপমান না থাকতে পারে কিন্তু আমার আছে।

তা যে আছে সে ত বুঝতেই পারছি, নচেৎ তারই কাছে গিয়ে চাকরির জন্য হাত পেতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিস, বললেন বিভাবতী এবারে।

বোকার মত কথা বলো না মা। যা বোঝ না তা—

কেন তর্ক করছো বিভা, বের করে দাও ওকে—অমলেন্দু বললেন।

চিঠি না নিয়ে আমি যাবো না—বললে বিমান।

ইতিমধ্যে কখন যেন মণিকা এসে বিমানের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে সব শুনছিল আড়াল থেকে। আর চুপ করে থাকতে পারলো না। এগিয়ে এসে বললে, তুই কি জোর করে বাবাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিবি দাদা ?

হ্যাঁ, দরকার হলে তাই করতে হবে। ঐ ভদ্রলোকটি সোজা কথার মানুষ নন।

দাদা তোর এতটা অবনতি হয়েছে—মণিকা বললে।

তাই নাকি ! অবনতি আমার হয় নি। হয়েছে তোদের, এস. এন.-এর রক্ষিতার বাড়িতে এসে উঠেছিস।

বিভাবতী পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন বিমানের, হঠাৎ ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন বিভাবতী বিমানের গালে। বের হয়ে যা, বের হয়ে যা এখান থেকে।

যাবো। চিঠিটা দাও।

না, চিঠি দেবেন না উনি।

বেশ, ভাল কথায় যখন দিলেন না, বিমান রায়ও জানে কি করে চিঠি আদায় করতে হয়। একবার রাস্তায় বের হোস তোরা, কথা-গুলো বলে বিমান ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। অমলেন্দু বললেন, দাঁড়া নিয়ে যা চিঠি।

মণিকা বললে, না, বাবা—না।

মণি কাগজ কলম দে, চিঠিটা লিখে দিই।

মণিকা দিল না অমলেন্দুই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাগজ কলম এনে একটা দু' লাইনের চিঠি লিখে দিলেন।

থ্যাংক ইউ।

বিমান চিঠিটা পকেটে পুরে বের হয়ে গেল।

অমলেন্দুর সমস্ত শরীরটা কাঁপছিল। মণিকা তাড়াতাড়ি এসে অমলেন্দুকে ধরে শয্যায় শুইয়ে দিল। বিভাবতী স্বামীর শিয়রে বসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

এমনি করে আর কতকাল এখনো বেঁচে থাকতে হবে বিভা, বলতে পারো।—ভাঙ্গা গলায় থেমে থেমে অমলেন্দু কথাগুলো বললেন।

আর ঠিক সেই সময় দরজার মাথায় কলিং বেলটা ডিং ডং করে বেজে উঠলো। চন্দনা স্নান করবার জন্য ব্যথরুমে যাচ্ছিল বেল শুনে থমকে দাঁড়াল। কে আবার এ সময় এলো।

সনৎ কলকাতায় নেই। দু'দিন হলো মাদ্রাজে ব্যবসা সংক্রান্ত একটা কাজে গিয়েছে, ফিরতে দু'চার দিন তার দেরি হবে।

বঙ্কিমও শুনতে পেয়েছিল শব্দটা, সেই এগিয়ে এলো।

দেখ ত বঙ্কিম কে ?

বঙ্কিম এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলতেই এক অপরিচিত যুবককে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো।

কাকে চান ?

এইটে ত এস. এন.-এর ফ্ল্যাট ?

হ্যাঁ, কিন্তু সাহেব ত নেই।

নেই ?

না। সাহেব মাদ্রাজে গিয়েছেন।

আর কেউ নেই ?

মা আছেন।—বঙ্কিম বললে।

তাঁকে বল গিয়ে কঙ্কণ দত্ত একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আপনি ভিতরে এসে বসুন, আমি মাকে খবর দিচ্ছি, কঙ্কণকে বাইরের ঘরে বসিয়ে বঙ্কিম ভিতরে চলে গেল।

চন্দনা তোয়ালেটা হাতে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। বঙ্কিম এসে ঘরে ঢুকল, মা—

কে বঙ্কিম ?

নাম বললেন কঙ্কণ দত্ত।

তা বলো নি যে তোমার সাহেব বাড়িতে নেই ?

বলেছি, উনি বললেন আপনার সঙ্গে উনি দেখা করতে চান। বাইরের ঘরে বসিয়ে এসেছি।

ঠিক আছে, তুমি যাও আমি আসছি।

একটি দামী সোফার 'পরে বসে কঙ্কণ চারিদিক তাকিয়ে দেখছিল।

আজই দুপুরের ফ্লাইটে সে কলকাতায় এসেছে। হঠাৎ যে কেন বোম্বাই থেকে কলকাতায় এলো ব্যাপারটা নিজের কাছেই যেন কঙ্কণের স্পষ্ট নয়।

সেদিন মাস আষ্টেক আগে কণিকার মুখে সব শুনে মনে হয়েছিল কঙ্কণের—চন্দনার অধ্যায়টা তার জীবনে শেষ হয়ে গিয়েছে,

তাই আর একটা দিনও কলকাতায় থাকে নি কঙ্কণ—ঐ দিনই ইভনিং ফ্লাইটে কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

একমাসের ছুটি নিয়ে সেবারে কলকাতায় এসেছিল কঙ্কণ—কলকাতা থেকে ফিরে সোজা গিয়ে সে কাজে যোগ দিয়েছিল।

কমাণ্ডিং অফিসার নীলকান্ত যোশী শুধিয়েছিলেন, what's the matter—তুমি ফিরে এলে দত্ত ?

ছুটি চাই না আমার স্যার—

চাও না।

না।

What's the matter, anything worng ?

না—স্যার—

তারপর আটটা মাস—তাদের জাহাজ সিঙ্গাপুর-মালয়-বোর্নিও ঘুরে বেড়িয়েছে, জলের উপরেই ভেসেছে কঙ্কণ।

গত কালই ভোরে বোম্বাই-এ জাহাজ নোঙ্গর করতেই ছুটি নিয়ে সে বের হয়ে পড়েছিল। কলকাতা যেন তাকে অদৃশ্য একটা টানে টানছিল। ঘুরে ফিরে কেবল চন্দনাকেই মনে পড়ছিল।

মণিকার মুখে চন্দনা সম্পর্কে যা শুনেছে তারপর আর চন্দনার কাছে আসার কোন অর্থ হয় না। তবে সে কেন এলো এখানে !

চন্দনা যদি না দেখা করে তার সঙ্গে। যদি ভৃত্যকে দিয়ে বলে পাঠায় যে দেখা হবে না। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ায় কঙ্কণ, আর ঠিক সেই মুহূর্তে চন্দনা এসে ঘরে ঢুকল। পরনে একটা দামী শাড়ি সাধারণ ভাবে পরা।

মাথায় ঘোমটা।

কপালে ও সিঁথিতে সিন্দুর। বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কঙ্কণ চন্দনার দিকে।

কঙ্কণ তুমি। উঃ, কতকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা, চন্দনা স্বাভাবিক ভাবেই বললে।

কঙ্কণ দাঁড়িয়ে উঠেছিল—চন্দনা বললে, বোস বোস—কঙ্কণ বসে পড়লো আবার।

তা তুমি আমার এখানকার ঠিকানা জানলে কি করে কঙ্কণ ?

জানতাম—

জানতে ?

হ্যাঁ—আট মাস আগে একবার কলকাতায় যখন এসেছিলাম তখুনি জানতে পারি।

কার কাছে ?

জেনেছি।

তা সে সময় দেখা করলে না কেন। ঠিকানাই যদি জানতে আমার—

মনে হয়েছিল তখন—

কি মনে হয়েছিল?

১৫

প্রশ্নটা করে চন্দনা কঙ্কণের মুখের দিকে তাকাল, সামনের একটা সোফায় বসতে বসতে।

এসে বোধহয় হঠাৎ এভাবে তোমাকে বিরক্তই করলাম চন্দনা, তাই না।—কঙ্কণ মৃদুকণ্ঠে বললে।

বিরক্ত ! বিরক্ত করবে কেন ?—মৃদু হেসে চন্দনা বলল।

কথাটা শুনলেও আমার কিন্তু সেদিন ঠিক বিশ্বাস হয় নি।

কি বিশ্বাস হয় নি ? চন্দনা তাকাল কঙ্কণের মুখের দিকে।

তুমি বিয়ে করেছো।

কেন, মেয়েদের বিয়েটা কি একটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার !

না—তা নয়—

তবে !

এভাবে বিয়ে করাটা—

হয়ে গেল। বলতে পারো কতকটা আকস্মিক ভাবেই হয়ে গেল।

তুমি কি জানতে না, যে এস. এন.-এর বৌ-ছেলে-মেয়ে আছে ?

কেন জানবো না। জানতাম বৈকি।

জানতে ?

নিশ্চয়ই।

তবু—

তবু কি করে বিয়ে করলাম ওকে তাই না ?

হ্যাঁ—মানে—

আমি ত মানুষটার অতীত ইতিহাসের কথা ভাবিনি সেদিন—কেবল মানুষটার কথাই ভেবেছিলাম। যাক সে সব কথা—কতকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা—তোমার কথা বলো।

আমার কথা।

হ্যাঁ—তোমার কথা, এতদিন কোথায় ছিলে, কি করছো ?

নেভিতে নাম লিখিয়েছি।

ওমা—তাই নাকি, তা হঠাৎ নেভিতে কেন ?

সে ত অনেক দিনের কথা।

কিন্তু আমি ত কিছু জানতাম না। হঠাৎ কেমন যেন একদিন অদৃশ্য হয়ে গেলে।

আমাদের শেষ দেখা যেদিন হয় তুমি একটা কথা বলেছিলে, মনে আছে নিশ্চয়ই তোমার ?

কি কথা বল তো ?

মনে পড়ছে না ?

আমি বলেছিলাম তোমাকে আমি ভালবাসি, তুমিও বলেছিলে—

কি বলেছিলাম বল ত ?

আমার সম্পর্কে কখনো সে কথাটা তুমি চিন্তা করো নি—তবে

বলেছিলে ভাল লাগে তোমার আমাকে—তাই আমি ভেবেছিলাম, দূরে চলে গেলে হয়ত ঐ ভাল লাগাটা কখনো ভালবাসায় পরিণত হতে পারে।

আশ্চর্য ত! তুমি তাই ভেবেছিলে নাকি কঙ্কণ?

সত্যি—বিশ্বাস করো তাই ভেবেছিলাম।

সত্যি?

সত্যি

তারপর?

তারপর তিন বৎসর পরে এলাম কলকাতায়—তোমার মনের সংবাদটা নিতে—

চা খাবে কঙ্কণ, চা বলি দিতে?

না থাক।

বাইরে বেশ গরম পড়েছে—কোন কোল্ড ড্রিংক।

না। থ্যাংকস!

কবে এসেছো কলকাতায়?

আজই দুপুরের ফ্লাইটে।

কোন কাজে বুঝি?

হ্যাঁ, কাজই ছিল একটা।

কোথায় উঠেছো? তোমার কাকার ওখানে?

না। গ্র্যাণ্ডে—

তবে ত কাছেই।

আচ্ছা আমি উঠি—উঠে দাঁড়ায় কঙ্কণ।

বাঃ, উঠবে কি? এখানে ডিনার খেয়ে তুমি যাবে রাত্রে।

কি বলে পরিচয় দেবে তোমার কর্তার কাছে, তোমায় তিনি যখন জিজ্ঞাসা করবেন আমি কে?

কর্তা মাদ্রাজে গেছেন—নেই। থাকলে সত্যি কথাই বলতাম।

বলতে পারতে?

কেন পারব না!

না। চন্দনা, সত্যিই এবার আমি উঠবো। তোমার ডিনারের আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ।

সত্যিই যাবে?—চন্দনা বললে।

তাই।

কোন জরুরী কাজ আছে নাকি?—প্রশ্নটা করে তাকাল চন্দনা কঙ্কণের দিকে।

না, কোনই কাজ নেই। এসেছিলাম ত একটিবার তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই—দেখা হলো, শোনা হলো—

কেবল আমার সঙ্গে দেখা করতেই কলকাতায় এসেছো—আমার কথা শুনতেই!

তাই—আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল। এসেছিলাম তোমার প্রতি আমার ভালবাসার সত্য মিথ্যাটা জানতে। আচ্ছা, একটা কথার সত্যি জবাব দেবে চন্দনা?

কি কথা?

তুমি কি আমাকে—

কি তোমাকে?

এতটুকুও ভালবাস নি কোনদিন। আমার অনুমানটা একেবারেই মিথ্যা।

জীবনে একজনকে—মাত্র একবারই ভালবেসেছি—

কে। কে সে চন্দনা?

জানো কঙ্কণ, আমার প্রতি তোমার অনুরাগটা যে বুঝতে পারি নি তা নয়—কিন্তু আমার মনে তোমার অনুরাগ কোন রঙ ধরাতে পারে নি। ভালবাসা কাকে বলে জানতেই পারি নি—পারলাম প্রথম সেই দিন যেদিন উনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মনে হলো যেন আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

কথাগুলো বলছিল চন্দনা ধীর শান্ত গলায় আর দু'চোখে যেন আশ্চর্য এক দীপ্তি—কঙ্কন অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

চন্দনা বলতে লাগল, অথচ উনি আমার চাইতে বয়েসে কত বড় —অনেকে বিস্মিত হয়েছে জানি—কিন্তু বিশ্বাস করো কঙ্কণ, আমার সেজন্য ভয়ও কম ছিল না—

ভয়! কিসের ভয়?

তা জানি না। তবে ভয়ে আমার বুক কেঁপেছে। কেউ বোঝে নি আমার সে ভালবাসা—কিন্তু তাতে কি এ'সে গেল। যাকে ভালবেসেছি তিনি ত বুঝেছেন—আমার তাই গর্বের অন্ত নেই।

তারপর অনেকক্ষণ দু'জনে চুপচাপ বসে রইলো। কারো মুখে কোন কথা নেই। ঘরের মধ্যে যেন একটা কঠিন স্তব্ধতা।

অন্ধকার বাইরে—

আজ তবে উঠি—কঙ্কণ বললে।

এসো।

কঙ্কণ উঠে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দিন দুই বাদে সনৎ ফিরে এলে চন্দনা বলেছিল, জান কঙ্কণ এসেছিল?

কে কঙ্কণ?

তুমি তাকে চিনবে না। সে আমাকে ভালবাসতো।

তার কথা ত কখনো আমাকে বলো নি?

না বলি নি। বলবার কোন প্রয়োজন বোধ করি নি।

সনৎ একটু একটু করে কঙ্কণের সব কথা চন্দনার কাছ থেকে জেনে নিলেন। শুনলেন কঙ্কণের সব কথা।

সনৎ বললেন, আগে কেন বলো নি চুনী কঙ্কণের কথা।

চন্দনা বললে, বললে কি হতো?

তোমাকে আমি একটা সুযোগ করে দিতাম।

কিসের সুযোগ?

সনতের কথাটা বলা হলো না, বঙ্কিম এসে বললো, ডাঃ রায় এসেছেন।

যা ডাক্তারবাবুকে বসতে বল গে—আমি আসছি স্নান সেরে—সনৎ বললেন।

বঙ্কিম চলে গেল।

ডাঃ রায় সনতের কাছে মধ্যে মধ্যে আসেন নিয়মিতভাবে। সনৎকে ইনজেকশন দিয়ে যান। চন্দনা কোন দিন জানতে চায় নি, কিসের ইনজেকশন দিতে আসেন ডাঃ রায় সনৎকে। চন্দনার জানার জন্য কোন কৌতূহল হয় নি।

আজ কিন্তু সনৎ বাথরুম ঢোকার পর চন্দনা পাশের ঘরে যেখানে ডাঃ রায় বসেছিলেন সেই ঘরে এসে ঢুকল।

ডাঃ রায়—

আসুন মিসেস ভট্টাচার্য।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো—যদি মনে কিছু না করেন।

কেন—মনে করবো কেন? বলুন না কি জানতে চান?

মধ্যে মধ্যে এসে আপনাদের এস. এন-কে কি ইনজেকশন আপনি দিয়ে যান! কিসের ইনজেকশন?

ডাঃ রায় কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে যান।

বলুন না কি ইনজেকশন দেন ওকে?

এই শরীর ভাল হবার জন্য—

সত্যি কি তাই?

হ্যাঁ—মানে—

আমার কিন্তু ধারণা তা নয়।

তবে কি?

তাই জানতে চাইছি।

মানে এই বয়সে হরমোন ইনজেকশন নিলে—

কি হয়?

শরীরের এনার্জি বাড়ে।

আপনি স্পষ্ট করে সব বলছেন না ডাঃ রায়—

ডাঃ রায় নিষ্কৃতি পেলেন কারণ ঐ সময় সনৎ এসে ঘরে ঢুকলেন। চন্দনা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ইনজেকশন এনেছো ডাক্তার ?—সনৎ জিজ্ঞাসা করলেন।

এনেছি মিঃ ভট্টাচার্য। একটা কথা আগেও বলেছি, আবারও বলছি। যতই ইনজেকশন নেন আপনি, বয়েসের ধর্মটা আপনি এড়াতে পারবেন না। ইনজেকশনের প্রভাবে যে শারীরিক উত্তেজনটা আপনি বোধ করেন সেটা ক্ষণস্থায়ী।

সে ত তুমি বলেছো—জানি।

কেবল তাই নয় এস. এন, এর একটা অন্যদিকও আছে—destructive দিক, তাও বলেছি আপনাকে।

তা বলেছো। যাক গে—আমার স্ত্রীকে আজ একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখো ত ওর শরীরটা যেন কিছুদিন থেকে ভাল যাচ্ছে না মনে হয়।

চন্দনাকে পরীক্ষার কথা বলায় সে বললে, না, না ডাঃ রায় আমাকে পরীক্ষা করতে হবে না। আমি সুস্থই আছি। বরং লক্ষ্য করছি ওর শরীরটাই ভাল যাচ্ছে না। সর্বদা যেন কেমন ক্লান্ত-বিষণ্ণ মনে হয়। ওকেই ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন।

বস্তুত চন্দনা সনতের জন্য সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। সনতের কিছু একটা হয়েছে কিন্তু সেটা সে বুঝতে পারছিল না। কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে মানুষটা। আগেকার সে হাসিখুশী নেই—ফুর্তি নেই।

একদিন রাত্রে চন্দনা তাই সনৎকে শুধায়, কি হয়েছে তোমার ?

কেন—ও-কথা বলছো কেন চুনী। আমার আবার কি হবে!

দিন দিন কেমন যেন তুমি বদলে যাচ্ছো। শরীরটা কি ভাল না ?

না, ও কিছু না—চল চুনী বাইরে কোথায়ও কিছুদিনের জন্য আমরা বেড়িয়ে আসি।

কোথায় যাবে ?

চল ইউরোপ ট্যুর করে আসি।

বেশ ত। চল তোমার যদি ইচ্ছা হয়।

কেন ইউরোপ যেতে তোমার ইচ্ছা হয় না ?

না।

ইচ্ছা হয় না ?

তোমার ইচ্ছা হলে চল না।

আশ্চর্য। আচ্ছা চুনী, তোমার কি কোন আকাঙ্ক্ষা নেই ?

আমার কোন আকাঙ্ক্ষা ত তুমি অপূর্ণ রাখ নি।—চন্দনা বললে।

সনৎ কেমন যেন চুপ করে গেলেন। চন্দনার মুখের দিকে তাকিয়েই রইলেন।

কি হলো ? চুপ করে গেলে যে ?

না। কিছু না।

না। কিছু তুমি ভাবছো। বল না কি ভাবছো গো ?

কি ভাবছি জান। প্রথম জীবনে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো না কেন।

চন্দনা হেসে ফেললো।

হাসলে যে।

তখন আমি কতটুকুই বা ছিলাম।

তাইতো ভাবি যদি আরো অনেক আগে জন্মাতে আরো দশ বছর আগে তোমার দেখা পেতাম।

পরে জন্মানোর জন্য খুব ক্ষতি হয়েছে বুঝি ?—চন্দনা বললে।

হয়েছে চন্দনা, হয়েছে তুমি বুঝবে না।

আমার ত মনে হয়—তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতোই। তাছাড়া পরে দেখা হয়েছে বলে ত আমার কোন দুঃখ নেই।

সত্যি বলছো চুনী ?

মিথ্যা বলবো কেন ?

আচ্ছা, চুনী, বরাহনগরের বাড়িতে তোমার মা বাবা আসার পর ত একদিন কই সেখানে তুমি গেলে না ?

খোঁজ ত সব সময়ই পাই। মণি ত প্রায়ই আসে।

আমিই তোমাকে তোমার মা-বাবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম—কথাটা যখনই মনে হয়—

বাঃ, তুমি দূরে সরিয়ে দেবে কেন ? আমিই যাই না।

তোমার বাবা কেমন আছেন আজকাল ?

সেরিব্রাল অ্যাটাকের পর শরীরটা তার একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে।

কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় বাবাকে তোমার কিছুদিনের জন্য পাঠিয়ে দাও না।

বাবা কি সম্মত হবেন ?

কেন হবেন না ? একটিবার বলেই দেখো না।

বলতে বলছো ?

হ্যাঁ, একবার বলে দেখো। কাল একবার বরাহনগর থেকে ঘুরে এসো।

যেতে ত ইচ্ছা করে কিন্তু মার কথা যখনই ভাবি—মা ত আমাকে ক্ষমাই করতে পারলো না।

ক্ষমা নিশ্চয়ই করছেন, নচেৎ তোমার বরাহনগরের বাড়িতে আসতেন না।

তোমার তাই মনে হয় ?

তাই মনে হয়।—সনৎ বললেন।

চন্দনা চুপ করে থাকে।

১৬

নিখিলেশই এলো একদিন বরাহনগরের বাড়িতে অমলেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে। বিভাবতী বাড়িতে ছিলেন না। কি একটা পুণ্যস্নানের যোগ আছে—বিভাবতী অমলেন্দু ছিলেন আর ছিল মণিকা।

নিখিলেশকে দেখে মণিকা বললে, তুমি।

নিখিলেশ বললে, হ্যাঁ এলাম তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। চল আমাকে তোমার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে।

কিন্তু—

কিন্তু কি আবার—তার কাছেই ত তোমাকে প্রার্থনা করতে হবে।

বাবা যদি বলেন, তা সম্ভব নয়। যদি বাবা এই বিয়েতে না মত দেন।

তা কেন দেবেন? তাকে ত তুমি জানিয়েছো আমাদের কথা। জানাও নি?

জানিয়েছি—

তবে?

বেশ চল।

অমলেন্দু ঘরের মধ্যে একটা আরাম চেয়ারের উপর বসে ছিলেন। সামনে খোলা জানালাটা, সেই দিকেই তাকিয়ে ছিলেন।

বাবা।

কে?

আমি।

মণি—কিছু বলবি মা

নিখিলেশ এসেছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কেন?

ঐ যে নিখিলেশ। এসো নিখিলেশ ঘরে এসো।—মণিকা বললে।

নিখিলেশ ঘরে ঢুকে অমলেন্দুর পায়ের ধুলো নিল। অমলেন্দু নিখিলেশের দিকে তাকালেন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুশ্রী চেহারা। চেহারার মধ্যে একটা স্মার্টনেস আছে।

আমি নিখিলেশ দাশ।

বোস।—শান্ত গলায় অমলেন্দু বললে।

আপনি বোধহয় শুনেছেন আমি আপনার মেয়ে মণিকাকে বিবাহ করতে চাই। আমি বাইরে বদলি হয়েছি—তাই আমার যাবার আগে মণিকাকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে যাবো। আপনার অনুমতি পেলেই সব ব্যবস্থা করতে পারি।

অমলেন্দু চুপ করে রইলেন। সেদিন মণিকাকে যাই বলুন না কেন, আজ যেন কথাটা নিখিলেশের কাছে উত্থাপন করতে পারছেন না।

আপনার অনুমতি পেলে একটা দিন স্থির করতে পারি!—নিখিলেশ আবার বললে।

আমি ত মণিকাকে অনুমতি দিয়েছি।

ঐ সময় বিভাবতী এসে ঘরে ঢুকলেন, তখুনি দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরেছেন তিনি। নিখিলেশ অনুমানেই বুঝতে পারে উনি মণিকার মা। নিখিলেশ এগিয়ে গিয়ে বিভাবতীর পদধূলি নিয়ে বললে. মা আমি নিখিলেশ। মণিকাকে বিয়ে করবার জন্য আপনাদের অনুমতি নিতে এসেছি—

বিভাবতী একটি কথাও বললেন না। ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেলেন। অমলেন্দু বললেন, তুমি কিছু মনে করো না নিখিলেশ। ওর মত তুমি পাবে না।

পাবো না?

বোধহয় না। কিন্তু আমি অনুমতি দিচ্ছি—

ঠিক আছে, আজ তাহলে আমি যাই—দিন ঠিক করে জানাবো। কথাগুলো বলে আবার প্রণাম করে নিখিলেশ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মণিকা তার পিছনে পিছনে গেল।

দরজার গোড়ায় এসে নিখিলেশ বললে, তোমার মায়ের অনুমতি ত পেলাম না মণিকা—

তোমার ভয় নেই। মণিকা বললে, বাধা উনি দেবেন না।

নিখিলেশ হাসলো।

ঠিক ঐ সময় এস. এন.-এর ইমপোর্টেড মারসিডিজ গাড়িটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। চন্দনা গাড়ি থেকে নামল।

নিখিলেশ, আমার দিদি—মণিকা বললে।

চন্দনা নিখিলেশের দিকে একবার তাকিয়ে মণিকাকে বললে, এই বুঝি নিখিলেশ মণি—

ঠিক চিনতে ত পেরেছেন দিদি—চিনলেন কি করে। কখনো ত দেখেন নি আমাকে আগে।

চন্দনা হেসে বললে, চিনতে পারবো না কেন, নাইরা আগে দেখলাম।

আমি মণিকাকে বিয়ে করছি, আপনি ত জানেন।—নিখিলেশ বললে।

জানি। মণিই বলেছে। তা কথাটা আমার বাবা মাকে বলেছো নিখিলেশ।

বলতেই এসেছিলাম, বাবা অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু মার অনুমতি পেলাম না।

ভয় নেই ভাই—আজ না পেলেও একদিন পাবে।

আচ্ছা দিদি আমি চলি। নিখিলেশ চলে গেল।

চন্দনা নিখিলেশের গমনপথের দিকে তাকিয়ে ছিল। বললে, বেশ ছেলেটি—চল বাবার কাছে যাই।

এসো।

ঘরের মধ্যে চুপ করে বসেছিলেন আরাম কেদারাটার 'পরে অমলেন্দু—সামনে দাঁড়িয়ে বিভাবতী।

যা মেনে নিতেই হবে বিভা, তা মেনে নেওয়াই ত ভাল—অমলেন্দু বললেন।

না, আমি কোন দিনই মেনে নিতে পারবো না।

কেন পারবে না। মেয়ে তোমার বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে—ও ওর জীবনসঙ্গী যদি কাউকে বেছে নেয়, আমরা কেন তার অন্তরায় হবো। নিখিলেশ জাতে আমাদের চাইতে ছোট তোমার কাছে, কিন্তু মানুষ হিসাবে আমার ত মনে হলো মণিকা ভুল করে নি। ছেলেটি ত বেশ। লেখাপড়া শিখেছে, ইঞ্জিনীয়ার—ভাল চাকরিও করে।

কি বলছো তুমি!

ঠিকই বলছি বিভা। চারিদিকে তাকিয়ে দেখছো না—সব কিছু কেমন পাল্টে গিয়েছে। আমাদের এতকালের ধ্যান, ধারণা নীতি

কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে। হয়ত এর প্রয়োজন ছিল—প্রয়োজন আছে। ওদের দাবী আমরা নাকচ করবো কি করে? দুঃখটা আজ আমাদের মনে বিভা—

ঐ সময় চন্দনা এসে ঘরে ঢুকল। বাবা—

কে—চুনী—আয় মা।

চন্দনা অমলেন্দুর পায়ের ধুলো নিল তারপর এগিয়ে গেল মায়ের দিকে পদধূলি নিতে। বিভাবতী আজ আর সরে গেলেন না।

মা—

বিভাবতী তাকালেন মেয়ের মুখের দিকে।

আমার সঙ্গে কি আর কখনো তুমি কথা বলবে না মা।

সত্যি বলছি চুনী, বিভাবতী বললেন, আমি আর বাঁচতে চাই না।

আমি কি চলে যাবো মা।

কোথায় যাবি? এ বাড়ি ঘর ত তোরই। তোরই দয়ায় দু'মুঠো অন্ন জুটছে, মাথা গুঁজবার মত ঠাঁইটুকু পেয়েছি—তোকে যেতে বলবো কোন্ মুখে।

চন্দনা মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বললে, আমি এমন কি অন্যায় করেছি মা যাতে করে তোমাদের কাছে একটিবার আসবার অধিকারটুকুও হারিয়েছি। তোমার ক্ষমাটুকু জীবনে আর আমি পাবো না?

ক্ষমা তোকে আমি অনেক দিনই করেছি চুনী, নচেৎ তোর এ বাড়িতে আমি পা রাখতাম না।

সত্যি বলছো মা?—চন্দনার দু'চোখের কোল জলে ভরে ওঠে।

মণি ত বিয়ে করছে—শুনেছিস মা।—অমলেন্দু বললেন।

জানি বাবা।

ছেলেটি ভাল তাই না রে?

তোমাদের আশীর্বাদে নিশ্চয়ই ভাল হবে।

তোর চেহারাটা এত খারাপ লাগছে কেন?—প্রশ্নটা করলেন এবার বিভাবতীই।

আমার শরীর ত বেশ ভালই আছে মা।

না। ভালো নেই। চোখের কোলে কালি পড়েছে—গলার হাড় বের হয়ে পড়েছে।

চন্দনা মাথাটা নীচু করলো।

বিভাবতীর চোখের দৃষ্টিকে চন্দনা সেদিন ফাঁকি দিতে পারে নি। সে ত শুধু নারীরই চোখের দৃষ্টি নয়—সে মায়ের চোখের দৃষ্টি।

এবং সেদিন যাবার আগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতেই সত্যটা প্রকাশ হয়ে গেল। চন্দনা সন্তানসম্ভাবিতা। পূর্বের সমস্ত আক্রোশ ও অভিমান ভুলে গিয়ে ব্যাকুলা জননী চন্দনাকে অনেক উপদেশ দিলেন, সাবধানে থাকবি চুনী, মেয়েদের এ সময়টা সর্বদা সতর্কে থাকতে হয়।

চন্দনার মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা গত কিছুদিন ধরেই তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল, সেটা যে তার গর্ভে সন্তান আসার দরুনই সে সম্পর্কে নিঃসংশয় হলো।

রাত নয়টা নাগাদ চন্দনা তার ফ্ল্যাটে ফিরে এলো।

সনৎ ঘণ্টা দুই হলো ফিরেছেন। স্নান করে হুইস্কির বোতল নিয়ে বসেছিলেন। বঙ্কিমই বলেছিল, চন্দনা বরাহনগরে গিয়েছে।

চন্দনা এসে ঘরে ঢুকতেই সনৎ ওর মুখের দিকে তাকালেন।

বরাহনগরে গিয়েছিলে ?—সনৎ শুধালেন।

হ্যাঁ।

সব কেমন আছে ?

ভাল।

চেঞ্জে যাবার কথা তোমার বাবাকে বলেছিলে ?

না। বলি নি। কাল পরশু আবার যাবো তখন বলবো।

মার সঙ্গে দেখা হলো ?

হয়েছে—

চন্দনার জবাবগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও সনৎ বুঝতে পারেন চন্দনা আজ বেশ উৎফুল্ল। সনৎ বললেন, ভেবেছিলাম সামনের মাসেই ইউরোপ যাবো, কিন্তু তা বোধ হয় হবে না চুনী।

কেন ?

কাপড়ের মিলে নতুন যে মেসিনটা এসেছে, সেটা গোলমাল করছে, তা ছাড়া লেবারাররা বড্ড উৎপাত শুরু করেছে।

শ্রমিক অশান্তি ?

তাই, ব্যাপারটার একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত বোধ হয় যাওয়া হবে না।

তা তোমার মিলে ত কোন শ্রমিক অশান্তি ছিল না, হঠাৎ কি হলো ?

এস. এন. হাসলেন। বললেন, শালাবাবু যে আজকাল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হয়েছেন।

কে ? দাদা ?

হ্যাঁ।

দাদা এই সব ঘোট পাকাচ্ছে ?

দোষ তার একার দেওয়া যায় না চুনী। চারিদিকেই ত আজকাল ঐ সব চলছে।

চন্দনা বললে, এখন দেখছি দাদাকে তোমার ঐ মিলে চাকরি দেওয়াটাই অন্যায় হয়েছে, আমি একবার দাদার সঙ্গে দেখা করবো ?

না, না—

কেন ?

সে তোমার কোন কথাই শুনবে না।

কিন্তু—

ব্যস্ত হয়ো না, সনৎ বললেন, দেখাই যাক না কত দূর ব্যাপারটা গড়ায়।

ঐ সময় বঙ্কিম এসে বললে, ডাক্তার রায় এসেছেন ইনজেকশন দিতে।

যা এই ঘরে ডেকে আন ডাক্তারবাবুকে—এস. এন. বললেন।

আমি তাহলে পাশের ঘরে যাই ?—চন্দনা বললে।

যাবে ? তা যাও।

চন্দনা উঠতে গিয়ে হঠাৎ তার মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো। টলে পড়ে যাচ্ছিল চন্দনা। সনৎ তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে চন্দনাকে ধরে ফেললেন।

কি হলো?

না, কিছু না—মাথাটা হঠাৎ যেন কেমন—চন্দনা এড়াবার চেষ্টা করে।

ডাক্তার একে একটু ভাল করে দেখ তো—সনৎ বললেন।—ডাঃ রায় ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকেছেন।

চন্দনা বাধা দেয়, না, না, আমার কিছু হয় নি।

সনৎ শুনলেন না। বললেন, আমি অন্য ঘরে সরে যাচ্ছি, ডাক্তার ওকে একটু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ।

সত্যি আমার কিছু হয় নি,—আবারও চন্দনা বললে।

এস. এন. কান দিলেন না চন্দনার কথায়। ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

মিনিট কুড়ি বাদে চন্দনাকে পরীক্ষা করে ডাঃ রায় সনতের ঘরে ঢুকলেন। She is carrying. সন্তান সম্ভাবিতা এস. এন.—

Is it—

হ্যাঁ।

সেই রাত্রে।

সনৎ চন্দনাকে বললেন, একটা কথা বলি চুনী যদি কিছু মনে না কর ত!

কি বলবে বল না?

তুমি যদি চাও ত ওটাকে আমি নষ্ট করবার ব্যবস্থা করতে পারি।

না, না। যেন আর্তকণ্ঠে একটা আর্তচিৎকার করে ওঠে চন্দনা।

তুমি বুঝতে পারছো না চুনী, পরে অনেক প্রবলেম দেখা দিতে পারে—

তুমি কি তোমার কথা বলছো?—চন্দনা প্রশ্ন করে।

না, আমার নয় তোমার কথাই ভাবছি আমি।

তাহলে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

চন্দনা!

যে আমার পেটে এসেছে সে ত আমার অনভিপ্রেত নয়, কোন পাপ বা অন্যায়ের মধ্যে ত তার জন্ম হবে না। পৃথিবীর আর দশটি সন্তান তাদের জন্মের যে দাবি নিয়ে আসে ও আমার তেমনিই আসছে। পৃথিবীতে আসার দাবি ওর কারো চাইতে কম নয়।

তবে আর আমার কি বলবার রইলো। তাহলে বরং এক কাজ করো—

কি?

এ সময়টা তুমি তোমার মা-বাবার কাছে গিয়ে থাকো।

না। আমি এখানেই থাকবো, তোমার কাছে আছি আমার ভয় কি?

সত্যি বলছো কোন ভয় নেই চুনী?

না। কোন ভয় নেই।

তা হলেও তোমার মা-বাবাকে বোধ হয় কথাটা জানানো দরকার।

মা জানেন।

জানেন?

হ্যাঁ।

তুমি তাহলে জানতে?

জানতাম বৈকি।

সনৎ আর কোন কথা বললেন না। তার পাশেই শুয়ে ছিল চন্দনা, তার গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

মণিকাকে বিয়ে করে নিখিলেশ পরের মাসেই তার কার্যস্থলে চলে গেল। এস. এন.-এর মিলের গোলমাল কিন্তু মেটে না। ক্রমশঃই ঘোরালো হয়ে উঠতে থাকে। এবং বিমানই যে পাণ্ডা তাও স্পষ্ট হয়ে যায়।

চন্দনা প্রায়ই আজকাল বরাহনগরে যায়। দুপুরের দিকে যায় সন্ধ্যার পরে ফেরে।

চন্দনাই একদিন কথাটা অমলেন্দুকে বললে।—ওর কাপড়ের কলে গোলমাল চলেছে বাবা। বোধ হয় লক-আউট হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। আর আমার দুঃখ ও লজ্জা কি জান বাবা, শ্রমিকদের খেপাচ্ছে দাদা।

সে কি মা?

হ্যাঁ বাবা। দাদা ত ঐ মিলেই চাকরি করে।

সনৎবাবু ওকে চাকরি দেন আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না মা। কিন্তু তোরা ত আমার কথা শুনলি না, ও যে কি চরিত্রের আমি ত জানি?

আরো একটা কথা তোমাকে এতদিন বলি নি বাবা।

কি কথা মা?

ওর স্ত্রীই সব মতলব দেয়, দলের সে এক চাঁই।

বিমানের বৌ!

চন্দনা বলল, হ্যাঁ মাধুরী।

ছিঃ ছিঃ! আমি ব্যাপারটা ভাবতেও পারছি না চুনী, যার কাছ থেকে এত বড় উপকারটা পেল, তারই বিরুদ্ধে—

ওসব নীতি ওদের নেই বাবা। ওদের কাছে ত এরা মুনাফাখোর, অন্যায় শোষকের দল। ওদের পাওনার উপরে এরা ভাগ বসাচ্ছে! দাদাকে মাধুরী একেবারে গ্রাস করেছে।

সনৎ খুব ব্যথা পেয়েছেন ব্যাপারটায় নিশ্চয়ই—অমলেন্দু বললেন।

না বাবা। ও এক আশ্চর্য মানুষ। ব্যাপারটা যে ঘটেছে আমিও ত জানতে পারি নি। জানলাম, যেদিন কৌতুকের ছলে হাসতে হাসতে আমাকে বললেন।

বিভাবতী পুজোর ঘরে ছিলেন। আজকাল বেশিরভাগ সময় বিভাবতী পুজো-আর্চা নিয়েই থাকেন। সংসারের কাজ ত এখন আর বেশী করতে হয় না। তিনটি মাত্র ত মানুষ। সুধার মা-ই সব

করে। হাট-বাজার থেকে শুরু করে রান্না পর্যন্ত। কিছুদিন আগে রামকৃষ্ণ আশ্রমের এক সন্ন্যাসী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রও নিয়েছেন।

মন্ত্র নেবার কিছুদিন পরে বিভাবতী মহারাজকে শুধিয়েছিলেন, বাবা আশীর্বাদ করুন যেন মনে শান্তি পাই।

সংসার থেকে মনকে সরিয়ে নাও মা—

কেমন করে সরাবো বাবা? তা যে পারি না কিছুতেই—সংসারে থাকতে হলে—

রামকৃষ্ণদেব বলতেন কি জান মা—হাঁস জলে থাকলেও যেমন তার গায়ে জল বসে না, তেমনি সংসারে থেকেও তাঁরই চিন্তায় তোমাকে সদা নিযুক্ত থাকতে হবে—ঐ হাঁসের মতই। দেখবে তখন তোমার মনের শান্তি তুমি পাবে। আর কোন দুঃখ থাকবে না।

কিন্তু কই—বিভাবতী ত তা পারছেন না। তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই তাঁর।

পুজো শেষ করে উঠতেই চন্দনার গলা তাঁর কানে গেল—আজকাল আর মেয়েকে এড়িয়ে চলেন না বিভাবতী। সে এলে তার সঙ্গে অনেক কথাই বলেন।

ঐ ঘরে এসে প্রবেশ করলেন বিভাবতী।

অমলেন্দু বললেন, শুনেছো তোমার গুণধর ছেলের কীর্তির কথা বিভা?

কেন, কি করলো আবার সে?

সনতের দয়ায় চাকরি পেয়ে তার মিলে এখন তারই পিছনে লেগেছে। সনতের মিলে গোলযোগ শুরু হয়েছে—

গতকাল দুপুরে তুমি যখন ঘুমাচ্ছিলে খোকা ত এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে—বিভাবতী বললেন।

এই বাড়িতে এসেছিল, তা হতভাগাটাকে দূর করে তাড়িয়ে দিলে না কেন?

তাড়িয়ে দিলেই কি ঝঞ্ঝাট এড়ানো যায়?—বিভাবতী বললেন।

না। আর কখনো তার সঙ্গে দেখা করবে না। এবারে এলে স্পষ্ট করে বলে দেবে আর যেন কখনো এ বাড়িতে না আসে।

এ বাড়ি ত তোমার নয়, বিভাবতী বললেন, যদি ঐ কথা বলে?

এটা চুনীর বাড়ি—

কথাটা তাহলে চুনীরই বলা ভাল নয় কি? বিভাবতী বললেন, চুনীই যেন কথাটা তার ভাইকে ডেকে বলে দেয়।

চন্দনা কিছু বললো না। উঠে দাঁড়াল, রাত হয়ে গেল, আজ যাই বাবা।

আয় মা।

চন্দনা ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বাইরে মোটর ছাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

ফ্ল্যাটে এসে দেখে সনৎ চুপচাপ বসবার ঘরে বসে আছেন, সামনে বোতল গ্লাস কিন্তু স্পর্শও করেন নি মনে হচ্ছে।

কোথায় গিয়েছিলে বরাহনগরে?—এস. এন. শুধালেন।

হ্যাঁ।

শেষ পর্যন্ত মিলে লক-আউট ঘোষণা করতে হলো চুনী—বললেন এস. এন.।

মিটমাট একটা কিছু শেষ পর্যন্ত হলো না?—চন্দনা শুধালো।

না। ও পক্ষের দাবি অনেক—তা ছাড়া আমি ত জানি আজকের সব দাবি ওদের মেনে নিলে, দুদিন পরেই আবার ওদের নতুন দাবি পেশ করবে। মীমাংসা এসব ক্ষেত্রে হয় না। আরো একটা ব্যাপারে বিশেষ করে আমি চিন্তিত চুনী।

কি ব্যাপার?

থাক। শুনে তোমার কাজ নেই।

আপত্তি থাকলে বলো না।

আপত্তি আর কিছু না—বলাটা তোমাকে শোভন হবে কিনা সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না।

এস. এন. বললেন, ইউনিয়নের লিডার শালাবাবুকে আজ সন্ধ্যায় আমার অফিসে দেখা করতে বলেছিলাম।

এসেছিল দাদা ?—চন্দনা শুধালো।

হ্যাঁ—কথাবার্তা বলে যা বুঝলাম—

কি বুঝে?

ও একটা মোটা রকম টাকা চায়।

টাকা! কি বলছো তুমি ?

হ্যাঁ—টাকা। সেই টাকা পেলে ও গোলমাল মিটিয়ে দেবে।

তুমি রাজী হয়েছো নাকি ?—চন্দনার গলার স্বরে উৎকণ্ঠা।

এস. এন. হাসলেন, না! স্পষ্টই বলে দিয়েছিলাম যদি স্ট্রাইক না করে আমি লক আউট ঘোষণা করবো না, কিন্তু ও রাজী হলো না। তাই লক আউট ঘোষণা করা হলো, আজ রাত আটটা থেকেই মিল বন্ধ।

দাদার মাথায় ঐ সব দুর্বুদ্ধি কেমন করে যে এলো।

ব্রেন তো শালাবাবুর নয়—ওরা ত যন্ত্র মাত্র। আসল ব্রেণ—কিছু রাজনৈতিক লিডারের। মিল সাত আট মাস বন্ধ থাকলে সনৎ ভট্টাচার্যের খানিকটা আর্থিক ক্ষতি হবে ঠিকই—কিন্তু মিলের অতগুলো কর্মচারী শ্রমিক তাদেরও ত কম ক্ষতি হবে না—তারপর প্রোডাকসন বন্ধ থাকলে ক্ষতি ত সরকারেরও—আজকের শ্রমমন্ত্রী তা বুঝেও দলের স্বার্থ টাই বড় করে দেখছেন।

তবে ?

সনৎ বললেন, ওদের কাছে দেশের স্বার্থের চাইতে দলের স্বার্থ অনেক বড়। তার চাইতে বেশী নেতাদের ক্ষমতার লোভ, কাজেই এ হতে বাধ্য। ইতিমধ্যে বড় বড় তিনটে কারখানায় স্ট্রাইক চলেছে—আমাদের ত লক-আউট ঘোষণা করা হলো। এতে করে দেশের বিশেষ

করে পশ্চিম বাংলার ইনডাস্ট্রিই যে ক্রিপলড্ হয়ে যাচ্ছে—দলের স্বার্থ দেখতে গিয়ে এই বড় দিকটা যে কেন ভাবে না—ভাবতে চায় না—সেটাই আমার কাছে বিস্ময়। এই গোলমালে দুজন বড় বড় কারবারী ত তাদের কারবার গুটিয়ে বাঙ্গালোরে চলে গেল। ভাবছি আমাকেও না একদিন যেতে হয়—

আচ্ছা—লক আউট ঘোষণা করা হলো যখন—মাইনে ত পাবে না ওরা কেউ ?

না পাবে না। তবে অর্থের অভাব ওদের তেমন হবে না।

কেন ?

দলীয় স্বার্থে সবাই টাকা যোগাবে ওদের।

বাবা মাকে আজ মিলের গোলমালের কথা বললাম—চন্দনা বললে।

ছিঃ ছিঃ চুনী, ওদের কেন বলতে গেলে ?

সব কিছুর মূলেই যে আমার ভাই—সেটা কি করে ভুলি বল ?

ভাই কি করেছে সে কারণে তোমার দুঃখ বা লজ্জা পাবার তো কিছু নেই। ওকে যে সেদিন মিলে চাকরি দিয়েছিলাম সেও তোমার কথা ভেবেই। কি জান চুনী, দোষ বিমানেরও নয়। আজকাল এক শ্রেণীর ছেলে আছে, যারা ঠিক ঐ ভাবেই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়—ইনডাসট্রিয়ালিস্টদের উপরে একটা ঘৃণা ওরা পোষণ করে মনে মনে—

কিন্তু কেন ?

ঐ কেনর জবাব পেতে হলে তোমাকে আজকের তরুণ সমাজের সত্যিকারের চেহারাটা উপলব্ধি করতে হবে। যাগ গে—ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। ভেবেছিলাম সামনের মাসেই ইউরোপ যাবো তোমাকে নিয়ে, তা বোধহয় আর হলো না। অনির্দিষ্ট কালের জন্য লক আউট ঘোষণা করলাম—এই পরিস্থিতির একটা অদল-বদল না হওয়া পর্যন্ত দেখছি এখানেই থাকতে হবে।

চন্দনা মিথ্যা বলে নি।

বিমান তার স্ত্রী মাধুরীর পরামর্শেই চলছিল। মাধুরী তাদের দলের

একজন নামকরা পাণ্ডা কর্মী। সারারাত ধরে মাধুরী লক আউট ঘোষণা করা হয়েছে শুনে বিমানকে বোঝাচ্ছিল কি করতে হবে। এবারে তাদের কি কর্তব্য।

বলছিল, তোমাদের মনোবল হারালে চলবে না বিমান। তোমাদের দাবি আজ না হোক কাল—কিম্বা পরশু ওদের মেনে নিতেই হবে, they must আপোষ আলোচনায় আসবেই জেনো।

তোমাকে বলি নি মাধু, এস. এন. ইউনিয়নের লিডার হিসেবে আজ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তাই নাকি! তা কি হলো?

আমি ওকে একটা প্রোপোজাল দিয়েছিলাম।

কি প্রোপোজাল?

বিমান বললে, বলেছিলাম হাজার দশেক টাকা দিলে মিটিয়ে দেবো।

এত তাড়াতাড়ি ওকথা বলতে গেলে কেন?

বসির, দীনেশ, বিল্টু—ওরাই পরামর্শটা দিয়েছিল।

আমাকে একবার তোমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

আমি ভেবেছিলাম উনি রাজী হয়ে যাবেন।

কেন? তোমার বোন ওর রক্ষিতা বলে?

ছিঃ মাধু—

গায়ে ফোস্কা পরলো বুঝি?

না—ফোস্কা পড়ে নি—তুমি ভুলে যাচ্ছো ও আমার বোন।

বোন বলে অস্বীকার করতে ঐ মেয়েমানুষটাকে লজ্জা হয় না তোমার?

না হয় না। তাছাড়া শুনেছি এস. এন. ওকে বিয়ে করেছেন।

কোন্ মতে বিবাহটা হলো—শৈব মতে না গান্ধর্ব মতে?

রেজিস্ট্রী করে।

বল কি! তা হলে ত পলিগেমির চার্জে পড়বেন ভদ্রলোক। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বর্তমান। ঠিক জান তুমি রেজিস্ট্রী করে বিয়ে হয়েছে?

ঠিক জানি না—তবে আমার মনে হয়।

মনে হয় তোমার ?

হ্যাঁ।

নাঃ, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। ভাল করে খোঁজ নাও ব্যাপারটা।

না।

না মানে ?

দেখ তোমার পরামর্শে দলিল চুরি করে এনে সেটা দেখিয়ে ব্যাঙ্কে বাবার সই জাল করে টাকা বার করেছিলাম ব্যাঙ্ক থেকে—এস. এন. অবশ্যম্ভাবী জেল খাটা থেকে আমাকে রেহাই দিয়েছেন ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়ে—তুমি ত সবই জান—ওকে আমি ঐ দিক দিয়ে ঘাঁটাতে পারবো না—লোকটা influential ও প্রচুর টাকার মালিক। ওসব মতলব ছেড়ে দিয়ে লক-আউট কি করে সামাল দেবো তাই ভাবো।

তুমি যে এস. এন.-এর ভয়েই কেঁচো হয়ে গেলে দেখছি।

না। তা হই নি। কিন্তু চন্দনা-এস. এন.-এর ব্যাপার নিয়ে আর আমি ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারবো না।

একটা চরিত্রহীন লম্পট—আর একটা বেশ্যা মাগী—

আমার বোনকে বেশ্যা বলছো—তুমি কি ? আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে ত বটেই—বিয়ের পরও পার্টিতে কতজনের শয্যায় শুয়েছো ; ভাবো আমি কিছু জানি না ?

জানবে না কেন—আমি ত কিছু লুকোছাপা করি না।

থাক, থাক আর বড়াই করতে হবে না।

বড়াই আমি করছি না—মাধুরী বললে, তবে আমি এখুনি চললাম।

চললে মানে ?

মানে চললাম। আমাদের সম্পর্কের এই শেষ।

তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী—

হ্যাঁ। তবে সেটা আমাদের contact marriage.

কি বলছো মাধুরী ? রেজিষ্ট্রী করে—

আইন দেখিও না। চললাম good night. মাধুরী এক কাপড়েই বের হয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে এগুলো।

না, না,—শোন. শোন মাধুরী—আমি আমার কথা withdraw করে নিচ্ছি—আমাকে ক্ষমা করো।

না, যেতে দাও আমাকে।

শোন, মাধুরী শোন—

মাধুরী এক ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল বিমানকে, তার পর বের হয়ে গেল।

বিমান স্তব্ধ হয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে।

পার্টি'র অন্যতম পাণ্ডা বসির আহমের ও গোপাল নাগ এসে ঘরে ঢুকল।

বসির বললে, মাধুরী কোথায় বিমানবাবু ?

নেই।

নেই ! কোথায় গিয়েছে ?

জানি না—বিমান বললে।

বসির বললে, কখন ফিরবে, বলে গিয়েছে কিছু ?

ফিরবে না।

ফিরবে না মানে ? কি আবোলতাবোল বকছেন বিমানবাবু !

খুব সম্ভবতঃ আপনার ডেরাতেই সে গিয়েছে—টালীগঞ্জে।

আমার ডেরায় ?

হ্যাঁ, রাতটা ত কাটাতে হবে, তা ছাড়া পুরাতন বন্ধু ত অনেক দিনের আপনি।

কি ব্যাপার বলুন ত বিমানবাবু ?

মাধুরী একটু আগে আমাদের সম্পর্ক নাকচ করে দিয়ে চলে গিয়েছে বাড়ি ছেড়ে।

সে কি ! কেন—কি হয়েছিল ?

ঐ সব মেয়েছেলেদের কোন 'কেন'র দরকার হয় না।

মাথা গরম করবেন না এ সময় বিমানবাবু—সামনে আমাদের অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব—আমার ওখানেই যদি সে গিয়ে থাকে ত চলুন আমার সঙ্গে—আমি সব মিটিয়ে দেবো, সত্যি কি যে ঝামেলার সৃষ্টি করলেন, আপনারা বড্ড ছেলেমানুষ।

বিমান বললে, আপনারা যান আহমেদ সাহেব—আমি যাবো না।

ছেলেমানুষী করবেন না, বসির আহমেদ বললে, চলুন—চলুন—

না। যাবো না। বিমান দৃঢ়কণ্ঠে বললে, তার সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক নেই।

বসির আহমেদ বিমানকে হাতছাড়া করতে চায় না! সে ত জানে বিমানের বোনের বাবু হচ্ছে ঐ এস. এন.—মিলের মালিক। বিমান হাতে থাকলে শেষ পর্যন্ত বেশ একটা মোটা টাকা বাগানো যাবে।

বসির বললে, আচ্ছা পাগল ত আপনি—আরে মশাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাটি কথা কাটাকাটি অমন হয়ই তাই বলে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় নাকি?

আমি যা বলেছি বসির সাহেব, তার নড়ন চড়ন হবে না। কোন সম্পর্কই আর তার সঙ্গে আমার নেই।

এই তাহলে আপনার শেষ কথা?

হ্যাঁ—শেষ কথা।

তা হলে ত আমাদের ইউনিয়নেও আপনার আর জায়গা হবে না—বসির আহমেদ বললে।

ঠিক আছে আমার নামটা আপনাদের ইউনিয়ন থেকে কেটে দেবেন।

বসির আহমেদ অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এবং গোপালের দিকে তাকিয়ে বললে, আমি যাচ্ছি, আপনি আসুন।

বিমান চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালো, গোপাল নাগকেও একটা দিল।

বসিদ আহমেদই কথা বলছিল—গোপাল নাগ একটি কথাও বলে নি। এতক্ষণ চুপটি করে, একপাশে দাঁড়িয়েছিল।

গোপাল নাগ বললে, বিমানবাবু কাজটা বোধহয় আপনি ভাল করলেন না !

বিমান বললে, ঠিকই করেছি।

না, করেন নি। ইউনিয়ন থেকে দলের কেউ বের হয়ে গেলে—ইউনিয়ন তাকে ক্ষমার চোখে দেখে না, ব্যাপারটা মিটিয়ে নিলেই বোধহয় ভাল হতো—গোপাল নাগ বললে।

ও মেয়েমানুষটার আর আমি মুখদর্শন করতে চাই না, তার জন্য ইউনিয়ন ছাড়তে হলেও আমি ছাড়বো।

তাহলে আপনি আপনার মত বদলাবেন না। ঠিক আছে আমি আর কি বলবো, অবিশ্যি দোষ দিই না, আপনার। ঐ মাধুরী মণ্ডলকে কেউ সহ্য করতে পারে না, অথচ মেয়েটা পার্টি'র একজন influential মেম্বার, দলের চাঁইরা প্রত্যেকেই ওর কথায় ওঠে বসে।

তা আর হবে না কেন ? যে চায় সেই যে ওর দেহটা পায়—ওটাই ত ওর asset—মূলধন।

গোপাল নাগ হাসলো।

হাসছেন গোপালবাবু, জেনেশুনেই ঐ বেশ্যাটাকে আমার ঘাড়ে আপনারা চাপিয়েছিলেন।

আপনিও ত মিল্ক ডিপোতে আলাপ হবার পর একেবারে ঢলে পড়েছিলেন বিমানবাবু।

তখন ত বুঝতে পারি নি। দেহটার ওর কাছে কোন মূল্য নেই। নিজের স্বার্থে ও ওর দেহটাকে পণ্যের মত বিকিয়ে দিতে পারে।

আপনি কিছু জানতেন না ওর সম্পর্কে।

না, বিয়ের কয়েকমাস পর থেকেই একটু একটু করে জানতে পেরেছি—কিন্তু তবুও ওকে আমি সহ্য করেছি।

কেন করলেন ?

ভেবেছিলাম—

কি ভেবেছিলেম ?

আমার ভালবাসা দিয়ে ওকে একটু একটু করে নিজের মনের মত

করে গড়ে নিতে পারব। বুঝতে পারি নি তখন যে বাঁশে একবার ঘুণ ধরে গেলে—সে ঘুণ ক্রমশঃ সমস্ত বাঁশটিকে ফোঁপড়া করে দেয়।

আচ্ছা আমি তাহলে চলি বিমানবাবু অনেক রাত হলো।

রাত তখন প্রায় বারটা হবে, মধ্য রাত্রি।

বসির, পঞ্চানন, গোপাল ঘরের মধ্যে একটিমাত্র শয্যার উপরে বসেছিল—অদূরে একটা মোড়ার উপর বসেছিল মাধুরী মণ্ডল।

এটা বসির আহমেদের ডেরা। টালীগঞ্জ আনোয়ার শা রোডের কিছুটা দূরে একটা দোতলা বাড়ির একতলায় পাশাপাশি দুটো ঘর।

যে ঘরের মধ্যে ওরা বসেছিল সেটা বসিরের শোবার ঘর। পাশের ঘরটায় প্রয়োজন মত পার্টির লোকেরাই থাকে। কাছেই একটা রেস্টুরেণ্ট কাম হোটেলের মত আছে—চা ও খাবার বসির সেখান থেকে আনিয়ে নেয়। গোপাল কিছুদিন থেকে বসিরের সঙ্গেই আছে।

ঘরের মধ্যে বিশেষ কোন আসবাবপত্র নেই।

একটা চৌকিতে সাধারণ শয্যা পাতা—ছোটা একটা টেবিল, খান দুই টিনের চেয়ার—হাতলহীন আর গোটা পাঁচেক মোড়া। এক কোণে টিনের ট্রাঙ্ক। এক পাশের দেওয়ালে একটা আরশি ঝুলছে। একটা দেওয়াল আলমারি আছে—তার মধ্যে বাসনপত্র থেকে যাবতীয় খুঁটিনাটি মায় জামাকাপড় সব কিছু থাকে। আর নির্বিবাদে তার মধ্যে বাস করে এক ঝাঁক আরশুলা।

মাধুরী বলছিল—সব কিছুর জন্য তুমিই দায়ী বসির।

আমি!

নয়, তুমি না বললে কি ওকে আমি বিয়ে করতাম? একটা মেরুদণ্ডহীন কাওয়ার্ড—

আর ওসব কথা ভেবে লাভ নেই মাধু—বসির বললে।

না—সে সব আমি ভাবছি না, মাধুরী বললে—আমি ভাবছি লোকটা আমাদের দলের না ক্ষতি করে—

গোপাল হেসে উঠলো, ক্ষতি আবার ওর মত একটা মানুষ কি করতে পারে ?

মাধুরী বললে, পারে পারে—ওরাই ক্ষতি করতে পারে—পিছন থেকে চোরা গোপ্তা চালিয়ে—

তাহলে কি করতে বল মাধুরী—বসিরের প্রশ্ন।

কি আবার শেষ করে দাও—

কিন্তু—

কিন্তুর আবার কি আছে এর মধ্যে ?

আছে। ভুলে যেও না মাধু, ওর সন্তান আজ তোমার গর্ভে।

মাধুরী হেসে উঠল, বললে, সে যে ওরই সন্তান তার প্রমাণ কি? তোমার, সরযূর বা ব্রতীনবাবুরও ত হতে পারে।

তা বটে—গোপাল বললে, তবে এত দিন তোমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে বাস করেছ, লোকে বলবে ও বিমানেরই সন্তান। কেন যে ঐ ভুলটা করলে মাধুরী ?

আমি স্বীকার না করলেই হলো।

সে ত আর এক ঝামেলা।

কেন, ঝামেলাটা আবার কিসের ?

ঝামেলা নয়—ছেলে হাসপাতালে হলে তার একটা বাপ একটা মা থাকা দরকার।—গোপাল বললে।

তবে কি করতে বলো আমায় ?—মাধুরীর প্রশ্ন।

ওটা নষ্ট করে ফেল।

না, মাধুরীর কণ্ঠ দৃঢ়।

না মানে!

ছেলে আমি নষ্ট করবো না।

তবেই ত মুস্কিল—একটা যে বাপের দরকার।—গোপাল বললে।

মাধুরী বললে, কেন তুমি, বসির, ব্রতীনবাবু—

পাগল নাকি—তাই কখনও হয়। বসির বললে, ও শালা কথায় বলে বাপ। সে দায়িত্ব নেওয়া চারটিখানি কথা নাকি ?

ও। ঐ সম্পর্কটুকুর দাবি আমার ছেলে তোমাদের কারো কাছে করতে পারে না ?

পারত যদি বিমান মাঝখানে এক বৎসরের বেশী কিছু সময় নষ্ট-চন্দ্রের মতো উদয়, না হতো।—গোপাল বললে।

এখন তাহলে পারো না।—মাধুরী বললে।

না, আইনে যে বাধে।—বসির বললে।

ঠিক আছে—আমি চললাম। হঠাৎ মাধুরী মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল।

আরে শোন—শোন মাধু—

মাধুরীর সারা শরীরটা তখন রাগে দুঃখে ও লজ্জায় কাঁপছে। ধরা গলায় বললে, তাহলে সকলে তোমরা এতদিন কেবল খেলাই করেছো। আমার এই দেহটাকে তোমাদের ক্ষুধার সামগ্রী বলে ভোগ করে এসেছো, বোকা—বোকা আমি একটা নিরেট বোকা—

মিথ্যা তুমি রাগ করছো মাধুরী—গোপাল আরো যেন কি বলবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই একটা প্রচণ্ড ঘৃণার দৃষ্টি ওদের দিকে হেনে মাধুরী ঘর ছেড়ে চলে এলো একেবারে রাস্তায়।

তাই ত। রাস্তায় বের হয়ে ঐ মধ্য রাত্রে মাধুরীর প্রথম যে কথাটা মনে হলো, এখন সে কোথায় যাবে ? কালীঘাটে যাবে, তার মা বাবা সেখানেই সে যাবে ? হ্যাঁ, সেই ভাল। তা ছাড়া আর তার যাবার জায়গাই বা কোথায়। মাধুরী হাঁটতে লাগল তার বাপ শরৎ মণ্ডলের কালীঘাটের বাসার দিকে।

শরৎ মণ্ডল কোন একটা অফিসের কেরানী। এক ছেলে এক মেয়ে—বসন্ত আর মাধুরী। মাধুরী স্কুল ফাইনাল পাস করে কলেজে পড়তে পড়তেই ঐ দলে গিয়ে ভিড়ে। সেই সময় একটা মোটর অ্যাক্সিডেন্টে একেবারে পঙ্গু হয়ে যান শরৎ। সংসারে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ছাড়া আর একজন ছিল বিধবা বোন কামিনী। বসন্ত তখন বি. কম. পাশ করে একটা কাজ যোগাড় করেছে বটে, কিন্তু মাইনা খুব বেশী

নয়। বাধ্য হয়ে তাই আই. এ. পড়তে পড়তেই মাধুরী মিল্ক সেন্টারের কাজটা নিয়ে নেয়। কিন্তু পড়াশুনা আর হয় না, পড়া বন্ধ করতে হয় তাকে। ক্রমে সে দলের মধ্যে একটা সুদৃঢ় আসন করে নেয়। ফলে আর্থিক অবস্থাটা আর তত খারাপ থাকে না। দলই কিছু কিছু মাধুরীকে প্রয়োজনমত সাহায্য করত।

বেশ ভালই চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন বিমান এসে সামনে দাঁড়াল। ওরা যে যাই বলুক, বিমানকে সে সত্যই বুঝি ভালবেসেছিল। এবং শুধু তাই নয় বিয়ে-থা করে একটা ছোট সংসার গড়বারও ইচ্ছা হয়েছিল তার। বসির গোপাল ওদের প্রয়োজনের দাবিটা যেন ক্রমশঃই বেড়ে চলেছিল।

মাধুরী যখন বিমানকে বিয়ের কথা বললো বসির গোপাল ও ব্রতীন অনেক ভেবেই আপত্তি জানায় নি। দলের একটা ছেলেকেই যদি মাধুরী বিবাহ করে মাধুরী এই দলেরই একজন থাকবে এবং কলকাতা শহরের উপরেই থাকবে। মাধুরী তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে না। সকলেই তাই একবাক্যে বলেছিল, নিশ্চয়ই মাধু বিয়ে করবে বৈকি!

মাধুরী সম্মতি দিল বিমানকে বিয়ে করবার জন্য।

আর একজন ঐ বিবাহের সঙ্গে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল কথাটা শুনে, মাধুরীর পিসী কামিনী। এগার বছর বয়সের সময় কামিনীর বিবাহ হয়েছিল এবং বার বছর বয়েসের সময় সে বিধবা হয়। স্বামী অঘোরচন্দ্র তিন দিনের জ্বরে মারা গেল।

শশুরগৃহে কিন্তু তার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে তার শ্বশুর শাশুড়ী ও দেওরেরা। তবু বসিরহাটে তার স্বামীর ভিটে কামড়ে পড়েছিল। কিন্তু দশ বৎসর পরে আর পারল না। এক রাত্রে যখন ছোট দেওর তার ঘরে এসে অতর্কিতে জড়িয়ে ধরলো বুকের মধ্যে। সে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে তার হাতে দাঁত বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

কামিনী বুঝতে পেরেছিল আর সেখানে থাকা চলবে না। ভোরের

ট্রেনে বালীগঞ্জ স্টেশনে এসে নেমে হাঁটতে হাঁটতে কালীঘাটে শরতের গৃহে এসে উপস্থিত হলো।

কামিনী তুই!—শরৎ বললেন।

ওখানে আর থাককে পারলাম না দাদা—বলে কেঁদে ফেলল কামিনী। শরতের স্ত্রী সরোজিনীও পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ঐ ননদটিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ঐ শান্ত, ধীর মেয়েটির জীবন সত্যিই সেখানে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। সরোজিনী কামিনীর হাত ধরে ঘরের মধ্যে তাকে নিয়ে গেলেন।

কামিনী ভ্রাতৃজায়াকে কাঁদতে কাঁদতে সব খুলে বললে।

সরোজিনী সব শুনে বললেন, এখানেই থাক তুমি ভাই। আমাদের যদি দু'বেলা একমুঠো জোটে তোমারও জুটবে।

সেই থেকেই কামিনী ঐ গৃহে।

মাধুরীর সচ্ছল উপার্জনের পিছনে একটা অশুচিতা আছে কামিনী সেটা টের পেয়েছিল। সে কারণে তার দুঃখের অবধি ছিল না। তাই মাধুরী যখন বিমানকে বিবাহের কথা বললে এসে বাড়িতে, কামিনীই সর্বাধিক আনন্দ করেছিল। দু'চার দিন বিমান ঐ বাড়িতে এসেছিল। কামিনীর ছেলেটিকে দেখে ও তার সঙ্গে দু'-চারটে কথাবার্তা বলে তার ভালই লেগেছিল বিমানকে। তা ছাড়া বিবাহ করলে মাধুরী তার বর্তমান জীবন থেকে সরে যাবে—সে কথাটাও তার মনে হয়েছিল।

হাঁটতে হাঁটতে মাধুরী যখন তাদের পরিচিত কালীঘাটের বাসায় এসে হাজির হলো, রাত তখন প্রায় দেড়টা। সবাই ঘুমিয়ে।

অত রাত্রে কারো জেগে থাকবার কথাও নয়।

কয়েকবার ইতস্ততঃ করে মাধুরী দরজার কড়াটা ধরে নাড়া দিল। কামিনীর ঘুম চিরদিনই সজাগ —সে কড়া নাড়ার শব্দে এসে দরজাটা খুলে দিতেই সামনে মাধুরীকে দেখতে পেল।

মাধু তুই—এত রাত্রে—

পিসী, আমি চলে এলাম।

চলে এলি, চলে এলে মানে কি? আয়, আয় ভিতরে আয়। দরজাটা বন্ধ করে মাধুরীর হাত ধরে কামিনী তাকে ঘরে নিয়ে এলো।

বোস, বোস—তুই যে কাঁপছিস। কামিনী বললে, তা কোথা থেকে আসছিস এত রাত্রে।

যাদবপুর থেকে।

কি ব্যাপার! কি হয়েছে রে?

বিমানের কাছ থেকে আমি চলে এলাম। আমাদের সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে—

শেষ হয়ে গিয়েছে, কি বলছিস তুই?

বললাম ত—চিরদিনের মতই সে ঘর ছেড়ে আমি চলে এসেছি—মাধুরী বললে।

আমাকে সব খুলে বল মাধু।

আমি ওর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে চলে এলাম।

তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে মাধু। হিন্দুর মেয়ে হয়ে তোর স্বামীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করে চলে এসেছিস।

তাকে নিয়ে আর ঘর করা সম্ভব নয়।

ওরে বোকা মেয়ে, স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়ই, তাই বলে কি বিয়েটা একটা পলকা সুতোর বাঁধন, হুট করে সে সম্পর্ক অস্বীকার করে চলে আসবি, বাঁধন ছিঁড়ে। এ যে জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন—

সেও ত বললে চলে আসতে।

বলুক। এ কি মগের মুলুক। চল দেখি আমি সঙ্গে যাবো তোর—

না পিসী, আর সেখানে যাবো না।

যেতে তোকে হবেই।

পিসি!

মেয়েমানুষের জীবনে ওর চেয়ে আর বড় আশ্রয় নেই রে হতভাগী। মান বল, ইজ্জৎ বল, সম্মান বল, মেয়েমানুষের সব কিছুই যে ঐ স্বামী। কানা হোক, খোঁড়া হোক, মাতাল হোক, চোর ডাকাত হোক—ঐ স্বামীই মেয়েমানুষের জীবনের শেষ কথা।

তুমি ঠিক বুঝছো না পিসি—

বুঝছি, আমি আমার জীবন দিয়ে বুঝেছি। নচেৎ তোর পিসে চলে যাবার পর ত দশ দশটা বছর আমি ঝাঁটা খেয়ে ওখানে প'ড়ে থাকতাম না। চল মাধু, আমি তোর সঙ্গে যাবো। তা ছাড়া বিমান ত তেমন ছেলে নয়।

তাকে কতটুকু চেনো তুমি। আমি তার সঙ্গে এই দেড় বছর ঘর করে—

তবু, তবু তোকে ফিরে যেতেই হবে। স্বামী বর্তমানে মেয়েমানুষের আর কোথায়ও স্থান নেই! স্বামীর আশ্রয়ের মত আশ্রয় আর মেয়েমানুষের হয় না। এত বড় ভুল তোকে আমি প্রাণ থাকতে করতে দেবো না। আর কোথায় এসেছিস, মা-বাপের কাছে—তারা তোকে স্থান দিলেও জানিস কোন দিনই মনে মনে তোকে ক্ষমা করতে পারবে না। অহরহ একটা ঘৃণা আর অসম্মানের অবহেলা তোকে জর্জরিত করবে।

কিন্তু কেন?

ওরে তাই যে জগতের নিয়ম, এ সংসারের নিয়ম।

আমি ত কারো মুখাপেক্ষী নয় দুমুঠো অন্নের জন্য—

দুবেলা দুমুঠো ভাতই ত জীবনে সব নয় মাধু! ঐ দুমুঠো অন্নের

বাইরেও অনেক কিছু আছে, যার সঙ্গে তোকে সারাটা জীবন যুদ্ধ করতে হবে। তা ছাড়া বিয়ের আগে যেভাবে তুই অর্থ উপার্জন করতিস, চাকরি ছাড়াও—

পিসি! —অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে মাধুরী।

জানি। আমি সব জানি। তার চাইতে অসম্মান আর মেয়েমানুষের জীবনে নেই। চল, এখুনি ফিরে চল। আমি সঙ্গে যাচ্ছি তোর।

হঠাৎ যেন একটা বেত্রাঘাত পড়লো মাধুরীর মুখের উপরে। মাধুরীর মনটা হঠাৎ যেন অন্য এক দৃশ্য তার চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলল। সে বলল, পিসি—

না রে না, সে কলঙ্কের মধ্যে আর ফিরে যাস না। বিমানের কাছেই তোকে যেতে হবে। চল আমি যাবো—

না পিসী, তোমাকে যেতে হবে না, আমি একাই যাবো।

যাবি?

হ্যাঁ। যাবো, আমি চললাম। মাধুরী যেমন এসেছিল তেমনি বের হয়ে গেল।

রাত প্রায় পৌনে তিনটে বাজে। নিশুতি রাত। রাস্তায় যতদূর দৃষ্টি চলে বলতে গেলে কোন মানুষজনই নেই। মধ্যে মধ্যে কেবল এক-আধটা প্রাইভেট কার বা ট্যাক্সী ঝড়ের বেগে যেন খালি রাস্তা ধরে ছুটে চলে যাচ্ছে। পথের দু'পাশে আলোগুলো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে কেবল।

মাধুরী হেঁটে চলেছে, ক্লান্ত অবসন্ন পা দুটোকে টেনে টেনে। তার মনে হচ্ছিল আর বুঝি সে হাঁটতে পারছে না। একটু কোথায়ও বসতে পারলে বোধ করি সে হাঁফ ছেড়ে নিত।

পিসীর কথাগুলোই মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল মাধুরীর। পিসী তাহলে অনুমান করতে পেরেছিল অত টাকা তার কোথা থেকে আসে! মিল্ক সেন্টারের চাকরিতে সে কটা টাকাই বা পেত।

বসন্তও তখন তেমন একটা কিছু রোজগার করে না। আর বাবা ত পঙ্গু।

টাকা দিয়েছে তাকে দলের ছেলেরাই।

বিনিময়ে তাদের হাতে তার দেহটা তুলে দিতে হয়েছে। কিছুই মনে হয় নি তার। তার দেহটার যে একটা মর্যাদা আছে, কখনো তা মনে হয় নি। কোন মিথ্যে সংস্কার বা অহংকার বা মর্যাদাবোধ কখনো তাকে পীড়া দেয় নি। বিমান তাকে বিয়ে করবার পর—প্রথম সে তারও একটা যে আত্মমর্যাদা আছে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। সে যেন এক নতুন জীবন। যেন এক অন্য জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটলো। টাকার ত এখন আর তার কোন প্রয়োজন হত না। বিমান ভালই মাইনে পেত। দু'জনের ইনকামে হেসে-খেলে চলে গিয়েও কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকতো—সেই টাকাটা সে মাসে মাসে মায়ের হাতে পেঁৗছে দিয়েছে। তা ছাড়া ভাই বসন্তর ইনকামও তখন বেড়েছে।

নিশ্চিন্তে সংসার করেছে সে।

চাকরিটি ছাড়ার বিমানের কোন প্রয়োজনই ছিল না যদি না দলিলের ব্যাপারে সে জড়িয়ে পড়তো। ব্যাঙ্কে দলিলটা জমা দিয়ে যে টাকাটা বিমান পেয়েছিল তা ত সব দলের লোকেরাই নিয়েছে। অথচ বিপদ যখন এলো, দলের কেউ এসে ওর পাশে দাঁড়াল না।

আর দলের লোকগুলোকে ত আজ সে ভাল করেই চিনতে পারল।

না। পিসী ঠিকই বলেছে, বিমানই তার সত্যিকারের আশ্রয়। হঠাৎ রাগটা হয়ে গিয়েছিল বিমান ওর চরিত্র নিয়ে বক্রোক্তি করায়। বিয়ের পর ওদের কোন প্রশ্রয় দেয় নি, তবু বিমান ওকে চরিত্রের জন্য দোষারোপ করায় হঠাৎ মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল।

স্বামীর আশ্রয়ের মত আশ্রয় আর মেয়েমানুষের হয় না। এত বড় ভুল তোকে আমি প্রাণ থাকতে করতে দেবো না।

পিসী তার চোখ খুলে দিয়েছে।

আর সে ভুল করবে না। মনে মনে বারবার বলতে থাকে মাধুরী, বিমান, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করো।

হাঁটতে হাঁটতে যখন সে তাদের যাদবপুরের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে পৌঁছেছে কে একজন যেন ঝড়ের বেগে তাকে এক প্রকার ধাক্কা দিয়েই চলে গেল।

কে? কে—ফিরে তাকাল মাধুরী। লোকটা তখন বেশ কিছুটা চলে গিয়েছে। তাহলেও রাস্তার আলোয় তাকে চিনতে কষ্ট হলো না, গোপাল নাগ। গোপাল নাগ যেন এক প্রকার ছুটেই চোখের আড়াল হয়ে গেল।

এত রাত্রে গোপাল এসেছিল কেন তাদের ফ্ল্যাটে? বিমানকে কোন পরামর্শ দিতে নয় ত? সে তার স্বামীকে নিয়ে এদের দল থেকে বের হয়ে যাবে ' একতলার ভাড়াটেরা দিন দশেক হলো কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছে, ঘরের দরজায় তালা দেওয়া।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই খোলা দরজাপথে ঘরের আলোটা মাধুরীর চোখে পড়ল—আর কানে এলো একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ। কে যেন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

টপ টপ করে বাকী সিঁড়িগুলো উঠে খোলা দরজা পথে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি পড়তেই মাধুরী চমকে উঠলো। কে যেন মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। ঘরে পা দিতেই সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল। রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে এবং রক্তাক্ত মেঝেতে পড়ে বিমান কাতরাচ্ছে।

বিমান।—অস্ফুট চিৎকার করে উঠলো মাধুরী।

মাধু—

একি, একি—

গোপাল, পেটে ছুরি বসিয়ে দিয়ে—আর বলতে পারল না বিমান। গোটাকতক হেঁচকি তুলল কেবল। তারপরই চুপ—

চিৎকার করে কেঁদে উঠলো মাধুরী। ওগো, কে কোথায় আছো শীগ্‌গির এসো খুন—খুন—তারপরই মাধুরী স্বামীর রক্তাক্ত দেহটার 'পরে উবুড় হয়ে পড়লো।

মাধুরীর চিৎকারেই পাড়ার লোকজন ছুটে আসে। তারাই অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে পাঠাল বিমানকে। মাধুরীও সঙ্গে গেল।

কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছাবার পর পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন—He is dead.

খুন। মার্ডার কেস। পুলিস এলো সংবাদ পেয়ে। মাধুরী বললে, তার স্বামীকে খুন করে গোপাল নাগকে সে পালাতে দেখেছে।

পুলিস গোপাল নাগকে পরদিনই অ্যারেস্ট করল।

গোপাল নাগ কিন্তু বলতে লাগল, আমি কিছু জানি না। খুনের সময় আমি আনোয়ার শা'য়ের একটা বাড়িতে ছিলাম।—বসির ও পঞ্চাননও তাই বললো।

এস. এন. কিন্তু সংবাদটা পরের দিনই পেয়ে গেলেন।

সংবাদটা পেয়ে এস. এন. যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বুঝতে পারেন না তিনি চন্দনাকে সংবাদটা দেবেন কিনা—আর দিলেও কেমন করে জানাবেন।

তা ছাড়া বিমানের মা-বাবাও হয়ত সংবাদটা পাবেন—আজ না হয় কাল। কথাটা ত তাঁদের কাছে আর চাপা থাকবে না। অনেক ভেবে তিনি বিমানের বাসাটার খোঁজ করে সন্ধ্যার পর সেখানে গিয়ে হাজির হলেন।

কিছুক্ষণ আগে মাধুরী বিমানের সৎকার করে ফিরেছে। শ্মশান থেকে ফিরে মাধুরী মেঝের উপরে বসেছিল।

এস. এন. এসে ঘরে ঢুকলেন।

মাধুরী দেবী—

মাধুরী মুখ তুলে তাকাল।

আমি সনৎ ভট্টাচার্য। বিমান আমারই মিলের কর্মচারী ছিল।

মাধুরী কোন কথা বলে না।

এখন আপনি কি করবেন?

কি করবো!

হ্যা, আপনার মা-বাবার কাছে কি যাবেন?

না।

তাহলে, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন এবং যতদিন আপনি বেঁচে থাকবেন, মাসে আরাইশো টাকা করে আপনাকে আমাদের মিল্স থেকে দেওয়া হবে, আর এই পাঁচ হাজার টাকা এনেছি রাখুন—

টাকা—টাকা দিয়ে আমি কি করবো ?

টাকার প্রয়োজন মানুষের সব সময়ই আছে। টাকাটা রাখুন। তবে আমার মনে হয় আপনার মা-বাবার কাছে গিয়েই থাকুন।

সেখানে আমি যাবো না।

যাবেন না ?

না। কিন্তু আপনি এ দয়া দেখাতে কেন এসেছেন। কোন শ্রমিক কোন দুর্ঘটনায় মারা গেলে কি আপনি এ ধরনের দয়া আগে কখনো কারো প্রতি দেখিয়েছেন। তা ছাড়া আমার স্বামী ত ঠিক একজন শ্রমিক ছিলেন না, আপনাদের মিলে ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টে একজন কেরানী ছিলেন।

তা ছিল বটে, তবে একটা নৈতিক দায়িত্ববোধ ত আছে।

কিসের নৈতিক দায়িত্ববোধ ?

মিলের লক-আউটের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন ত আপনার স্বামী—মিলেরই একজন কর্মী হিসাবে। এবং তার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো তাই—

তাই ঐ টাকাটা দিতে এসেছেন।

হ্যাঁ। মানে—

ধন্যবাদ! আপনাকে সে জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি হয়ত জানেন না আমি কিছু লেখাপড়া শিখেছি ও যা হোক একটা চাকরিও করি, তাতেই আমার চলে যাবে।

কতদূর লেখাপড়া করেছেন আপনি ?

আই. এ. পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছি—

শর্টহ্যাণ্ড টাইপ রাইটিং জানেন ?

না।

জানা থাকলে আমার অফিসে একটা চাকরি করে দিতে পারতাম।

কথাটা আমার জানা রইলো—

তাহলে টাকাটা—

ওতে আমার স্বামীর আত্মা ছোট হয়ে যাবে। নিতে পারবো না, ক্ষমা করবেন।

মাধুরী টাকা নিল না। এস. এন. ফিরে এলেন।

সংবাদটা চাপা রইলো না অমলেন্দু ও বিভাবতীর কাছেও। বিভাবতী হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন সংবাদটা শুনে। অমলেন্দু পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

সংবাদটা এসে দিয়েছিল মিলেরই একজন কর্মী।

সে এ কথাও জানিয়ে গেল মাধুরী এখনো সেই ফ্ল্যাটেই আছে, সে তার মা-বাবার কাছে যায় নি। অমলেন্দু মাধুরী সম্পর্কে কোন উচ্চ্যবাচ্য করেন নি।

পুত্রবধূ হলেও তাকে ত বলতে গেলে তিনি চেননই না। বিয়ের পরদিনই ত সে বিমানকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। মাধুরী সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি।

ঐ দিনই এলো সন্ধ্যায় চন্দনা।

চন্দনা বললে, বাবা, দাদার বৌয়ের উপর ত তোমাদের একটা কর্তব্য আছে। তোমাদের অমতে বিবাহ করলেও ত সে তোমাদেরই ছেলের বৌ।

অসহায়ের মত অমলেন্দু মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

তা ছাড়া বাবা শুনেছি—তার সন্তান হবে।

তা আমি কি করবো মা, আমি কি করতে পারি?

তাকে যদি তোমরা এখানে এনে রাখ।

এখানে?

হ্যাঁ। এখানে ছাড়া তার আর জায়গাই বা কোথায়?

জানি না মা—আমি কিছু জানি না। তুমি যা করবার করো।

আমি তাহলে কাল তার সঙ্গে কি একবার দেখা করব?

অমলেন্দু চুপ করে রইলেন।

পরের দিন চন্দনা গেল মাধুরীর ওখানে।

চন্দনা যখন নিজের পরিচয় দিল, মাধুরী চুপ করে রইলো। চন্দনা তখন বললে, তুমি এখানে একা একা থাকবে কি করে, তুমি আমার মা-বাবার কাছে বরাহনগরে গিয়ে থাক।

তাঁরা কি আমাকে সেখানে থাকতে দেবেন?

কেন দেবেন না, তুমি তাঁদেরই ত ছেলের বৌ।

স্বীকার করবেন তাঁরা আমাকে তাঁদের ছেলের বৌ বলে?

নিশ্চয়ই, করবেন বৈকি!

মাধুরী কেঁদে ফেলল। বললে, আমি যে মহা অপরাধ করেছি, তাঁদের সন্তানকে একদিন তাঁদের বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম।

তুমি কিছু ভেবো না বৌদি, কাল আমি নিজে এসে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তোমাকে সেখানে পৌঁছে দেবো। কি আসবো?

আসবেন।—মাধুরী বললে।

মাধুরী শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঐ বাড়িতে ওঠে বিভাবতীর তেমন ইচ্ছা ছিল না, বিশেষ করে ছেলের মৃত্যুর পর। কিন্তু চন্দনার 'পরে কোন কথা বললেন না।

বিধবা মাধুরীর দিকে তাকিয়ে তার দু'চোখ সজল হয়ে উঠলো।

চন্দনাও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

মিলের লক-আউট কতদিন চলবে এখনো ঠিক নেই। দ্বিপাক্ষিক মিটিং দু'বার হয়ে গিয়েছে কিন্তু কোন মীমাংসায় কোন পক্ষই পৌঁছতে পারে নি।

এস. এন. যেন হাঁপিয়ে ওঠেন।

চন্দনাই একদিন বললে, এই নানা চিন্তায় চিন্তায় তোমার শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ—তুমি বরং ইউরোপটা ঘুরে এসো।

না।

না কেন ?

তোমার বাচ্চা হয়ে যাক—তারপর একত্রে যাবো।

না। তুমি কিছু দিনের জন্য একবার ঘুরে এসো। তারপর না হয় আবার যাওয়া যাবে।

এ সময়টা তুমি যে তাহলে একা পড়ে যাবে চুনী।

কি হয়েছে তাতে। ডাঃ রায় ত আছেন। তা ছাড়া নার্সিং হোমে সব ব্যবস্থা ত করা আছে। তুমি কিছু ভেবো না। তুমি যাও।

যাবো ?

হ্যাঁ। যাও মাস দুয়েকের জন্য ঘুরে এসো। আমার ত এখনো তিন মাস আছে।

এস. এন. আর আপত্তি করলেন না।

পাসপোর্ট ত ছিলই। ভিসা ও প্লেনের টিকিটও হয়ে গেল। দিন ষোল বাদে B. O. A. C.র প্লেনে এস. এন. কলকাতা থেকে আকাশে উড়লেন।

চন্দনা এয়ার পোর্টে গিয়ে সনৎকে তুলে দিয়ে এলো প্লেনে।

সনৎ একবার বলেছিলেন এ দুটো মাস তাকে তার মা বাবার কাছে গিয়ে থাকতে কিন্তু চন্দনা সম্মত হয় নি। বস্তুতঃ চন্দনা নিজেকে তার ভাবী সন্তানের জন্য বুঝি প্রস্তুত করছিল।

যে আসছে, সে তার যোগ্য মর্যাদা পাবে ত ?

পৃথিবীর আর দশটি স্বাভাবিক সুস্থ সন্তানের মত তারও সন্তান এ সংসারে সমাজে তার প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারবে ত ?

যে চিন্তাটা এতদিন ছিল সেই চিন্তাটাই আজ যেন তার মনকে ভাবিয়ে তোলে। তার সন্তান যোগ্য মর্যাদা পাবে ত ? সনতের লিগ্যাল সন্তান বলে প্রতিষ্ঠা পাবে ত ?

তা যদি না হয় ত ঐ সন্তানকে সে কেন আনছে এই পৃথিবীতে ?

আজ না হলেও একদিন বড় হয়ে যদি তার সন্তান প্রশ্ন তোলে,

যদি জানতেই মা আমি বাবার সন্তান বলে যোগ্য মর্যাদা পাবো না তবে কেন এনেছিলে তুমি এই পৃথিবীতে আমাকে ?

কেন সমস্ত সম্ভাবনা আমার অঙ্কুরেই বিনষ্ট করলে না ?

শিউরে উঠে চন্দনা।

একটা অমঙ্গলের দুঃস্বপ্ন যেন তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মনে হয় এ সময়টা যদি সনৎ তার পাশে থাকত।

১৯

সনৎ মন ও শরীরের সঙ্গে দিবারাত্র যুদ্ধ করতে করতে যেন একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিলেন। কেন যেন কেবলই তাঁর মনে হতো চন্দনাকে সব দিক দিয়েই তিনি ঠকাচ্ছেন। চন্দনা যে গভীর ভালবাসায় তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিল তার পরিপূর্ণ প্রতিদান যেন তাকে দিতে পারছেন না। ডাঃ রায়ই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন 'হরমোন' ইনজেকশন নিতে। কিন্তু সনৎ বুঝতে পারছিলেন—কালের নিয়মে বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে যে যৌবন চলে যায়, তাকে কোন কিছুতেই আর ফিরিয়ে আনা যায় না। তাই তাঁর গভীর লজ্জা ও পাপবোধ তাঁকে ভিতরে ভিতরে অস্থির করে তুলেছিল।

এবং কতকটা সেই কারণেই ইউরোপে পালিয়ে গিয়েছিলেন সনৎ। আরো ভেবেছিলেন, সেখানে ত নানা ধরনের চিকিৎসা-পদ্ধতি আছে, যদি তাতে করে কোন ফল পাওয়া যায়। কিন্তু বিলেতের ডাক্তাররাও তেমন কোন আশার বাণী শোনাল না।

সনৎ মনে মনে আরো ভেঙ্গে পড়লেন।

সনৎ যখন লণ্ডনে কঙ্কণও তখন লণ্ডনে। সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে লণ্ডনের একটা ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়েছিল। এবং ব্যাঙ্কেই একদিন সনতের টাকা তুলতে গিয়ে কঙ্কণের সঙ্গে আলাপ হলো।

কঙ্কণ এস. এন.-কে চিনতো। কিন্তু এস. এন. কঙ্কণকে চিনতেন না।

চন্দনা কঙ্কণের কথা এস. এন.-কে বলেছিল, কঙ্কণ কলকাতায় তাদের ফ্ল্যাটে দেখা করতে যাবার পর। জীবনের কোন কথা চন্দনা এস. এন.-কাছে গোপন করে নি। কঙ্কণের কথা শুনে এস. এন. বুঝেছিলেন কঙ্কণ চন্দনাকে ভালবাসতো এবং এখনো বাসে। অবশ্য এও তিনি বুঝেছিলেন কঙ্কণকে ঘিরে চন্দনার মনের কোথায়ও কোন দুর্বলতা নেই।

এস. এন.-কে ব্যাঙ্কের কাউন্টারের সামনে দেখেই কঙ্কণ তাঁকে চিনতে পেরেছিল। নিজেই এগিয়ে গিয়ে আলাপ করল।

আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে আপনি বোধ হয় এস. এন, —কঙ্কণ বললে।

হ্যাঁ—আপনি আমায় চেনেন?

চিনি। অবিশ্যি আপনি আমাকে চেনেন না—মৃদু হেসে কঙ্কণ বললে।

কি নাম বলুন ত আপনার?

কঙ্কণ দত্ত।

মনে হচ্ছে, এস. এন. বললেন, আপনি বোধ হয় আমার স্ত্রীর পরিচিত।

হ্যাঁ চন্দনা—মানে আপনার স্ত্রী, আমার পরিচিত।

আপনি নেভিতে ছিলেন না মিঃ দত্ত?

ছিলাম। মাস কয়েক হলো সে চাকরি ছেড়ে ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়েছি।

কেন, সে চাকরি ছাড়লেন কেন?

সত্যি কথা বলবো মিঃ ভট্টাচারিয়া—টাকার লোভে ও সমুদ্রের লোভে সে চাকরি নিয়েছিলাম।

তবে—ছাড়লেন যে?

টাকার প্রয়োজনও আর আমার রইলো না—আর সমুদ্রেও ক্লান্তি এনে দিল।

কি জানি কেন প্রথম দর্শনেই এস. এন.-এর ছেলেটিকে ভাল লেগে

যায়। ভারী ভদ্র মিষ্টি কথাবার্তা ছেলেটির। এস. এন. বললেন, তা দেশেও ত চাকরি পেতে পারতেন—বিদেশে এলেন কেন?

দেশে আর ফিরবার মন নেই বলে।

দেশে ফিরবার ইচ্ছা নেই?

না।

কেন?

দেশ বোধহয় আমার কাছে পরদেশ হয়ে গিয়েছে।

বাড়িতে কেউ নেই?

না—মা বাবা গত হয়েছেন। আমি মা-বাবার একটি মাত্রই সন্তান ছিলাম।

এস. এন. বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করে বেশ ভাল লাগলো।

আমারও কিন্তু ভাল লাগল। কঙ্কণ বললো।

অ্যানসন রোডে এক ভদ্রলোকের বাড়ির দুটো কামরা নিয়ে থাকতেন এস. এন.। খাওয়া-দাওয়া বাড়িওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। দিনের বেলাটা প্রায়ই বাইরে খেয়ে নিতেন এস. এন. ডিনারও মধ্যে মধ্যে খেতেন—সব রাত্রে নয়।

কঙ্কণও খুব কাছাকাছিই থাকত একটা মেসে একটা সিঙ্গল রুম নিয়ে।

কয়েকদিন বাদে ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে এসে এস. এন. বললেন, সন্ধ্যার পর ফ্রি থাকেন না মিঃ দত্ত?

মধ্যে মধ্যে সিনেমায় যাই—নচেৎ ফ্রিই থাকি—কঙ্কণ বললে।

আসুন না কাল সন্ধ্যায় আমার ডেরায়।

বেশ যাবো, তবে একটা শর্তে।

শর্ত—কি শর্ত বলুন।—এস. এন. শুধালেন।

ঐ 'আপনি' শব্দটা আপনাকে ছাড়তে হবে—আমাকে 'তুমি' বলতে হবে। রাজী?

রাজী—

রাত্রে আজ আমার ওখান থেকে একেবারে খাওয়া-দাওয়া সেরে আসবে কঙ্কণ।

তাই হবে—কঙ্কণ বললে।

কঙ্কণেরও ভদ্রলোকটিকে খুব ভাল লেগেছিল। যেদিন মণিকার মুখে প্রথম শুনেছিল কঙ্কণ, ঐ মানুষটিকে ভালবেসে চন্দনা গৃহ ছেড়েছে, ওর মনে হয়েছিল নিছক টাকার লোভেই বুঝি চন্দনা ঐ প্রৌঢ়কে জীবনে বেছে নিয়েছে—তার ঘরে গিয়ে উঠেছে। চন্দনার প্রতি একটা ঘৃণা তার মনের মধ্যে জমা হয়ে উঠেছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু প্রৌঢ়ও সেদিন তার ঘৃণা থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। তার মনে হয়েছিল চন্দনা না হয় টাকাটার কথাই ভেবেছে, কিন্তু প্রৌঢ় কি বলে তাঁর কন্যার বয়সী একটি মেয়েকে প্রশ্রয় দিল। একটিবারও নিজের দিকে তাকাল না লোকটা। অনায়াসে যৌন ক্ষুধায় তার হাত দুটো চন্দনার দিকে প্রসারিত করে দিল কেবল মাত্র তার টাকার জোরে।

কিন্তু লোকটার সঙ্গে পরিচয় হবার পর তার সেদিনকার সেই জমে ওঠা ঘৃণাটা যেন কোথায় একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে লাগল।

এবং সে রাত্রে এস. এন.-এর ফ্ল্যাটে গিয়ে লোকটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবার পর কঙ্কণের মনে হয়েছিল মানুষটার কেবল যে টাকাই আছে তাই নয়, তার চরিত্রের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যেটাকে কেবলমাত্র যৌন ক্ষুধা দিয়ে বুঝি বিচার করা যায় না।

সে রাত্রে মুখোমুখি বসে ড্রিঙ্ক করতে করতে এক সময় এস. এন. বললেন, তুমি খুব ভালবাসতে কঙ্কণ চন্দনাকে, তাই না?

ও কথার আলোচনাটা থাক এস. এন.—কঙ্কণ বললে।

না, না কোন সংকোচ বা লজ্জা করো না কঙ্কণ। ভালবাসার মধ্যে ত অন্যায় কিছু নেই—কিন্তু আমি কেবল ভাবছি, চন্দনা সেই সংবাদটা জানতে পারল না কেন? তারপর একটু থেমে বললেন, অর্থের জন্য যে সে আমার দিকে হাত বাড়ায় নি—সেটা আর কেউ না জানলেও

আমি জানি কঙ্কণ। তাই ভাবি—তুমি সামনে থাকা সত্ত্বেও তোমাকে অস্বীকার করে আমার কাছে গেল কেন?

হয়ত আমি যা দিতে পারি নি তার চাইতেও আপনি তাকে অনেক বেশি দিয়েছেন এস. এন.।

কি জানি কঙ্কণ জানি না।

তাই, এস. এন. নচেৎ চন্দনার মত মেয়েকে আপনি পেতেন না।

তাই ত দুঃখ আমার কঙ্কণ, তাকে আমি ফাঁকি দিয়েছি।

ওকথা বলছেন কেন এস. এন.—

তাই যে সত্য কঙ্কণ। সে সত্যটাকে যে আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছি না।

ঐ রাত্রির পর থেকে প্রায়ই কঙ্কণ চলে যেতো সন্ধ্যার পর এস. এন.-এর কাছে। দু'জনে গল্প করতো ড্রিংক করতে করতে।

কিন্তু দু'মাসের মাথায় চন্দনার কাছে লণ্ডন থেকে এক তারবার্তায় এক মর্মান্তিক দুঃসংবাদ এলো।

কেবল্‌টা এসেছিল কঙ্কণ দত্তর কাছ থেকেই।

-এস. এন. ভট্টাচার্য আর নেই।

হঠাৎ এক মধ্য রাত্রিতে করোনারী অ্যাটাকে এস. এন.-এর মৃত্যু হয়েছে।

চন্দনা কঙ্কণের প্রেরিত তারবার্তাটা হাতে নিয়ে সোফাটার পরে পাথরের মত বসে রইলো।

বঙ্কিম চন্দনাকে চা দিতে এসেছিল, চন্দনাকে ঐ ভাবে প্রস্তরমূর্তির মত বসে থাকতে দেখে ভয় পেয়ে ডাকল, মা!

চন্দনার দিক থেকে কোন সাড়া এলো না।

বঙ্কিম আবার ডাকলো, মা।

চন্দনা কেমন অসহায় শূন্য দৃষ্টিতে বঙ্কিমের দিকে তাকাল।

কি হয়েছে মা? টেলিগ্রাম কি কোন খারাপ খবর এনেছে?

চন্দনা টলে সোফাটার উপর পড়ে গেল।

বঙ্কিম ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ডাঃ রায়কে ফোন করে দিল।

ডাঃ রায় শীগ্‌গির আসুন, মা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

ফোন করে বঙ্কিম ধীরে ধীরে সযত্নে চন্দনাকে সোফাটার উপর শুইয়ে দিল। চোখে মুখে জল দিয়ে বাতাস করতে লাগল।

ডাঃ রায় এলো—এবং টেলিগ্রামটা পড়ে সব বুঝতে পারলো। ধীরে ধীরে চন্দনা তখন চোখ মেলছে।

মিসেস ভট্টাচার্য—না, না, উঠবেন না, শুয়ে থাকুন—ডাঃ রায় বললেন।

চন্দনা কিন্তু শুনলো না। সোফাটার উপরে উঠে বসল।

বাড়িতেও রঞ্জাবতীর ছেলের কাছে ঐ দিন কেব্‌লে সংবাদ এসে গিয়েছে। কলকাতার সংবাদপত্রে মৃত্যুসংবাদ ছাপা হলো।

সলিসিটার রায়চৌধুরীও সংবাদটা পেলেন। পরের দিন দুপুরে দীপেন্দ্রনারায়ণ এলো সলিসিটার রায়চৌধুরীর অফিসে। এস. এন.-এর যাবতীয় আইন-ঘটিত ব্যাপার পরমেশ রায়চৌধুরীর ফার্মই দেখা-শোনা করত।

আপনার কাছে একটা কাজের জন্য এসেছি মিঃ রায়চৌধুরী।

পরমেশ বললেন, বলুন।

আমাদের এসপ্লানেডের অফিস বিল্ডিং-এর চারতলার ফ্লাটে যে মেয়েমানুষটা থাকে তাকে বাড়িটা ছাড়বার জন্য আপনাকেই ইমিডিয়েট নোটিশ দিতে হবে একটা।

সে রকম কোন নোটিশ ত দেওয়া যাবে না দীপেন্দ্রবাবু—

দেওয়া যাবে না। কেন?

অবিশ্যি এখন উনিই হয়ত ঐ ঘর ছেড়ে তাঁর নিজের ফ্ল্যাটে চলে যাবেন।

নিজের ফ্ল্যাট—কোথায়?

পার্ক স্ট্রীটে ইন্দ্রনীল ম্যানসনে সাততালায় তাঁর একটা ফ্ল্যাট আছে। এবং তিনি নিজে থেকে না উঠে যাওয়া পর্যন্ত তাঁকে আপনারা ওখান থেকে হঠাতে পারছেন না।

আশ্চর্য। কিন্তু কেন?

আপনার বাবা—স্বর্গত এস. এন. ভট্টাচার্যের উইলে সেই রকমই নির্দেশ আছে। আইনের বাইরে ত আমরা যেতে পারি না।

বাবা, ঐ রকম একটা উইল করে গিয়েছেন!

হ্যাঁ—ঐ পার্ক স্ট্রীটের ইন্দ্রনীল ম্যানসনের ফ্ল্যাট, বরাহনগরের বাড়ি উইল অনুযায়ী চন্দনা দেবীরই।

But who is she—how she can claim all these properties!

সেটা ত সম্পূর্ণ আইনের ব্যাপার। তবে এইটুকুই আমি বলতে পারি, আদালতের শরণাপন্ন হলেও আপনারা বিশেষ কোন সুবিধা করতে পারবেন না।

উইলে কি লেখা আছে?

ঐ সব প্রপার্টি এবং ব্যাঙ্কের এক লক্ষ টাকা উনি চন্দনা দেবীকে দানপত্র করে দিয়ে গিয়েছেন—Deed of gifts—এবং গিফটের ট্যাকসও দিয়ে গিয়েছেন। সব কিছুর কপি তাঁর কাছে আছে—আমাদের কাছেও আছে।

দীপেন্দ্র হতাশ হয়ে ফিরে গিয়ে মাকে সব কথা জানাল।

সত্যি বলছিস খোকন?—রঞ্জাবতী শুধালেন।

হ্যাঁ মা—মিঃ রায়চৌধুরী ত তাই বললেন।

ঐ মেয়েমানুষটা দেখছি ওকে যাদু করেছিল!

কিন্তু তা যেন হলো এখন কি করতে বল?

কি করা যায় ভাবছি—

এক কাজ করলে কেমন হয় মা—

কি?

ওর সঙ্গে দেখা করে যদি বলি আমরা কিছু টাকা দিচ্ছি? ওসব ছেড়ে দিক।

শুনবে কি?

বলা যাক না।

না—হুট করে কিছু করিস না খোকন—আমাকে একটু ভাবতে দে।

চন্দনা সেই দিনই হাতের চুরি শাঁখা খুলে মাথার সিন্দুর মুছে ফেলেছিল। পাড়ওয়ালা শাড়ি ছেড়ে সাদা কাপড় পরেছিল। সম্পূর্ণ বিধবার বেশ।

বঙ্কিম কাঁদছিল।

সংবাদ পেয়ে বিভাবতী ছুটে এসেছিলেন মেয়ের কাছে পরের দিন সন্ধ্যায়।

মেয়ের বৈধব্যের বেশ দেখে বিভাবতী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

ওরে এ কি বেশ নিয়েছিস চুনী!

কেন মা, শান্ত গলায় চন্দনা বললে, এ তো ধর্মেরই অনুশাসন।

ধর্ম, কিসের ধর্ম—কে ছিল সে তোর?

আমার স্বামী শান্ত গলায় চন্দনা বললে।

ও বিয়ে বিয়ে নয়।

মায়ের মন্দিরে মাকে সাক্ষী রেখে আমরা পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করেছিলাম। এর চাইতে আর ধর্মানুষ্ঠান কি হতে পারে?

না, না, না—এতদিন তোকে কিছু বলি নি, কিন্তু আজ আর তোর কোন কথা আমি শুনবো না তুই আবার বিয়ে কর। যাকে খুশি তোর বিয়ে কর।

বিয়ে করবো!

হ্যাঁ—হ্যাঁ আবার বিয়ে কর। আমরা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোর বিবাহ দেবো। এ কোন বিয়েই নয়। ঐ লোকটার একটা জঘন্য শয়তানী। ভগবান যখন আবার মুখ তুলে চেয়েছেন, সব কিছু ভুলে যা। নতুন করে—

ভুলে যাবো! নতুন করে আবার সংসার করবো! কিন্তু এত বড় মিথ্যাচারণ, এত বড় অন্যায় কেমন করে আমি করবো মা। সজ্ঞানে—প্রাণ থাকতে ত আমি করতে পারব না। মা গো পুরোহিতের দুটো মন্ত্রচারণ, খানিক আগুন আর শালগ্রামশিলা বা আজকালকার মত রেজিস্ট্রী অফিসে গিয়ে পরস্পর পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী

বলে একটা খাতায় সই করে দিলেই কি সেটা সত্যকারের বিবাহ হয়ে যায়। আর দেবতাকে সাক্ষী রেখে পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করলেই সেটা হয়ে যাবে মিথ্যে!

হ্যাঁ—হ্যাঁ তাই হয়।

না মা, তা যদি হয়ও ত সেটা আমি মানি না। মানতে পারবো না কখনো।

তোর পেটে যেটা এসেছে। একবার তার কথাও ভাববি না?

ভেবেছি—

কি ভেবেছিস? সমাজ যে তার কপালে জারজের কালির ছাপ দিয়ে দেবে।

তাই বলে একটা চরম মিথ্যের সঙ্গে আপোষ করবো! না মা তা আমি পারবো না।

পারবি না। কিন্তু তোর সন্তানকে সমাজে কেউ স্বীকার করে নেবে ভেবেছিস?

নেবে না কেন? নিশ্চয়ই নেবে।—চন্দনা বললে।

না নেবে না। আজ পর্যন্ত যা হয় নি তা কখনো হবে না। বিভাবতী বললেন, তুই ওকে কাল বাদে পরশু জন্ম দিবি। তুই ওর মা। তার হিতাহিত মঙ্গলামঙ্গল তোকেই দেখতে হবে। আর একমাত্র তুই আবার বিবাহ করলেই সেটা সম্ভব হতে পারে।

না।

চুনী, শোন, অবুঝ হোস না। ভাল করে একবার ভেবে দেখ সব কিছু।

আজ নয়—যেদিন থেকে সন্তান আমার পেটে এসেছে সেদিন থেকেই ভেবেছি।

তোর নিজের জীবন নিয়ে যে স্বেচ্ছাচারিতাই তুই করিস করতে পারিস, কিন্তু যে তোর গর্ভে আছে—দু' দিন পরে যে আসছে তাকে এত বড় প্রবঞ্চনা তুই করতে পারিস না।

মা তুমি যাও।

চুনী—

হ্যাঁ মা, তুমি যাও। কারো পরামর্শই আমি চাই না। আমি একা আছি একাই থাকবো।

শুনবি না তাহলে আমার কথা।—বিভাবতী বললেন।

না। তুমি যাও।

বিভাবতী বিফল মনোরথ হয়ে চলে গেলেন।

মেয়েটা যে এত বড় অবুঝ হবে বুঝতে পারেন নি তিনি।

চন্দনাকে কিছু বলতে হলো না।

সে নিজেই রায়চৌধুরী অফিসে জানিয়ে তার ইন্দ্রনীল ম্যানসনের ফ্ল্যাটে উঠে গেল কয়েক দিন পরে। সঙ্গে গেল বঙ্কিম। বঙ্কিমকেও চন্দনা বলেছিল, সে ইচ্ছা করলে চলে যেতে পারে।

কিন্তু বঙ্কিম কেঁদে ফেলে বললে, কোথায় যাবো মা—আমি আর কোথায় যাবো?

কেন, তোমার দেশে, তোমার ঘরে যাবে বঙ্কিম। আমি তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি। দরকার হলে আবার এসো আবার নিয়ে যেও।

না মা না। টাকা আমার চাই না। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায়ও যাবো না।

আমার সঙ্গে থাকবে?

হ্যাঁ মা যত দিন বেঁচে আছি, আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও মা।

বঙ্কিম কাঁদছে।

বেশ। তবে চল, ইন্দ্রনীল ম্যানসনের ফ্ল্যাটেই চল।

বঙ্কিম তার টিনের ট্রাঙ্কটা হাতে ঝুলিয়ে নিল। তার চোখে তখনও জল।

মহাবীরই গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু চন্দনা সে গাড়িতে উঠলো না। মহাবীরকে একটা ট্যাক্সী ডেকে দিতে বললো।

পরমেশ চৌধুরী পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর হাতে চাবির গোছাটা তুলে দিল চন্দনা।

ট্যাক্সীটা চন্দনা ও বঙ্কিমকে নিয়ে চলে গেল।

পরমেশ চৌধুরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। বয়স হয়েছে, জীবনে তিনি অনেক দেখেছেন। অনেক ঘটনার সাক্ষী, কিন্তু আজ তাঁর চোখের সামনে যে ঘটনা ঘটে গেল, এমনটি বুঝি আর কখনো ঘটে নি।

বিধবার শুভ্র বেশে চন্দনাকে তাঁর মনে হচ্ছিল যেন এক মহাশ্বেতা। মনে হলো ঐ নারীকে যেন কোন অন্যায় বা পাপ অপবিত্র করতে পারে না।

শুদ্ধচারিণী এক তপস্বিনী।

কোন দিন ইতিপূর্বে চন্দনাকে পরমেশ চৌধুরী ক্ষমার চোখে দেখতে পারেন নি। এক নষ্ট চরিত্রের সুবিদাবাদী মেয়েমানুষ বলেই তাঁর মনে হয়েছে—প্রৌঢ় বয়েসে এস· এন·কে যে যাদু করে রেখেছিল। কিন্তু আজ পরমেশ চৌধুরীর মনে হলো—ওই মেয়েটিকে বুঝি কোন পাপ কোন কলঙ্ক স্পর্শ করতে পারে নি।

মহিয়সী গরিয়সী এক অনন্যা নারী।

মহাবীর বললে, এটর্নীবাবু আমি কি এখানেই থাকবো?

হ্যাঁ মহাবীর—এখানেই থাক। পরে দীপেনবাবু যেমন বলবেন তেমনি ব্যবস্থা করা যাবে।

না বাবু—আমাকে ছুটি দিয়ে দিন।

ছুটি!

হ্যাঁ, আর কাজ করবো না।

চাকরি ছেড়ে দেবে মহাবীর?

হ্যাঁ বাবু দেশে যাবো। হুকুম হয় ত কালই চলে যেতে পারি।

বেশ, বলবো দীপেনবাবুকে।

পরমেশ গাড়িতে চেপে অফিসের দিকে চলে গেলেন।

চন্দনা ভেবে পায় না কোন কিছুর কূলকিনারা।

সব যেন তার শূন্য হয়ে গিয়েছে। জীবনটাই যেন মিথ্যে মনে হচ্ছে। চুপচাপ সোফার 'পরে বসে থাকে। বিলেত যাওয়ার মাস-খানেক আগেই এস. এন. ফ্ল্যাটটার পজেশন নিয়েছিলেন। তারপর চন্দনাকে নিয়ে মনের মত করে ফ্ল্যাটটা সাজিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বিলেত থেকে ফিরে ঐখানেই এবার উঠবেন।

কিন্তু সব ওলোটপালোট হয়ে গেল।

এই বুঝি মানুষের জীবন। পদ্ম পাতায় জলবিন্দুর মত। আগের মুহূর্তে যে ছিল, পরের মুহূর্তে হয়ত সে আর নেই। যে মানুষটা দু মাস আগে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল, সে আর ফিরবে না।

কোন দিনই আর ফিরবে না।

পরের দিন মধ্যরাত্রেই চন্দনার পেন উঠলো।

বঙ্কিম সামনের বারান্দায় শুয়েছিল। চন্দনা বঙ্কিমকে ডেকে তুলল।

কি হয়েছে মা?

ডাঃ রায়কে একবার খবর দাও বঙ্কিম।

এখুনি দিচ্ছি মা।

বঙ্কিম সঙ্গে সঙ্গে নীচের অফিসে গিয়ে ডাঃ রায়কে ফোন করে দিল।

ডাঃ রায় আধঘণ্টার মধ্যেই চলে এলেন। সব ব্যবস্থা করে নিজের গাড়িতে চন্দনাকে নিয়ে নার্সিং হোমে গেলেন।

ভোর রাত্রির দিকে চন্দনার একটি মেয়ে হলো। এক মুঠো যেন যুঁই ফুল।

মেয়ের বাপের নাম লেখা হলো এস. এন. ভট্টাচার্য।

সাত দিন পরে চন্দনা নার্সিং হোম থেকে ফিরে এলো নবজাত শিশু কন্যাকে বুকে নিয়ে। ডাঃ রায়ই নার্সিং হোমের মেট্রনকে বলে একজন সর্বক্ষণের দাই নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। সেও ওদের সঙ্গে এলো।

কিন্তু ঐ শিশুকন্যা যেন চন্দনার মনকে এতটুকু আকর্ষণ করতে

পারে না। চন্দনার তার দিকে তাকাতেও যেন কোন সময় ইচ্ছা করে না।

ঐ সন্তানের দিকে তাকালেই যেন সনতের কথা মনে পড়ে। মনে হয় তার সনৎকে হারিয়ে ঐ সন্তান সে পেয়েছে। অনেক সময় জোর করে মনটা তার ঐ সন্তানের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তবে কি তার অবচেতন মনের মধ্যে কোথায়ও ঐ সন্তান তার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল!

ঐ সন্তানের জন্য তার মনের মধ্যে কোন আহ্বান ছিল না। নাকি আজ তার মন বলছে, সন্তানসম্ভাবনা হবার পর পরই সনৎ যে কথাগুলো তাকে সেদিন বলেছিলেন, এবং সন্তানকে নষ্ট করবার কথাও বলেছিলেন, সেটাই ঠিক ছিল। সেই ভুল করেছে।

বিভাবতী ঠিকই বলেছিলেন, সে বুঝতে চায় নি।

আকাশপাতাল চিন্তা চন্দনাকে গ্রাস করে যেন।

সত্যিই কি ঐ সন্তান একটা কলঙ্ক—তার জীবনের কলঙ্ক?

মনে মনে সনৎকে স্মরণ করে বলে, ওগো, তুমি বলে দাও, আমি কি ভুল করেছি?

চন্দনার সন্তান হবার সংবাদ বরাহনগরে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে কেউ আসে নি। তিন মাস হয়ে গেল আজ পর্যন্ত।

চন্দনা বলে, কারো আসার দরকার নেই। কাউকে তার প্রয়োজন নেই।

এস. এন. সব কিছুর পাকা বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন চন্দনা ও তার সন্তানের জন্য। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদেই চলে যাচ্ছিল।

মেয়েকে দাই-ই সর্বদা দেখাশোনা করে। রাত্রেও মেয়ে তারই কাছে শোয়।

মেয়ের যখন সাত মাস বয়েস হঠাৎ এক সন্ধ্যায় কঙ্কণ এলো ওর ফ্ল্যাটে।

কঙ্কণ, কবে বিলেত থেকে ফিরলে?

গতকাল সকালে এসেছি—কঙ্কণ বললে।

কই চন্দনা, তোমার মেয়ে কই ?—কঙ্কণ শুধালো এক সময়।

চন্দনা দাইকে ডেকে মেয়েকে আনতে বললে।

মেয়েকে দেখে কঙ্কণ তার গোলাপী গাল দুটো টিপে দিয়ে বললে, বাঃ! চমৎকার! তা কি নাম রেখেছো মেয়ের তোমার ?

কোন নাম ত রাখি নি।

সে কি ? কোন নাম রাখ নি ? এই সাত মাস বয়েস হলো না ?

তাই হবে।

তা কিছু নামে ডাক ত ?

দাই বললে, মাঈজী ত বাচ্চাকে কখনো নেয় না, বাবুজী।

সেকি !

না। কখনও ছোঁয় না।

যাও দাই, বেবীকে নিয়ে যাও।—চন্দনা বললে।

দাই বেবীকে নিয়ে চলে গেল।

দাই যা বলে গেল তা কি সত্যি চন্দনা ?—প্রশ্ন করলো এবারে কঙ্কণ।

সত্যি।

কিন্তু চন্দনা, তোমারই মেয়ে—তোমারই সন্তান।

আমার কি মনে হয় জানো কঙ্কণ ?

কি ?

আমার দিকে তাকিয়ে ও যেন নালিশ জানায়।

নালিশ ? কিসের নালিশ ?

মনে হয় যেন ঐ শিশুর দৃষ্টি আমায় বলে, ওর প্রতি আমি অন্যায় করেছি। আর সে কথাটা যখনই মনে হয়, ওকে আমি স্পর্শ পর্যন্ত যেন করতে পারি না। নিজেকে যেন কেমন অপরাধী বলে মনে হয়।

সে কি, এমন দুর্বল ত তুমি কখনও ছিলে না চন্দনা। এ দুর্বলতা হঠাৎ এলো কেন তোমার ?—কঙ্কণ প্রশ্নটা করে চন্দনার মুখের দিকে তাকাল।

তা ছাড়া ওর মার স্নেহ থেকে ওকে বঞ্চিত হতে হবে এ দুর্ভাগ্যই বা কেন ওর হবে ?

জানি না—জানি না, কঙ্কণ। রাত্রে আমার বুকের দুধ নিঃশব্দে ঝরে যায়। পাশের ঘরে ও কেঁদে ওঠে। দাই ওর মুখে দুধের বোতলটা গুঁজে দিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করে। এ ব্যথা যে আমার কী ব্যথা কঙ্কণ—

চন্দনা—

বল।

একটা কথা বলবো ? যদি অবিশ্যি অন্যভাবে না নাও।

বল কি বলবে ?

সবকিছুর একটা সমাধানের পথ।

কি পথ ?

তুমি আবার বিয়ে কর।

বিয়ে ?

হ্যাঁ। যে গ্লানি তোমাকে অহরহ পীড়ন করছে, সেই গ্লানি থেকে মুক্তির হয়ত সেটাই একমাত্র পথ।

চন্দনা চুপ করে থাকে।

কি ভাবছো ?

ভাবছি—যা তুমি বললে, তা কি সত্য ?

সত্য চন্দনা। ঐ একমাত্র সত্য আজ তোমার সামনে।

কিন্তু—

শোন চন্দনা, ঐ কথা ভেবেই আমি বিলেত থেকে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

তুমি !

চন্দনা, ঐ অসহায় শিশুর প্রতি কি তোমার কোন কর্তব্য নেই ? ওকে বঞ্চনা করবার অধিকারও তোমার নেই। শোন, আমি ওকে পিতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। ওকে আমি আমার সন্তান বলে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবো।

কেমন করে !

কেন, তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে সম্মত হও।

না, না।

চন্দনা, আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

না না, কঙ্কণ। আমার এই দেহটা আর কাউকে আমি স্পর্শ করতে দিতে পারি না। আমি—আমি ত দ্বিচারিণী হতে পারবো না।

বললাম ত। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কখনো তোমার ঐ শরীরের দিকে হাত বাড়াবো না। বিশ্বাস করো আমায়।

কিন্তু—

আর কোন কিন্তু করো না চন্দনা। আমি সব দিক ভেবেই প্রস্তাবটা করছি। আমার প্রস্তাবে সম্মত হও। চল, আমার সঙ্গে তুমি বিলেতে চল ওকে নিয়ে। সেখানে সবাই জানবে ও আমারই সন্তান। ওকে কোনদিন আর কোন কলঙ্কই স্পর্শ করতে পারবে না জীবনে দেখো। তোমাদের ঐ সন্তানের জন্য মৃত্যুর আগে এস. এন.-এরও চিন্তার অবধি ছিল না। সর্বদা তিনি আমাকে তোমার ঐ সন্তানের কথাই বলতেন। আর তোমারই মত তাকেও এক অপরাধবোধ সর্বক্ষণ জর্জরিত করতো। তার এক স্ত্রী বর্তমান না থাকলে তিনি আইনসঙ্গত ভাবে বিবাহ করতেন তোমাকে নিশ্চয়ই। কিন্তু আইনে তার হাত-পা বাঁধা ছিল। এ যে তার কত বড় দুঃখ ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, আর কেউ না জানলেও আমি জানতাম। জানতে পারার সুযোগ হয়েছিল আমার। চন্দনা আমার অনুরোধ তুমি আমার প্রস্তাবটা একবার ভাল করে ভেবে দেখো।

চন্দনা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তার পর এক সময় বললে, কয়েক দিন পরে এসো কঙ্কণ। যদি আমার পক্ষে সম্ভব হয় ত—

হবে—হবে চন্দনা। সম্ভব হবে। ঐ শিশুর কথাটা আর একবার ভাল করে তুমি ভেবে দেখো। নিষ্পাপ ঐ শিশু। ওর ত কোন অপরাধ নেই। তবে কেন তাকে মিথ্যে এক কলঙ্কের বোঝা সারাটা জীবন ধরে বইতে হবে ?

তুমি কয়েক দিন পরে এসো কঙ্কণ।

বেশ। তাই আসবো।

কঙ্কণ অতঃপর বিদায় নিল।

একটা অনিশ্চিত অন্ধকারের মধ্যে যেন হাবুডুবু খাচ্ছিল চন্দনা। ঐ শিশুর জন্ম দিয়েছে সে যখন এবং ওকে সে পৃথিবীতে যখন এনেছে, তার একটা কর্তব্য আছে বই কি ওর ওপরে।

ওর সম্ভাবনায় সেদিনও এস. এন. মিথ্যা বলে নি। মা বিভাবতীও মিথ্যা বলেন নি। কঙ্কণও মিথ্যা বলে গেল না।

সত্যিই ত, কি পরিচয় দেবে ঐ শিশু এ সংসারে?

কার সন্তান বলে ও নিজের পরিচয় দেবে?

একমাত্র তার সন্তান বললেই ত সমাজ ও সংসার মেনে নেবে না। মায়ের পরিচয় ত সন্তানের পরিচয় নয়। একদিন ও বড় হবে। এ জগতে ওর প্রতিষ্ঠা যখন কিছু পাবে না, তখন কি ও তাকেই দোষারোপ করবে না? সেদিন যদি ও বেঁচে থাকে, আর ও এসে তাকে বলে, এত বড় সর্বনাশ তুমি আমার করলে কেন? জানতেই যদি কোন পরিচয় তুমি আমাকে দিতে পারবে না তবে কেন এনেছিলে আমাকে এই পৃথিবীতে?

রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে চন্দনা। ঐ মেয়ে বড় হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বল, কি পরিচয় আমার? কে আমার বাবা?

চন্দনা বললে, আমি তোর মা।

তুমি মা। কিন্তু সেটা ত আমার পরিচয় নয়। আমি জানতে চাই কে আমার বাবা।

তোর বাবা সনৎ—

তুমি ত তার আইনতঃ বিবাহিতা স্ত্রী ছিলে না। তারা বলছে তুমি তার রক্ষিতা ছিলে।

চুপ কর। চুপ কর—চেঁচিয়ে ওঠে চন্দনা।

চুপ করবো। আমার মুখ তুমি বন্ধ করতে পার। কিন্তু পৃথিবীর সবার মুখ বন্ধ করবে কি করে?

বিশ্বাস কর, তোর জন্মের মধ্যে কোন পাপ ছিল না মা।

আমার বিশ্বাসে কি আসে যায়?

ঘুম ভেঙ্গে গেল।

রাত তখনো শেষ হতে অনেক দেরি। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে চন্দনার। পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল চন্দনা।

তার সন্তান অ্যাভেনে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। নীচে মেঝেতে শুয়ে দাই।

আজ পর্যন্ত একদিনের জন্য আদর করেনি চন্দনা মেয়েকে তার। একদিনের জন্যও তার বুকের দুধ দেয়নি মেয়েকে। বড় ইচ্ছা করে চন্দনার মেয়েকে একটিবার বুকে তুলে নিতে। কিন্তু পারল না। কিছুতেই মেয়েকে স্পর্শ করতে পারল না।

কেন? কেন পারছে না ও স্বাভাবিকভাবে মেয়েকে স্পর্শ করতে?

তবে কি সত্যিই সে অপরাধী? মেয়েকে সে বঞ্চিত করেছে?

চোরের মতই ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল, আবার চোরের মতই ঘর থেকে বের হয়ে এলো চন্দনা দুই হাতে বুকটা চেপে ধরে।

নিজের ঘরে ঢুকে চুপ করে শয্যার উপরে বসে পড়ল।

চন্দনা শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলো, কঙ্কণের প্রস্তাবটাই সে গ্রহণ করবে।

কিন্তু তারপর।

তারপর কি? কঙ্কণকে বিবাহ করলে তার মেয়ের একটা মীমাংসা হবে ঠিকই কিন্তু সে যে প্রশ্নটার মুখোমুখি তখন দাঁড়াবে—সে প্রশ্নের উত্তর কি?

এই দেহটা—একদিন যে দেহটা ঠাকুরের প্রসাদী ফুলের মত সনতের কাছে নৈবেদ্যের মত তুলে ধরেছিল—এ দেহটা আবার কঙ্কণকে সমর্পণ করবে কি করে?

সত্যিই আর যেন ভাবতে পারে না চন্দনা।

পরের দিন এলো কঙ্কণ।

এসো কঙ্কণ—

কঙ্কণ মুখোমুখি একটা সোফায় বসল।

কি ভাবলে কথাটা—যা বলে গিয়েছিলাম সেদিন—কঙ্কণ বললে।

ভাবছি।

চন্দনা।

আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী—

রাজী। সত্যি বলছো?

হ্যাঁ—তুমি ব্যবস্থা করো—আর—

বল চন্দনা, আর কি করতে হবে আমায়।

বিয়ের পরই আমরা লণ্ডনে চলে যাবো।

নিশ্চয়ই—

হ্যাঁ সেই ব্যবস্থাটাও করে ফেল। বিয়েটা আমাদের কোন্ মতে হবে—

তোমার যা ইচ্ছা---

হিন্দু মতে।

বেশ—সেই ব্যবস্থাই আমি করছি। আমি উঠলাম, অনেক কিছু করতে হবে।

চন্দনা বসে রইলো। কঙ্কণ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দিন দশেক পরেই হিন্দু মতে ওদের বিবাহ হয়ে গেল। অমলেন্দুই কন্যা সম্প্রদান করলেন। কঙ্কণ অমলেন্দুর কাছে গিয়ে সব কথা বলে তাঁকে সম্মত করিয়েছিল।

অমলেন্দু সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন।

বিবাহের পর দিনই B. O. A. C. ফ্লাইটে ওদের রওনা হবার কথা। পাসপোর্ট ভিসা টিকিট সব হয়ে গিয়েছে। যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যায় কঙ্কণ এসে বললো, সব হয়ে গিয়েছে চন্দনা—কাল রাত্রের প্লেনে যাচ্ছি আমরা। আমি এখন হোটেলে চললাম—কাল দুপুরে আসবো আবার। আমারও ত সব গোছগাছ করতে হবে।

আচ্ছা। চন্দনা বললে, এসো---

কঙ্কণ চলে গেল।

পরের দিন দুপুরেই চলে এল হোটেল থেকে কঙ্কণ।

চন্দনার ঘরের দিকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে এল, চন্দনা—

কোন সাড়া নেই।

চন্দনা—

দাই সামনে এসে বলল, মাঈজী এই চিঠিটা দিয়ে গিয়েছেন বাবুজী।

চিঠি! মাঈজী কোথায় গিয়েছে?

তিনি নেই!

নেই! কোথায় গিয়েছে সে? তোমার মাঈজী?

রাত্রেই চলে গিয়েছে মাঈজী।

কোথায়? কোথায় গিয়েছে?

তা ত জানি না। আমাকে বলে গেলেন, বিশেষ এক কাজে তিনি বেরুচ্ছেন, আপনি আজ এলে এই চিঠিটা দিতে। আর—

আর কি বলছেন?

আপনাদের এয়ার পোর্টে চলে যেতে—সেখানে মাঈজীর সঙ্গে দেখা হবে।

কেমন যেন বিস্মিত বিমূঢ় কঙ্কণ খামের চিঠিটা বের করলো।

কঙ্কণ,

আমাকে আজ তুমি ক্ষমা করতে পারবে কিনা জানি না। তবে আশা করবো তুমি একদিন নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করতে পারবে।

আমি চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। কেবল জানি চলে যাচ্ছি। তুমি আমায় কথা দিয়েছো—আমার মেয়েকে তুমি গ্রহণ করবে—তাকে পিতৃত্ব দেবে। তাকে যাতে করে কোন কলঙ্ক না স্পর্শ করতে পারে।

ঐ দিন যাওয়া হয় নি কঙ্কণের।

ঐ দিনের টিকিট ক্যানসেল করে, দিন তিনেক পরে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হয়েছে কঙ্কণ—চন্দনার মেয়েকে নিয়ে।

সঙ্গে দাইকেও কিছুদিনের জন্য নিয়ে যাচ্ছে কঙ্কণ। অন্যথায় সেখানে গিয়ে আতান্তরে পড়বে।

অন্য একটা সিটে দাইয়ের পাশের সিটে ঘুমিয়ে আছে চন্দনার মেয়ে।

কিছুক্ষণ হলো কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে ছেড়েছে প্লেন।

উড়ে চলেছে জাম্বো জেট আকাশের প্রায় একত্রিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে।

কঙ্কণ পকেট থেকে চন্দনার চিঠির খামটা বের করলো।

মেলে ধরলো চিঠিটা চোখের সামনে।

চন্দনা লিখছে—আমি অবিশ্যি জানি, তুমি তোমার কথা রাখবে কঙ্কণ। তোমার সঙ্গে এত বড় প্রতারণা করেও কি নির্লজ্জ আমি সত্যি। ভাবছো নিশ্চয়ই—এই চিঠি পড়তে পড়তে। কিন্তু আমি যে জানি কঙ্কণ তুমি আমার সকল লজ্জা ঢেকে দেবে। তোমার প্রেম, তোমার ক্ষমা বাকী জীবনটা আমার অমৃত হয়ে থাকবে। তা যদি না হতো আমি এতখানি দুঃসাহস করতাম কি করে!

আমি দূরে চলে গেলাম বলে দুঃখ করো না কঙ্কণ। আমি কি জানতাম না যে তোমার শর্ত তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। জানতাম —আর জানতাম বলেই আরো তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। তোমার আশেপাশে থাকবো স্ত্রীর মর্যাদায় অথচ তোমার স্বাভাবিক দাবি আমার কাছে কোন দিন তা তুমি জানাবে না। স্ত্রী হিসাবে এর চাইতে বড় লাঞ্ছনা তার স্বামীকে আর কি হতে পারে বলো?

সমস্ত জীবনটাই যে এখনো আমার সামনে।

তা ছাড়া যত দিন তোমার প্রেমকে স্বীকার করিনি তত দিন এক কথা ছিল। কিন্তু আজ—কোন নিষেধের প্রাচীর তুলে স্বাভাবিক যা সত্য তাকে অস্বীকার করবো কি করে?

আমার সত্য আমার কাছে। তোমার সত্য তোমার।

আজ থেকে তোমার সেই সত্যকে জানবার সাধনাই হবে আমার

একমাত্র সাধনা। আশীর্বাদ করো তোমার প্রেমকে যেন একদিন আমি উপলব্ধি করতে পারি এবং তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি আমার সকল লজ্জা সকল সংকোচকে বিসর্জন দিয়ে।

তোমার ঘরের খোলা দ্বার দিয়ে যেন অসংকোচে তোমার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করতে পারি।

এস. এন. আমাকে যা দিয়ে গিয়েছিলেন সব কিছু মেয়ের নামে লিখে দিয়ে গেলাম। পরমেশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁরই কাছে দলিল রেজিস্ট্রীও হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছা করলে তুমি তা রাখতে পারো আবার যাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়েও দিতে পারো। মোট কথা ওতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার একটা পেট আমি চালিয়ে নিতে পারবো। কেবল বাবার নামে বরাহনগরের বাড়িটা লিখে দিয়েছি।

আমার শেষ দুটি অনুরোধ যাবার বেলায়। আমার খোঁজ তুমি করো না। আর মেয়ে যেদিন বুঝতে শিখবে—তাকে আমার সত্য পরিচয়টা জানিও।

জানি সে আমাকে ঘৃণা করবে। তা করুক।

অনেক দুশ্চিন্তা ইদানীং আমাকে গ্রাস করেছিল—কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আজ আর কিছু তার অবশিষ্ট নেই। তুমি আমায় মুক্তি দিয়েছো কঙ্কণ—তুমি আমায় শান্তি দিয়েছো, আশীর্বাদ করো এই শান্তি যেন আমার বাকী জীবনটায় অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে।

জানো আজ যেন মনে হচ্ছে সব সুন্দর।

আকাশ-বাতাস এই পৃথিবী সুন্দর, বড় সুন্দর।

সর্ব—সর্বত্র মধুময়—মধুময় এ জগৎ। জানো কঙ্কণ বাবার সেই মন্ত্রপাঠ মনে পড়ছে কেন না জানি—বার বার

মধুবাতা ঋতায়তে—
মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
ওঁ মধু! ওঁ মধু—ওঁ মধু—

বাতাস মধু বহন করছে, নদী সিন্ধু মধু ক্ষরণ করছে—এই পৃথিবীর প্রতিটি ধুলিকণা ওষধি বনস্পতি সবকিছু মধুময় হোক। এই সঙ্গে জানালাম তোমাকে আমার প্রণাম।

তোমার চন্দনা।

কঙ্কণ চিঠিটা ভাঁজ করে খামের মধ্যে ভরে তাকাল চন্দনার মেয়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে। ঘুমের মধ্যে হাসছে। মধু—মধু—মধু।

সব কিছু মধুময়। মধুময় হোক।

শেষ